প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভূত-শিকারি মেজকর্তা এবং...

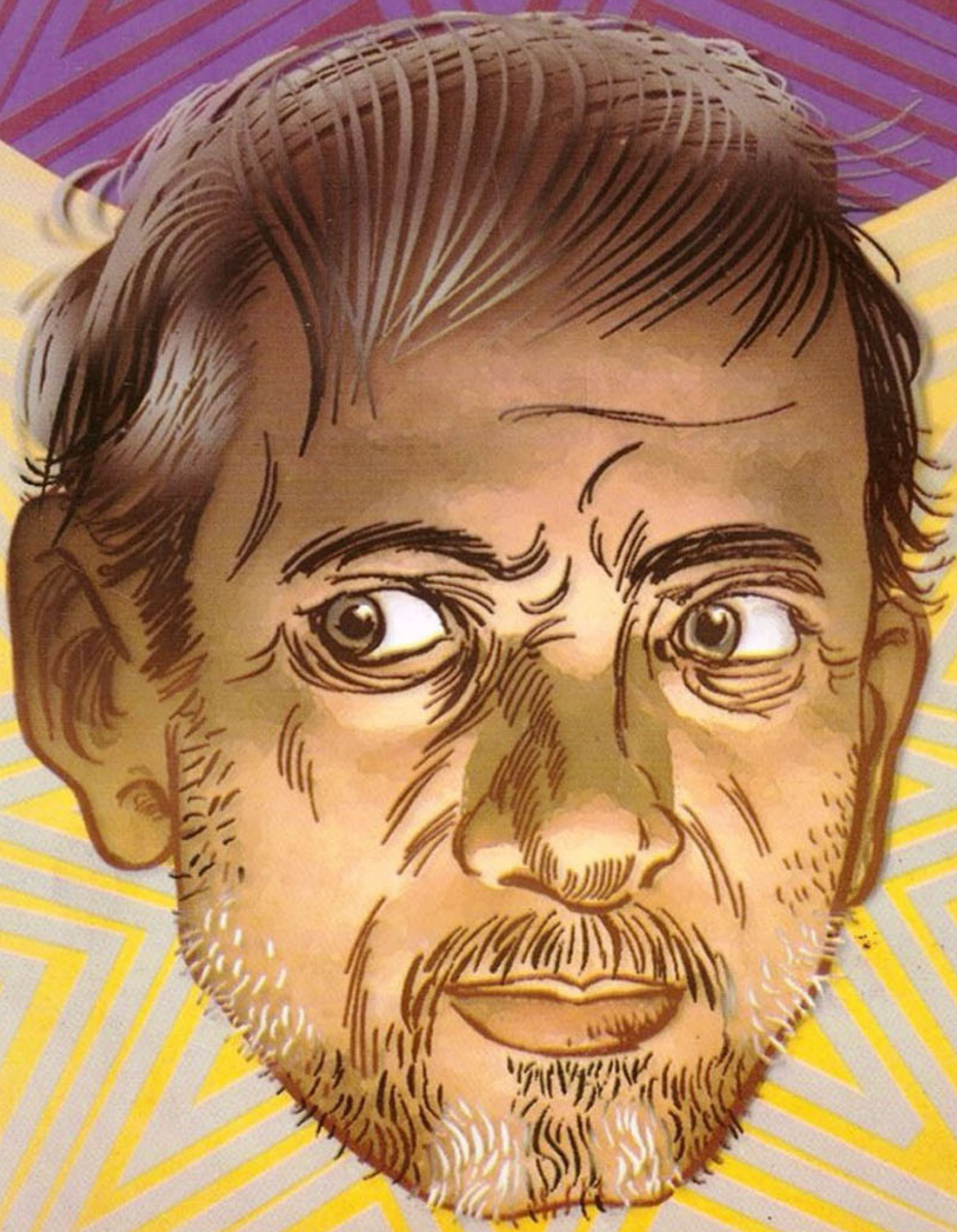

সূচীপত্র

ভূত-শিকারি মেজকর্তা

'তেনারা' ১৩

ভূত-শিকারি মেজকর্তা ২১

মেজকর্তার খেরো খাতা ৩০

মাথায় চন্দ্রবিন্দু ৩৭

ভূত যদি ভুলো হয় ৪৮

"ভূতেরা বড় মিথ্যুক" ৫৭

"ভূত যদি ভক্ত হয়" ৬৭

"ভূত যদি বোকা হয়" ৮২

"ভূত যদি রসিক হয়" ৯৯

এবং অন্যান্য ভূতের গল্প

কলকাতার গলিতে ১১১

হাতির দাঁতের কাজ ১১৯

মাহুরি-কুঠিতে এক রাত ১২৬

গল্পের শেষে ১৩৯

রাজপুতানার মরুতে ১৪৯

মাঝরাতের 'কল' ১৫৭

জঙ্গল-বাড়ির বউ-রানি ১৬৪

নিশুতিপুর ১৭২

ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ ১৭৯

করাল কর্কট ১৮৭

pathagar.net

‘তেনা-রা’

“ফ্যাঁ—শ।

না, আওয়াজটা ঠিক বোঝান গেল না। শুধু লেখা অক্ষরের মারফত বোঝান যায়ও না বোধহয়। ও আওয়াজ ধরবার মতো বর্ণপরিচয় কোনও ভাষাতেই তৈরি হয়নি। শুধু উদাহরণ দিয়ে একটু বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কী উদাহরণ দেব? এই যেমন একজোড়া কোরা কাপড় মাঝখান থেকে ধরে দু হাতে ছিঁড়ে দু ফাঁক করা।

না, শুধু তা-ই নয়, সে-কাপড় ছিঁড়ে দু ফাঁক করার শব্দের সঙ্গে একটা ডুকরে-উঠতে- চাওয়া কান্নাকে যেন প্যাঁচানো ছিপি ঘুরিয়ে চেপে দেওয়া।

আওয়াজ যেমনই হোক, ভড়কালাম না। ভড়কাব কেন? খুঁজে পেতে সাধ করে এমন একটা ডাকসাইটে কম-সে-কম দুশো বছরের পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাতে এসেছি, এমন দু-চারটে বুকের রক্ত-জল-করা আওয়াজ শুনতে হবে না! এ আওয়াজ তো শুধু উপক্রমণিকা মাত্র। তারপর যা হতে পারে, তার জন্যেই তৈরি থাকা দরকার।

টর্চটা তাই একবার জ্বেলে পরীক্ষা করে নিলাম। হ্যাঁ, ব্যাটারি একেবারে নতুন। কালিমাড়া অন্ধকারে যেন সার্চলাইটের মতো জোরালো রোশনাইয়ের তেজ নিয়ে ভাঙা দালানের উত্তরের হাঁ-করা জানলাটা বুনো লতাপাতার ফাঁসে জড়ানো সবে-ধন-নীলমণি দোমড়ানো শিকটা সমেত স্পষ্ট করে তুলল।

টর্চটা নেভাবার আগে কাছের বাতিদানে মোমবাতিটা জ্বেলে নিলাম। ধূপও জ্বালিয়ে দিলাম ক-টা। বহুকাল ইঁদুর-চামচিকের-বাসা-হওয়া দালানের এঁদো ভ্যাপসা গন্ধটা একটু হালকা করবার জন্যে। তারপর গুপ্তি লাঠিটারও ওপরের খাপ খুলে, ভেতরের সড়কিটা ভাল করে দেখে নিয়ে খোলা অবস্থাতেই পাশে নিয়ে এই পাতাটা লিখতে বসলাম।

হাতঘড়িটায় দেখে নিলাম, রাত একটা বাজতে তিন মিনিট।

তিন মিনিটে না হোক, আর তিন ঘণ্টার মধ্যে যা হবার হবেই। আওয়াজের যে

pathagar.net

নমুনা দিয়ে পালাটা শুরু হয়েছে, তাতে রাত জাগার মজুরি ভাল করেই পোষাবে বলে মনে হয়।

এ পর্যন্ত লিখে কলমটা থামিয়ে চারিদিকে একবার তাকালাম। আবহাওয়াটা অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। বাইরে হাওয়া-টাওয়া নেই। মোমবাতির সলতেটা প্রায় নিষ্কম্প হয়ে জ্বলছে। নেহাত শীর্ণ একটা বাতি, তার আলো আমার বসবার জায়গা আর খাতাটা ছাড়িয়ে অতি ভয়ে ভয়েই যেন আবছা অন্ধকার দেওয়াল আর ছাদের দিকে এগোতে গিয়ে থেমে গেছে।

ঝিঁঝি-টিঁঝি নয়, কী-একটা অজানা পোকা অন্ধকার নিস্তব্ধতাটাকেই যেন থেকে থেকে আচমকা কুরে কুরে ফুটো করবার চেষ্টা করছে।

কোরা কাপড় ছিঁড়ে দু ভাগ করার সঙ্গে প্যাঁচানো ছিপিতে চেপে-দেওয়া কান্না-মেশানো যে আওয়াজটা খানিক আগে শুনেছিলাম, সেটা একেবারে থেমে গেলেও কিছু-একটা হবার সময় ঘনিয়ে আসছে বলেই মনে হয়।

লেখবার খাতাটা সরিয়ে রেখে তৈরি হয়ে বসলাম।

কোন দিক দিয়ে কী ধরনের চমকটা আসবে, তা ভাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তবে এই ভাঙা দালানের মধ্যে কিছু একটা হওয়ার কথা। আমার পেছনে নয়, সামনে। পেছনে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাটা একেবারে দেয়ালেই পিঠ দিয়ে বসে একরকম কাটিয়ে রেখেছি বলা যায়। ঝুল ধুলো সব সাফ করে তার জন্যে একটু খাটতেও হয়েছে। আগেকার দিনের তৈরি দেওয়ালটা বেশ মজবুতই আছে এখনও। পুরনো পঙ্খের কাজ বেরঙা হয়ে উঠে গেলেও কোথাও ফাটল-টাটল ধরেনি।

তাই পেছনে কিছু হতে গেলে দেওয়ালটা ভেঙে বা উড়িয়ে দিয়েই হবে। সে সুদূর সম্ভাবনাটা আপাতত বাতিল করে সামনের দিক সম্বন্ধেই সজাগ হলাম।

হয়তো দু পাশের পলস্তারা-খসে-হাড়পাঁজরা-বেরনো দেওয়ালের ধারে জমে-থাকা ভাঙা ঘুন-ধরা সব আসবাবপত্রের স্তূপ, কিংবা সামনের ওই হাঁ-করা বিভীষিকার মতো জানলাটাতেই তাঁদের কারও আবির্ভাব দেখব। মাথার ওপরকার প্রায় অন্ধকার ছাদটা থেকেও কিছু হতে পারে।

কিন্তু কই?

হাতঘড়িটায় মাঝে-মাঝে আপনা থেকেই চোখ না দিয়ে পারছি না। পাঁচ-দশ মিনিট করতে করতে বড় কাঁটাটা যে নীচের ছয়ের দাগ ছুঁই-ছুঁই করছে! অথচ সেই গায়ে-কাঁটা- দেওয়া প্রথম আওয়াজের পর আর কোনও সাড়াশব্দই নেই। অজ ধাপধাড়া এক আধা-জংলি মুল্লুকের অন্তত দশ-কুড়ি বছর পার-করা এক পোড়ো ভিটের ভাঙা দালানের বদলে চৌরঙ্গির কোনও দোকানের দোতলায় বসে আছি ভাবলেও চলে।

দেড়টার দাগ পার হয়ে ঘড়ির বড় ছোটো কাঁটা ক্রমশ দুটোর কাছে পৌঁছে গেল। নিশুতি রাত ভেতরে বাইরে ঝিমঝিম করছে।

pathagar.net

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশি আর কোনও অভাবিত কিছুর একটু উঁকি পর্যন্ত নেই। শেষকালে এত তোড়জোড় করে আসার হয়রানি, রাত জাগার এই ধকল সব মিথ্যে হবে নাকি?

এইটুকু লিখে বেশ একটু হতাশা নিয়েই খাতাটা আবার বন্ধ করলাম।"

* * *

খাতাটা বন্ধ করলাম আমিও, এবং একটু নয়, রীতিমতো হতাশ হয়ে।

এত আশা এত আগ্রহ নিয়ে শুরু করার পর শেষ অবধি এমনই করে আহাম্মকের মার খাওয়া?

সমস্ত ব্যাপারটা এখন গোড়া থেকে একটু খুলে বলতে হয়। এতক্ষণ ধরে অধীর কৌতূহলে যা পড়ছিলাম তা একটি পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটিতে ময়লা বেরঙা মোটা খেরো খাতা মাত্র। খাতার বদলে কাগজের বান্ডিল বললেও হয়। আলগা পাতাটাতা খসে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে একটা লাল শালুর পুঁটলির মধ্যে বাঁধা।

সেই অবস্থাতেই আমি পেয়েছিলাম শহরের বোধহয় সবচেয়ে লম্বা দৌড়ের পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাস-এ।

যাচ্ছিলাম বালিগঞ্জ হয়ে এয়ারপোর্টে। ভি-আই-পি রোড ধরে বাঙ্গুর কলোনি-টলোনি ছাড়াবার পর আমার দিকের সীটগুলো কিছুটা খালি হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়েই বান্ডিলটা ঠিক আমার পাশেই দেখলাম। এ বান্ডিল যে কার, তার কোনও হদিস মেলেনি। স্পষ্টই কাগজ ভরা আলগা বান্ডিল দেখে উপস্থিত সকলের সামনে খোলার পরও মালিকানাটা অজানাই থেকে গেছে।

দলিলপত্র বা দামি কাগজ-টাগজ নয়, নেহাৎ জড়ান সেকেলে হাতের লেখায় ভরা একটা হাতে-সেলাই সস্তা কাগজের খেরো খাতা দেখে সেটা আমার হাতে দিতে কারও আপত্তি হয়নি। খাতাটা আগাগোড়া হাতড়ে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে আমিই মালিককে পাঠিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছি।

খাতাটা মালিকের কাছে পৌঁছে দেবার এই বেফায়দা ঝামেলা সাধ করে ঘাড়ে নেওয়াটা নেহাত পরোপকারের মহত্ত্ব নয়। বাস-এ সকলের সামনে বান্ডিল খুলে খাতাটা উল্টোবার সময় একটা এমন কথা চোখে পড়েছিল, যাতে সেটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি।

বাড়িতে এনে আগাগোড়া নেড়ে-চেড়ে দেখেও সেই কথাটুকুর বেশি লেখক বা মালিকের নাম-ঠিকানা কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খাতার মধ্যে ছোটো চিরকুট গোছের একটা চিঠির খসড়া পেয়ে তা থেকে কিছু হদিস পাবার যে আশাটুকু হয়েছিল, চিঠি পড়বার পর তাও বরবাদ হয়ে গিয়েছে। চিঠির চিরকুটটি খাতার লেখক ও মালিকেরই যে লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাকে লেখা হচ্ছে বা কে লিখছে, তার কোনও পরিচয় সেখানে মেলেনি। চিঠিটি এইরকম—

pathagar.net

"কল্যাণবরেষু সরকার ভায়া,

তুমি যে আস্তানার খবর দিয়েছ সেটা লোভনীয় বলেই মনে হচ্ছে। জোগাড়-যন্তর সব করে রাখো। আসছে অমাবস্যার দিনই গিয়ে পৌঁছচ্ছি। আপাতত আগের বৃত্তান্তগুলো লিখে ফেলতে ব্যস্ত। ওসব জমিজমার হিসেবপত্র বড়কর্তাকে বুঝিও। অমাবস্যার জন্যে তৈরি থেকো। আশীর্বাদ নিয়ো। ইতি

মেজকর্তা।"

চিঠিটা কোনও কারণে ফেলা হয়নি বলে এই মেজকর্তা নামটুকুই শুধু পেয়েছি। এই মেজকর্তা নামটুকু বাদে আর যে কথাটি প্রথমেই পেয়েছিলাম সেইটেই হল মোক্ষম।

কথাটা হল ভূত-শিকার! হ্যাঁ, মেজকর্তা যে-ই হন, তিনি এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ। ভূত-শিকারই তাঁর নেশা। আঁদাড়-পাঁদাড় বন-বাদাড় যত বেয়াড়া বিদঘুটে জায়গাই হোক, হদিস কিছু পেলেই তিনি ভূত শিকার করে বেড়ান। এই খাতা তাঁর সেইসব শিকারের বৃত্তান্ত।

খাতার গোড়ার পাতার ভূমিকায় এই পরিচয়টুকু পেয়ে সত্যিকার রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে মেজকর্তার পুঁথি পড়তে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু এ কী ধরনের ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি!

তবু শুরু যখন করেছি, তখন যেমন করে হোক শেষ করার জন্যে পাতা উল্টে বাকিটা পড়বার চেষ্টা করলাম।

পড়বার আকর্ষণ কিছু নেই। মেজকর্তা নিজেই তাঁর আশাভঙ্গ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছেন—

"কিন্তু খাতা বন্ধ করে রেখেই বা লাভটা কী? ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলেছে। রাত এখন প্রায় তিনটে। কিছুই যে হচ্ছে না, সেটাও লিখে যাওয়া দরকার! এমন ভাবে যে রাতটা শেষ হবে, তা ভাবতেও পারা যায়নি। যা হল, তা যেন বড় বেশি আশা করার মুখে ভাগ্যের থাপ্পড়।

এমনটা যে হতে পারে, তার একটু আভাস একেবারে পাইনি এমন কিন্তু নয়। অবশ্য অখদ্দে স্টেশনটায় নেমে সাইকেল রিকশা ভাড়া করার সময় কাছাকাছি অনেকে যে অবাক হয়েছিল, তা দেখে অখুশি হইনি। তাদের একটু সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাতেও না।

'কোথায় যাবেন বাবু? নৈহারের পাঁচকুঠি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নৈহার যে শুধু জঙ্গল বাবু, আর পাঁচকুঠির একটাই শুধু ঘাড়-মুড়ো গুঁজে পড়বার জন্যে কোনওরকমে খাড়া থেকে ধুঁকছে।'

তবু রিকশা একটা পেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। রিকশাওয়ালার গরজ বা সাহস অন্যদের চেয়ে একটু বেশি। সেও কিন্তু নৈহারের পাঁচকুঠিতে পৌঁছে দিয়েই চলে যাবার কড়ারে সওয়ারি করেছিল। বেশি ভাড়ার লোভ দেখিয়েও তাকে সকালটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি করান যায়নি।

pathagar.net

রাস্তায় পাঁচকুঠি নিয়ে তার সঙ্গে একটু আলাপ করবার চেষ্টাতেও বিফল হয়েছি। নৈহারের এই জংলা অঞ্চলটা ভাল জায়গা নয়, আর পাঁচকুঠিতে তার বাপ-দাদারাও কখনও মানুষের বাস দেখেনি, এর বেশি সে কিছু জানে না বা বলতে রাজি হয়নি। কেন এই ঘোর অন্ধকার রাতে পাঁচকুঠিতে আমি যাচ্ছি, তাও সে জানতে চায়নি একবারও।

পাঁচকুঠির পোড়ো ভিটের কাছ-বরাবর আমার লাঠি আর কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে রিকশা থেকে নামবার সময় অন্য সেই রিকশাওয়ালাকে দেখেছিলাম। আমাদের জন্যেই যেন সে অপেক্ষা করছিল ওখানে। আমাকে অমন জায়গায় একা নামতে দেখে অবাক যদি সে হয়ে থাকে, তার কথায় তা কিন্তু বোঝা যায়নি। কেন যে ওখানে নামছি, নিজে থেকেই যেন বুঝে নিয়ে সে একটু সহানুভূতির স্বরে শুধু বলেছিল, 'পাঁচকুঠিতে রাত জাগবেন তো! তা জাগুন গিয়ে। কিন্তু তেনাদের কাউকে পাবেন না।'

'তেনাদের?' আমি একটু বিরক্ত আর না-বোঝার ভান করে বলেছিলাম, 'তেনারা? কী বলছ তুমি? কাদের কথা বলছ?'

'ওই যাদের সবাই ডরায়, আবার খোঁজেও—' অন্ধকারেই লোকটার মুচকি হাসি যেন তার গলার স্বরে ফুটেছিল, 'সোজা করেই তা হলে বলি। বলছি আমাদের ভূত-পেত্নীদের কথা। তাঁরা এখানে নেই।'

মেজাজটা এবার সত্যিই একটু গরম হয়েছিল। বিদ্রূপ করে বলেছিলাম, 'তাঁরা নেই তো হয়েছে কী? আমি যে তাঁদের খোঁজে এসেছি, তোমাকে কানে কানে বলেছি সে কথা?'

'আজ্ঞে না, তা বলবেন কেন?' লোকটা লজ্জা পেয়েই অন্ধকারে যেন জিভ কেটেছিল, 'বেয়াদবি আমার মাফ করবেন।'

এইটুকু বলেই লোকটা হঠাৎ যেন কান খাড়া করে একটু টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'শুনতে পাচ্ছেন তো?'

ভাড়া নিয়ে আমার রিকশাওয়ালা তখন ফিরে যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে রুক্ষ গলাতেই বলেছিলাম, 'কী, শুনব কী? ও তো আমার রিকশাওয়ালার ঘন্টি।'

'আজ্ঞে না।' লোকটা এবার জোর দিয়ে বলেছিল, 'সাইকেলের ঘন্টি নয়, সরাইল্লার ডাক। সরাইল্লা আজ যখন আছে, তখন ভাবনা নেই।'

কী বকছে কী লোকটা? পাগল-টাগলই তো মনে হয়। একটু ধমকের সুরেই বলেছিলাম, 'কী সব বাজে বকছ? সরাইল্লা আবার কী?'

'আজ্ঞে সরাইল কুকুর! ওই শুনুন না?' লোকটা পোড়ো পাঁচকুঠির ভিটের দিকেই আঙুল দেখিয়েছিল।

সেদিকে ফিরে বেশ একটু মন দিয়েই শোনবার চেষ্টা করেছিলাম তারপর। কিছুই কিন্তু শুনতে পাইনি। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে খুব কড়া বকুনিই দিতাম।

pathagar.net

কিন্তু দেখি, বকুনিটা অনুমান করেই সে ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে তার রিকশা নিয়ে সরে পড়েছে।

তার পর থেকে এই নিষ্ফল পাহারাই চলেছে। রাত তিনটে বিশ।

হঠাৎ, ও কী!

না, না, ওই তো! এবার ঠিক শুনতে পেয়েছি। লোকটা তাহলে মিথ্যে বলেনি। কুকুরের ডাক। যে-সে কুকুর নয়, সেই বিখ্যাত সরাইল কুকুরের জাত। কিন্তু ডাকটা আরও যেন হিংস্র, আরও বুক-কাঁপান।

সেই সেকালের পুব বাংলার সরাইল কুকুর এখানে কোথা থেকে আসবে, সে কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা নয়। সমস্ত শরীরটা শুধু যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। অথচ লোকটা বলেছিল, সরাইল কুকুর যখন আছে তখন ভাবনা নেই। কেন বলেছিল সে কথা? বোঝবার চেষ্টা করবার আগেই শিউরে উঠল শরীরটা। হচ্ছে! কিছু-একটা হচ্ছে!

একটা শব্দ, না একটা গন্ধ, না শুধু একটা অনুভূতি, তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু মোমবাতির আবছা আলোটাই যেন একটা আতঙ্কের কাঁপুনি ছড়াচ্ছে।

গুপ্তি লাঠিটা কাছে টেনে টর্চের বোতামটা টিপলাম। কিন্তু আলো কই? টর্চ থেকে খানিকটা অন্ধকারের তোড়ই যেন সামনে গিয়ে হাঁ-করা জানলাটার ওপর পড়েছে। আর সেখানে? সেখানে সেই মাথা আর চোখ!

না, পুরুষ কি মেয়ে কি কঙ্কালের মুখ কি চোখ নয়! অজগর! অতি বড় দুঃস্বপ্নের কল্পনা-ছাড়ান বীভৎস বিরাট ভয়ংকর এক অজগরের মাথা ধীরে ধীরে জানলার দোমড়ানো গরাদ আরও সরিয়ে পিছলে গলে আসছে, কালো বিদ্যুতের মতো কাটা জিভটা পলকে পলকে বার করতে করতে। মুখ আর জিভের চেয়ে ভয়ংকর তার চোখ। তাতে পলক পড়ে না, শুধু যেন সম্মোহনের সাঁড়াশিতে জাঁতাকলের চেয়ে সবলে চেপে ধরে অসাড় করে রাখে।

সেই মুহূর্তে সরাইলটাকে দেখলাম। কুকুর নয়, যেন কালো চিতারই একটা চাবুক-তীক্ষ্ণ খুদে নমুনা!

অজগরটা জানলা দিয়ে গলে তখন নিয়তির মতো এগিয়ে আসছে। সরাইলটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মাথাটা লক্ষ্য করে।

সম্মোহনটা কি কেটে গেল তাইতেই? সড়কি-লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এক লাফে। পাগলের মতো সেই সড়কির খোঁচার পর খোঁচা বসালাম অজগরটার গায়ে, মাথায়, চোখে। বিরাট কাছির মতো দেহটা তার কিলবিলিয়ে উঠল সেই দারুণ খোঁচায়।

কিন্তু, কিন্তু, সেই কিলবিলিয়ে ওঠার মধ্যেই সে সরাইলটাকে তার কুণ্ডলীর মধ্যে পাক দিয়ে ফেলেছে যে!

অক্লান্তভাবে সড়কি চালিয়ে চললাম। অজগরের মরণ-খিঁচুনি থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে তার আলিঙ্গনে পিষে গুঁড়ো হওয়া সরাইলটারও।

pathagar.net

pathagar.net

নিজেকেও প্রায় বেহুঁশ হয়েই মেঝের ওপর শুয়ে পড়তে হল এবার। শুয়ে পড়বার আগে টর্চটা কোনওরকমে একবার অজগর আর সরাইলটার ওপর ফেললাম। না, দুটোই একেবারে শেষ হয়ে গেছে। মেঝেটা রক্তে আর অজগরের মুখের ফেনায় মাখামাখি।

বেশিক্ষণ নয়। মিনিট পাঁচেকের বেশি বেহুঁশ হয়ে থাকিনি। উঠে যখন বসলাম, তখন ঘড়িতে তিনটে পঁয়তাল্লিশ মাত্র।

মোমবাতিটা এরই মধ্যে কখন নিভে গেছে। টর্চের আলোতেই ঘড়িটা দেখে সেটা ঘরের মাঝখানে ফেললাম।

একটু অস্ফুট চিৎকার আপনা থেকে গলা ঠেলে বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ।

হ্যাঁ, যা ভাবতেও পারিনি, সামনে তারই প্রমাণ।

মেঝের ওপর রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত অজগর কি তার আলিঙ্গনে পিষে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া সরাইল কুকুরটার চিহ্নমাত্র নেই। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

তার মানে 'তেনা'রা বলতে যা বুঝি, সে-ধারণাটা আরও ছড়াতে হবে। নইলে পাঁচকুঠির কোন আদ্যিকালের ওরা এমন করে হঠাৎই আমায় দেখা দিয়ে যাবে কেন?"

pathagar.net

ভূত-শিকারি মেজকর্তা

"বাইরের উঠোন বাগান পেরিয়ে বাড়িটায় ঢোকাই এক দায়। বাগান মানে তো এখন ঝোপঝাড় বুনো লতা-পাতা আর আগাছার জঙ্গল। আর চারদিকের ধসে-পড়া দেওয়ালের নোনা-শ্যাওলা-ধরা ভাঙা-চোরা ইঁটের টুকরো-ছড়ান উঠোনটা যেন ছোটোখাট ভূমিকম্পের সাক্ষী।

রীতিমতো লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে বলা যায়। ভাগ্যে গুপ্তিটা সঙ্গে এনেছিলাম! তার ওপরের লাঠির খাপটা খুলে গুপ্তিটা বার করে কাঁটা-ঝোপ, লতা-পাতার জঙ্গল কেটে কেটে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি।

সিঁড়িটা দোতলায় গিয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু রেলিং ভাঙা নোনা আর শ্যাওলা-ধরা ধাপগুলোর যা অবস্থা তাতে উঠতে গেলে আমার ভারেই ধসে পড়বে কি না কে জানে!

সাবধানে, বুঝে বুঝে পা ফেলে, ওপরে উঠতে উঠতে মনটা কিন্তু খুশিই হয়ে উঠছিল। না, বটকেষ্টকে এবার আর বাজে খবর দেবার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। তার সেবারের সেই মাথায়-চন্দ্রবিন্দু মুল্লুকের মতো এবারের সুলুক-সন্ধানটাও মিছে হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ঠিকানাটার হালচাল যা দেখছি তাতে যে আশায় আসা, তা এখানে না মিটলে আর মিটবে কোথায়! সব দিক দিয়ে এমন একটা জুতসই আস্তানা একেবারে বেদখল পড়ে থাকবে তা হতেই পারে না। কেউ না কেউ মৌরসি পাট্টা নিয়ে জুড়ে বসে আছেন নির্ঘাত, আর যিনি আছেন, তিনি আমার মতো শ্বাসটানা বুক-ধুকধুক-করা খিদে-তেষ্টার গোলাম নিশ্চয়ই নন।

ধসে পড়োপড়ো নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে ওপরের দালানটায় উঠে কিন্তু অবাক হবার সঙ্গে মেজাজটা রীতিমতো খারাপ হয়ে গেল।

এ যে সাফসুফ সাজান-গুছোন গেরস্থালি বললেই হয়। মালপত্রের চেহারাটা নিতান্ত দুখিনী গোছের, কিন্তু গাড়ু, গামছা, ভাঙা তোবড়ান তোরঙ্গ, থেলো হুঁকো, কল্‌কে,

pathagar.net

টিকের মালসা, আর আগুনে পোড়া মেটে হাঁড়িকুড়ি দেখে তো আমারই মতো এ পারের কেউ আস্তানা পেতেছে বলে মনে হয়। হা-ঘরের হদ্দ কেউ নিশ্চয়! নইলে ছুঁচো চামচিকেও যেখানে বাসা বাঁধতে ডরায়, তেমন জায়গায় এসে ডেরা পাতে!

কিন্তু এ হতভাগা এখানে জুড়ে বসে থাকলে আমার সব মতলব যে ভেস্তে যাবে। লোকটা যেই হোক, তাকে তাড়াতেই হবে তাই!

'কেমন করে?'

চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকালাম। কে বললে কথাটা?

কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না! আমার নিজের মনের কথাটাই নিজের কানে বেজে উঠল নাকি?

না, তা নয়। যে বলেছে, তাকে এবার চাক্ষুষই দেখা গেল। চিমসে খিটখিটে পাকান চেহারার এক বুড়ো খাটো ধুতি পরে আদুর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ে ধবধবে একগোছা পইতে ঝুলিয়ে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে খড়ম খটখট করতে করতে কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ মাখান খ্যানখেনে গলার সে কী টিটকিরি! হাতের হুঁকোটাকেই যেন মোচড় দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে, 'আমায় তাড়াতে এসেছ, কেমন? আমায় তাড়িয়ে একেশ্বর হতে চাও এখানে?'

জবাব দেব কী, বুড়োর কাণ্ড দেখে আমি তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। যেন আমাকেই কান মলা দিতে হুঁকোটাকে এমন মোচড় দিয়েছে যে, কল্‌কেটা কাত হয়ে তার জ্বলন্ত টিকে-তামাক বুড়োর গায়ে আর কাপড়ের ওপরেই পড়ছে ঝপঝপ করে। সেদিকে চেয়ে হাঁ হাঁ করে বলে উঠলাম, 'আরে করছেন কী? পুড়ে মরতে চান নাকি?'

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে গায়ের আর কাপড়ের আঙরার টুকরোগুলো গায়েই ঘষে দিতে দিতে বুড়ো গা-জ্বালান গলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'বলি, ক দিন খোলস ছেড়েছ শুনি? বেশি দিন তো হবে না। খোসাগুলো সব এখনও ভাল করে ছাড়েনি মনে হচ্ছে।'

বুড়ো বলছে কী! আমি তখন তার দিকে চেয়ে যেমন কাঠ, তেমনই আবার একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছি। বুড়ো যা বলছে তার তো একটাই মানে হয়! আর সে মানে তো তা হলে—"

* * *

না, আগের লাইন পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা আমার নিজের কথা নয়। সব সেই খেরো খাতা থেকে তোলা, মেজকর্তার সেই খেরো খাতা, কলকাতার সব চেয়ে লম্বা পাড়ির বাস-এ দমদমের এয়ারপোর্টে যাবার পথে যা একটা খালি বেঞ্চির ওপর পুঁটলি-বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। পুঁটলিটা বেওয়ারিশ দেখে আর তার ভেতরের ছেঁড়াখোঁড়া একটা খেরো খাতার পাতাগুলো একটু নাড়তে চাড়তে দু-একটা কথা চোখে পড়ায় ভেতরে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে যথাস্থানে ফেরত দেব বলে পুঁটলিটা চেয়ে

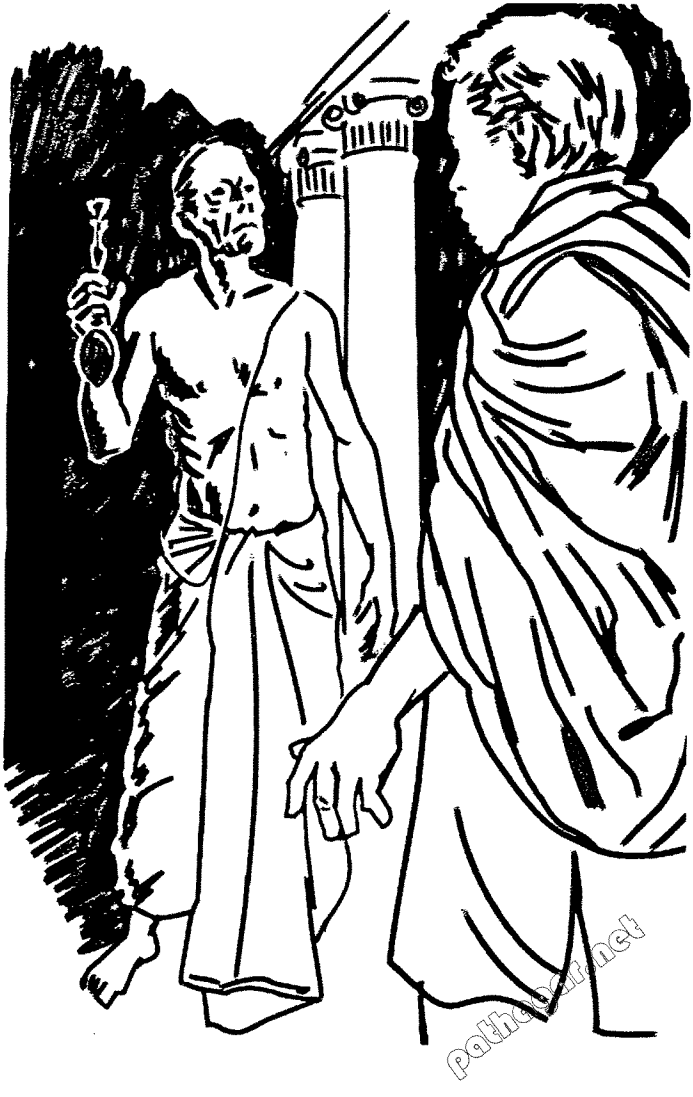
pathagar.net

নিয়েছিলাম। নেহাত একটা ছেঁড়াখোঁড়া হলদে-হয়ে-আসা বেরঙা কাগজের হাতে-লেখা খেরো খাতা বলেই কেউ আর আপত্তি করেনি।

খেরো খাতাটা ছোটোখাটো নয়, বেশ ঢাউস। প্রায় মহাভারত-প্রমাণ। ছেঁড়াখোঁড়া পাতাগুলোয় অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। যতটা সম্ভব সেসব পাতা গুছিয়ে এ পর্যন্ত যতখানি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তাতে কারও নাম-ঠিকানা কিছু কিন্তু পাইনি। পেয়েছি শুধু মেজকর্তা বলে একটি নাম। তিনি কোথাকার, তা জানি না। কোন যুগের মানুষ তারও হদিস পাওয়া ভার।

কিন্তু এ মানুষটি একেবারে অদ্ভুত। অদ্ভুত তাঁর শখ বা বাতিকের দিক দিয়ে। লোকের কত রকম শখ আর বাতিকই তো থাকে। কারও মাছ ধরার শখ, কারও বাতিক দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট জমানো, কারও আবার শিকারের নেশা। এসব শখ আর বাতিকের জন্যে কী কষ্ট না করে মানুষ, আর কত না খরচ!

তাঁর খেরো খাতা বৃত্তান্ত পড়ে বোঝা যায়, মেজকর্তাও তাই করেন। তবে তাঁর শখ বা নেশা বা বাতিক যাই বলি, সেটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। জলের মাছ কি বন-জঙ্গলের জানোয়ার নয়, তিনি শিকার করে বেড়ান যাদের নামেই গায়ে কাঁটা দেয় সেই ভূতপ্রেত। যেখানে এই রকম অশরীরীদের ঘুণাক্ষরে একটু খবর পান, সেখানেই তিনি ছুটে যান সরেজমিনে সন্ধান করতে। এসব ভূতুড়ে খবর আনবার জন্যে তিনি মাইনে করা দালাল লাগিয়ে রেখেছেন সারা মুল্লুকে। দালালরা খাঁটি খবর আনলে মাইনের ওপর মোটা বকশিশ পায়।

ভূতের পেছনে এইসব ছোটাছুটির বিবরণ তিনি একটি মোটা খেরো খাতায় লিখে গেছেন। কবে যে লিখে গেছেন, তা সঠিকভাবে জানবার কোনও উপায় নেই, কিন্তু বর্ণনা-টর্ণনা পড়ে ব্যাপারগুলো যে হালের নয়, এটুকু অন্তত বোঝা যায়।

এই খেরো খাতাটিই বেওয়ারিশ একটি পুঁটলির মধ্যে লম্বা পাড়ির একটা বাস-এর বেঞ্চিতে পাওয়ার পর সামান্য একটু নেড়েচেড়ে দেখবার সময়ই 'হানা বাড়ি', 'ভূতুড়ে গাঁ' গোছের কয়েকটা কথা পেয়েই আগ্রহভরে সেটা নিয়ে এসেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম যে, খেরো খাতা থেকে মালিকের কোনও হদিস পেলে তাঁকে খাতাটা পাঠিয়ে দেব। সঠিক হদিস কিছু না পেলেও শুধু মেজকর্তা নামটুকু পেয়ে খেরো খাতার প্রথম একটা বৃত্তান্ত ছাপবার ব্যবস্থা করেছিলাম, আসল মালিক তা দেখে যদি নিজের হারানো খাতা দাবি করতে আসে।

দাবিদার কেউ কিন্তু আসেনি।

প্রথমের পর দ্বিতীয় বৃত্তান্ত ছাপাবার সময় আগের বারের আশাটা কিন্তু ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ সত্যি আসুক, তা আর তখন চাইছি না।

মনের বাসনাই পূর্ণ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত কেউ আর আসেনি।

কেউ আর আসবে না বলেই এখন আমার ধারণা। খেরো খাতার যিনি মালিক

pathagar.net

কোনও কিছু দাবি করতে আসার অবস্থাই হয়তো তিনি পার হয়ে গেছেন। তিনিই হয়তো আর নেই।

নিজের কৌতূহল মেটাবার সঙ্গে মেজকর্তার স্মৃতির মান রাখতে তাঁর খেরো খাতা থেকে যত দূর সাধ্য তাঁর বিচিত্র সব বিবরণ উদ্ধার করে তাই বার করবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কিন্তু উদ্ধার করা কি সোজা! একে ছেঁড়াখোঁড়া খেরো খাতার পাতাগুলোই সব মজুত আছে কি না সন্দেহ। যা আছে, তাও গিয়েছে ওলটপালট হয়ে। এছাড়া মেজকর্তার লেখার ধারাটাই কেমন খামখেয়ালি। কোথাকার খেই কোথায় গিয়ে যে আবার ধরেছেন, তা খুঁজে পাওয়াই দায়।

যে বিবরণ দিয়ে এ কাহিনি আরম্ভ করেছি, তাও মাঝপথে অমন আচমকা ছেড়েছি কি প্যাঁচ কষবার জন্যে?

মোটেই না।

লেখাটা একটা পাতার শেষ লাইনে ওই পর্যন্তই পৌঁছে থেমেছে। পরের পাতায় তার বাকি অংশটা পড়তে গিয়ে চক্ষুঃস্থির। পরের পাতাটাই সেখানে নেই।

গেল কোথায় সে পাতা? একেবারে হারিয়েই গেছে নাকি! না, মেজকর্তা তাঁর স্বভাবমাফিক এ পাতার খেই এই মহাভারত-প্রমাণ পুঁথির তাড়ার আর-কোনও পাতায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে বসে আছেন?

তা যদি তিনি না করে থাকেন, তা হলে তো মাঝপথে হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়া এই বৃত্তান্তের শেষ না জানার যন্ত্রণা সহ্য করাই শক্ত হবে।

কী বললে থেলো-হুঁকো-হাতে সেই চিমসে বুড়ো? তার কী এমন দারুণ মানে বুঝলেন মেজকর্তা? আর কী হল তাঁদের সেই মোলাকাতের ফলাফল?

এসব কথা কি আর কোনওদিন জানা যাবে না?

অস্থির হয়ে তাই খেরো খাতার পাতার পর পাতা তন্নতন্ন করে খোঁজবার চেষ্টা করেছি।

সে-চেষ্টা একেবারে বিফল হয়নি। আশাতীতভাবে সে বৃত্তান্তের ধারাটা আর-এক জায়গায় খুঁজে পেয়েছি।

মাঝখানের কিছু বাদ পড়েছে কি না বলা শক্ত। তবে আসল খেইটা তাতে একেবারে ছিঁড়ে যায়নি।

মেজকর্তা লিখেছেন—

"সমস্ত শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। এমন ভাগ্য যে হয়েছে তা তো বিশ্বাস করতেই পারছি না। এতদিনে যে সুযোগের স্বপ্নই শুধু দেখেছি, তা সত্যি সত্যি একেবারে হাতের মুঠোয়!

হুঁকো হাতে চিমসে বুড়ো যা বলছে তাতে তো একটা কথাই বোঝায়! না, একটা নয়, দুটো। সোনায় সোহাগা ছাড়া কিছু নয়। এখন শুধু একটু সামলে ঘুঁটি নাড়লেই

pathagar.net

আমি যা চাইছি সেই কিস্তি মাত।

বুড়ো নিজেই শুধু ধরা দিয়ে ফেলেনি, আমাকেও তার দলের বলে ধরে নিয়েছে। বেশ একটু বুঝেসুঝে সব চাল চেলে এই ভুলটা যদি জিইয়ে রাখতে পারি তা হলে আমার প্রেতপুরাণ সারা দুনিয়ায় একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে।

চিমসে বুড়োর টিটকিরির প্রথম জবাবটা বেশ ভালই দিলাম! 'খোসা কি আপনারই সব ছেড়েছে নাকি?' দালানের কোণে তার মালপত্র দেখিয়ে বললাম, 'ওগুলো তা হলে পুষে রেখেছেন কেন?'

এ জবাব শুনে সে কী খ্যানখেনে হাসি চিমসে বুড়োর! হাসতে হাসতে কল্‌কের আগুন আবার গায়ে কাপড়ে ছিটিয়ে পড়ল। আগের মতোই সেগুলো যেন চন্দন-বাটার মতো গায়ে ঘষে নিয়ে বললে, 'ঠিক ধরেছ! ঠিক! ওগুলো তোমার ওই পুঁটলি আর গুপ্তি-ভরা লাঠির মতো পুরনো অভ্যেসে জমিয়ে রাখা নয়।'

'অভ্যেস নয় তো শখে?' আমি একটু ভূতুড়ে ঝাঁঝই দেখালাম।

'আরে না, না। অভ্যেসও নয়, শখও না।' বুড়ো হাসতে হাসতেই বললে, 'ও শুধু উৎপাত ঠেকাতে একটু ভড়কি।'

'উৎপাত ঠেকাতে ভড়কি।' এবার আমি সত্যিই হতভম্ব। 'কীসের উৎপাত আর কী ভড়কি?'

'কীসের উৎপাত তা বুঝলে না?' বুড়োর গলায় আবার টিটকিরির সুর, 'তোমায় আগে যা ভেবেছিলাম, সেই হতভাগাদের উৎপাত। বিশ্বাস তো ওদের নেই, লোভ করে কি সত্যি হাঁড়ির হালের হা-ঘরে হয়ে কেউ পাছে সেঁধুতে এসে জ্বালায়, তাই তৈরি থাকতে হয় সারাক্ষণ।'

উৎপাত করবার হতভাগা মানে যে মানুষ তা বুঝলাম, কিন্তু ঘর-কন্নার মালপত্র দিয়ে তাদের ভড়কি দেওয়াটা কী ব্যাপার? সেই কথাই জানতে চাইলাম।

আমার বোকামিতে বুড়ো এবার খুশি। বললে, 'একেবারে আনকোরা আনাড়ি তো! কিছুই এখন জানো না। ভড়কিটা কী রকম তা হলে শোনো। হতভাগারা একবার সেঁধুলে তো সহজে নড়তে চায় না। তাই তাদের তাড়াবার দাওয়াইটা কড়া করবার জন্যে প্রথম মুখশুদ্ধিটা বেশ মোলায়েম মিষ্টি লাগাবার ওই ভড়কি! হতভাগা যে আসবে, ঘরকন্নার ওই ব্যবস্থা দেখে তার মনে একটু ভরসাই হবে নিজের মতো আর-একজনকে সঙ্গী পেয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর যেই একটু গুছিয়ে বসবার কথা ভাবছে, তখন আচমকা গায়ের ওপর কল্‌কের আগুন ছড়াবার মতো একটি প্যাঁচ, কি তেমন জবরদস্ত দুঁদে কেউ হলে মুণ্ডটার ছাল-ছাড়ানো এই চেহারা একবার হঠাৎ দেখালেই কাম ফতে! এ বাড়িমুখো তো নয়ই, এ তল্লাটেও আর কোনওদিন সে পা বাড়াবে না।'

চিম্‌সে বুড়োর দিকে চেয়ে সমস্ত শরীরটা আপনা থেকে শিউরে উঠে বুকের

pathagar.net

ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেল। বুড়ো তার প্যাঁচ বোঝাতে তার বিকট ফরমাশি চেহারাটাই আমায় তখন দেখাচ্ছে।

একগোছা পইতে ঝোলানো, চিমসে পাকানো আবলুসের কাঠির মতো আদুড় দেহটির ওপর কোটর-বার-করা দাঁত-ছিরকোটান একটা মড়ার মাথা!

বুকের ভেতর থেকে যে চিৎকারটা আপনা থেকে বেরিয়ে আসছিল, কোনও রকমে সেটা চেপে মুখটা নির্বিকার রাখতেই তখন গায়ে ঘাম দিচ্ছে। তবু প্রাণপণে ধাক্কাটা সামলে ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি টানবার চেষ্টা করে বললাম, 'হ্যাঁ, এ প্যাঁচ একেবারে মোক্ষম! কিন্তু মানুষকে তাড়াবার জন্যে এত গরজ কেন? মানুষকে ভয়টা কী?'

'কী ভয়?' চিমসে বুড়ো এবার চটেই উঠল আমার ওপর, 'খোলস তো সবে ছেড়েছ, দু দিন বাদেই বুঝবে মানুষকে কী ভয়, আর কেন। অজাত-বেজাত খোলস-ছাড়া সক্কলের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে থাকতে পারো, কিন্তু মানুষের সঙ্গে কখনও নয়। সঙ্গে থাকবার একটু সুবিধে দিয়েছ কি, কেন, কেমন, কোথায় সব বৃত্তান্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করতে চেয়ে জ্বালিয়ে মারবে একেবারে। কেউ আবার ভূতের ওঝা ডাকে আমাদের তাড়াতে। সেই দু দিন বাদে তো নিজেরাই খোলস ছাড়বি, তা অত ছটফটানি কীসের? সাধে কি ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়াতে হয়!'

একটু থেমে বুড়ো মড়ার মুণ্ডুটা পাল্টে হেসে বললে, 'যাক, তোমাকে যখন সাথে পেয়েছি, তখন আর ভাবনার কিছু নেই। দু জনে মিলে এ পোড়ো ভিটের এমন সুনাম ছড়াব যে, হাঘরে-টাঘরে তো ছার, গোরা মিলিটারি পর্যন্ত এধার মাড়াবে না। তোমায় পুরনো-নতুন ক-টা প্যাঁচ শিখিয়ে দেব ধীরে-সুস্থে। এখন দু দিন একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে টানকো হয়ে নাও। কাঁচা খোলস ছাড়লে প্রথমটা কেমন একটু সব এলানো-এলানো মনে হয় কি না। ও হ্যাঁ, এক আস্তানায় থাকব। সময়ে অসময়ে দেখা হবে, তা তোমায় একটা কিছু বলে ডাকতে পারলে ভাল হত না? তোমার পুরনো অভ্যাসের ওই চিহ্ন ধরে গুপ্তি বলে ডাকতে পারি বটে, তুমিও পারো আমায় হুঁকোদা বলতে। কিন্তু তার চেয়ে নাম একটা থাকাই ভাল। কী নাম ছিল খোলস ছাড়বার আগে?'

'নাম?' এক মুহূর্ত একটু থতমত খেয়ে বলে দিলাম, 'নাম বটকেষ্ট!'

'বটকেষ্ট! তা বেশ বেশ! নামটা দুবার আওড়ে যেন খুশি হয়ে বুড়ো বললে, 'তা বটকেষ্ট করত কী ওপারে?'

'এই মানে,' একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'মুহুরি ছিল এক মোক্তারের।'

'মোক্তারের মুহুরি!' বুড়ো রীতিমতো খুশি হয়ে বললে, 'ভাল, ভাল। খুব ভাল। দুনিয়ার ঘোর-প্যাঁচ তা হলে সবই জানা আছে। আমারও বড় মন্দ নয়। ছিলেম জমিজমা বাড়িঘরের দালাল। নাম ছিল ভজহরি। তখন মফস্‌সলের বোকা জমিদারদের গড়ের মাঠই কতবার বিক্রি করে দিয়েছি। বলব তোমায় সেসব গল্প। তুমি আমায় ভজাদা বলেই ডেকো।'

pathagar.net

গড়ের-মাঠ-বিক্রি-করা ধুরন্ধর দালাল ভজাদার কাছ থেকে শুধু দালালির গল্প নয়, আরও অনেক কিছু টেনে বার করে আমার প্রেতপুরাণ ভরে দিতে পারব আশা ছিল। কিন্তু সে আশায় অমন করে ছাই পড়বে কে জানত!'

সব কিছু ভেস্তে দিল শেষ পর্যন্ত শুধু ক-টা হাঁচি!

হ্যাঁ, স্রেফ ক-টা হাঁচি এত বড় একটা যুগান্তকারী কাণ্ড দিল ভণ্ডুল করে।

কী মোলায়েমভাবেই না সব কাজ এগোচ্ছিল। ভজুদার একটু অস্থির চঞ্চল স্বভাব। স্বভাবটার মূলে আছে অবশ্য ভয়। ভজুদার কেবলই ভয়, কোথা থেকে কেউ যদি এসে এ ডেরায় ঢুকে পড়ে।

'কেউ' মানে অবশ্য মানুষ। মানুষজনের আসা ঠেকাতে ভজুদা দিন-রাত খাড়া পাহারায় থাকে। ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁষতে না দেবার জন্যে দিন-দুপুরেও এ বাড়ির বাইরে পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে ফেরে। এ বাড়ির ধারেকাছে কেউ আসছে আঁচ পেলে আর ভজুদাকে রোখা যায় না। আর কিছু না পারলে নিদেনপক্ষে গোখরো, কেউটে সেজেও পায়ের তলায় সড়সড়িয়ে ঘুরে মানুষটাকে তল্লাট-ছাড়া করে আসবে।

এই অস্থিরতার ফাঁকে-ফাঁকে যখন যতটুকু পারি ভজুদাকে ধরে আমার খেরো খাতার পাতা ভরাবার মশলা জোগাড় করে নিই।

তারই মধ্যে হঠাৎ সেদিনকার সেই হাঁচি। হাঁচি কি একবার! হাঁচির পর হাঁচি আর থামাতে পারি না। পুরনো নোনাধরা ঝুরঝুরে পলেস্তারার চুনবালি-খসা বাড়ি। দোষের মধ্যে যে-কোণে থাকি তার মেঝে আর দেয়ালগুলো একটু পরিষ্কার করবার জন্য ঝাড়াঝুড়ি করেছিলাম। ব্যস, তাতেই নাকে-মুখে মান্ধাতার আমলের ধুলো ঢুকে এমন সুড়সুড়ি ধরিয়েছে যে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা সামলাতে পারছি না।

ভজুদা তখন কাছে পিঠে ছিল না। উত্তর দিকের একেবারে জঙ্গল হয়ে ওঠা বাগানে কাছের গাঁয়ের কে বুড়ি দুটো কাঠকুটো কুড়োতে এসেছে টের পেয়ে গেছল তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে।

ভজুদা ফিরে আসার আগে কী চেষ্টাই না করলাম হাঁচিটা বন্ধ করতে। কিন্তু তা আর পারলাম না কিছুতেই।

ভজুদা ফিরে এসে প্রথমে অবাক, তারপর রীতিমতো বিরক্ত। প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বললে, 'ও আবার কী ন্যাকামি! হাঁচি-কাশির শখ এখনও মেটেনি নাকি?'

'না, ভজুদা!' হাঁচির ফাঁকে কোনওরকমে জানাবার চেষ্টা করলাম, 'এটা অ-অ-অভ্যাস! হ্যাঁচ্চো!'

'অভ্যাস!' ভজুদা তেমনই খাপ্পা, 'বলি হাঁচতে-হাঁচতেই খোলস ছেড়েছিলে নাকি যে, এখনও অভ্যেস ছাড়তে পারছ না! আর তাই বা হবে কেন? ওসব বদভ্যেস-টদভ্যেস সঙ্গে তো কখনও আসে না।'

'হ্যাঁ, আসে না, মানে—' যা বলতে চাইলাম, পরপর ক-টা হাঁচিতে তা চাপা পড়ে গেল।

pathagar.net

আর ওদিকে ভজুদার ফরমাসি মুখই তখন ফ্যাকাশে মেরে গিয়ে জিভ তোতলা হয়ে এসেছে।

'এ তো সে-সে-সে হাঁ-হাঁ-হাঁচি নয়। তু-তুমি তা-তা-তাহলে মা-নু-ষ!'

শেষ কথাটা যেন উচ্চারণ নয়, একেবারে আর্তনাদ। সেই সঙ্গেই ভজুদাও একেবারে সত্যি সত্যি হাওয়া!

'ভজুদা! ও ভজুদা! শুনুন, শুনুন!' গলা চিরে গেল চিৎকার করতে করতে। কিন্তু কোথায় পাব আর ভজুদাকে। ধারে কাছে ঘেঁষবার ভয়ে যে মানুষকে ভজুদা তাড়িয়ে বেড়ায়, বাঘের ঘরে ঘোঘের মতো সেই মানুষই তাকে ঠকিয়ে তার আস্তানায় ডেরা পেতেছে, এ আর সে সহ্য করতে পারে?

মানুষের ভয়েই ভজুদা একেবারে মুল্লুক-ছাড়া। আমার প্রেতপুরাণ মনের মতো করে লেখা আর হল না।"

* * *

মেজকর্তার খেরো খাতার বৃত্তান্তও এইখানেই শেষ। আঁতিপাতি করে ঘেঁটেও ভজুদার কথা আর কোথাও খুঁজে পাইনি।

pathagar.net

মেজকর্তার খেরো খাতা

"ঠিক পিলপিল করে যেন কালো সুড়সুড়ে পিঁপড়ের সার বেরিয়ে আসছে।

চোখটা একবার, দুবার, তিনবার রগড়ালাম।

না, ভুল কিছু দেখিনি। আলোটা বেশ আবছা গোছের হলেও, যা দেখছি সেটা দৃষ্টিবিভ্রম ধরনের কিছু নয়।

সত্যিই ওদিকের টেবিলে রাখা মোটা সেকেলে বাঁধানো বইটাতে কাছের সেল্‌ফের ওই ধরনেরই একটা পুরনো বাঁধান ঢাউস বই থেকে একসার কালচে পিঁপড়ের মতো কী যেন সুড়সুড় করে ঢুকছে।

কী ওগুলো? পিঁপড়ে? কীরকম পিঁপড়ে?

উইপোকা ছাড়া পিঁপড়ে কি পুরনো বইয়ের মধ্যে বাসা বাঁধে, না, এক বই থেকে আর-এক বইয়ে অমন পিলপিল করে গিয়ে ঢোকে?

হঠাৎ হাঁপানি রুগির খন্‌খনে কাশির মতো একটা আওয়াজ চমকে উঠলাম।

হাঁপানি রুগির কাশি নয়, ডান দিকের দেওয়ালে ঝোলান মান্ধাতার আমলের দেওয়াল-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ। কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের জরায় আওয়াজটা অমন কেশো রুগির মতো হয়েছে।

আওয়াজ যেমনই হোক, ঘড়িটা যে এখনও চলছে এইটেই আশ্চর্য! ও ঘড়ির একটা বাজা মানে অবশ্য প্রায় পৌনে দুটো। দিনে পনেরো মিনিট করে পিছিয়ে পড়া এখন ওর দস্তুর। তিন দিন আগে আমি নিজেই যখন দম দিয়েছি, তখন হিসেবমতো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেছনে পড়েছে নিশ্চয়।

পৌনে দুটো!

মাথার ভেতর যেন একটা বিদ্যুতের মতো চমক লাগল!

হ্যাঁ, এই তো সময়! সমানে তিন রাত্রি জাগার পর ঠিক রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে যা দেখবার, দেখতে পাব!

কিন্তু তা কি পেয়েছি?

pathagar.net

দেখবার মধ্যে তো দেখেছি এক বই থেকে এক সার খুদে পিঁপড়ের আর-এক বইয়ে গিয়ে ঢোকা!

এছাড়া আর কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।

এদিক ওদিক সব দিক তাকালাম। বেশি দূর তাকাবার তো নেই। প্রায় মান্ধাতার আমলের বাড়ির ছোট্ট একটা ঘর। ছাদের কড়িকাঠগুলো একটু লাফ দিয়ে হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। নেহাত সেকেলে বর্মা টীকের বলে সে-কড়িকাঠ ভেঙে ছাদটা এখনও ধসে পড়েনি। দেওয়ালগুলোর কিছু যেটুকু দেখা যায়, নোনা লেগে পালিশ-পলেস্তরা ঝরে গিয়ে যেন পুরনো ইঁটের দাঁত বের করে আছে।

সে-দেওয়ালের কতটুকুই বা অবশ্য দেখা যায়! যেদিকে চাও, মেঝে থেকে ছাদ অবধি সব পুরনো বইয়ে ঠাসা কাঠের তাক আর আলমারি।

এই বইয়ের গাদা বাদে ঘরের মধ্যে একটি টেবিলে, দুটি টিনের চেয়ার, যেটাতে হেলান দিয়ে বসে আছি সেই একটা সেকেলে আরামকেদারা, আর দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে তিন-কাল-গিয়ে-এক-কালে-ঠেকা দেওয়ালঘড়িটা।

এ ছাড়া ঘরের ছাদ থেকে একটা বিজলি-বাতির ডুমও ঝোলান আছে বটে, কিন্তু তার ধুলো-জমা কাচের খোলস পেরিয়ে যে মিটমিটে আলোটুকু আসে, তাতে ঘরটা আলো-আঁধারির বেশি স্পষ্ট হয় না।

নিজের অজানতে একটু তন্দ্রার ঘোর কি এসেছিল? আর সেই ঘোরের মধ্যে ঘরের আলো-আঁধারিতে অর্ধ-স্বপ্নগোছের কিছু দেখলাম না কি?

যা-ই হয়ে থাক, সরাসরি একবার পরীক্ষা না করলেই নয়।

কেদারা থেকে উঠে টেবিলের ধারের চেয়ারটায় বসে তার ওপরকার বইটা খুললাম।

অস্ফুট চিৎকারটা আর চাপতে পারলাম না তারপর!

সেই! সেই ছবি!

আর তার তলায় ছাপার অক্ষরে সেই এক লেখা—"

* * *

ওই পর্যন্ত পড়েই থামতে হল। তারপরে কী আছে তা জানতে হলে খেরো খাতাটার হলদে-হয়ে-আসা পিঁজতে-শুরু-করা পাতাটা সন্তর্পণে ওল্টাতে হবে।

পাতা ওল্টাতে সত্যিই ভয় করছে।

ভয়ংকর কী সেখানে লেখা থাকতে পারে শুধু সেই জন্যে ঠিক নয়, মোটেই কিছু পাব কি না সেই সংশয়ে আর উদ্বেগেও।

এ খেরো খাতাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। সত্যিই সেরকম কিছু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

pathagar.net

এত ধুকপুকুনি নিয়ে পাতা উল্টে হয়তো দেখব এতক্ষণ যা পড়ছিলাম, পরের পাতায় তা বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেছে।

মহাভারতের মতো বিরাট এলোমেলো এই খেরো খাতার যতটুকু পর্যন্ত এখনও হাঁটকাতে পেরেছি, তাতে এরকম হতাশ দু-একবার হতে হয়নি এমন নয়।

হারিয়ে-যাওয়া গল্পের খেই এ-খাতার গোলকধাঁধার মধ্যে আবার আচমকাও যে কখনও-কখনও ফিরে পেয়ে গেছি, সে-কথাও অবশ্য স্বীকার করব।

পাতাটা ওল্টাতে গিয়ে এই থমকে পড়ার মধ্যে এই খেরো খাতার ইতিহাসটাও একটু বোধহয় মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

হ্যাঁ, এই সেই খেরো খাতা, কলকাতার সব চেয়ে লম্বা দৌড়ের পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাস-এর একটা খালি সীটে যেটা লাল শালুর পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল। বাসটা তখন ভি আই পি রোড ধরে এয়ারোড্রোমের দিকে যাচ্ছে। পুঁটলিটার কোনও দাবিদার না পেয়ে টার্মিনাসে পৌঁছবার পর কন্ডাক্টার সকলের সামনে সেটা খুলে দেখেছে। সোনাদানা গোছের দামি কিছু নয়, ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা বেরঙা কাগজের একটা হাতে-সেলাই পুরনো খেরো খাতা মাত্র পাওয়া গেছে তার ভেতর। একটু উল্টে-পাল্টে কাগজগুলোয় জড়ান সাবেকি ছাঁদের যে হাতের লেখা চোখে পড়েছে, তা যে দলিলপত্রের নয় তা বুঝতে দেরি হয়নি। ভাল করে নেড়েচেড়ে ভেতরে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে মালিকের কাছে পৌঁছে দেবার কড়ারে খাতাটা আমি চেয়ে নিয়েছিলাম তারপর।

যতটা ঘাঁটাঘাঁটি এ পর্যন্ত করতে পেরেছি, তাতে কোথাও পাঠাবার মতো নাম-ঠিকানা এখনও কিন্তু পাইনি। পেয়েছি শুধু মেজকর্তা বলে একটা নাম। তিনি যে কোথাকার কবেকার কে, কিছুই বলার উপায় নেই। এইটুকু শুধু জানা গেছে যে, বিষয়-আশয় কিছু থাকার দরুন অবস্থাপন্ন হলেও সেসব না-দেখে একটি নেশা নিয়েই তিনি দিন কাটাতেন। সে নেশা হল ভূত-শিকার! সেই ভূত-শিকারের নেশায় তিনি চারিদিকে চর লাগিয়ে রাখতেন বলা যায়। কোথাও এতটুকু একটা খবর পেলেই তোড়জোড় করে ছুটতেন ভূতের খোঁজ নেবার জন্যে।

ঢাউস খেরো খাতাটা মেজকর্তার সেইসব ভূত-শিকারের বৃত্তান্তে ঠাসা। কিন্তু তাঁর সাবেকি ছাঁদের লেখা যেমন জড়ান আর অস্পষ্ট, তাঁর বর্ণনা-টর্ণনাও তেমনই এলোমেলো। তার ওপর খাতার অনেক পাতাই ছেঁড়া-খোঁড়া আর আলগা। কোথাকার লেখা যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে খুঁজে পাওয়াই দায়।

তবু পড়তে পড়তেই যেন একটা নেশা ধরে গেছে। এখন খেরো খাতার মধ্যে কোথাও সঠিক নাম-ঠিকানা খুঁজে পাওয়াটাই ভয়ের ব্যাপার! নাম-ঠিকানা পেলেও মনের জোর করে খাতাটা এখন ফেরত দিতে পারব কি না সন্দেহ। কারণ মেজকর্তার এই ছেঁড়াখোঁড়া খেরো খাতায় তাঁর জড়ান অস্পষ্ট সেকেলে হাতের লেখার জঙ্গলে

boiRboi.net

pathagar.net

এমন সব অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া ভূতুড়ে গল্প ছড়িয়ে আছে, যা খুঁজে-পেতে উদ্ধার করাটাই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান হয়েছে।

এবারের এই বৃত্তান্তটাই ধরা যাক। জলা-জংলা কি অজ পাড়াগাঁর পোড়ো দালান কোঠা-টোটা নয়, এই কলকাতা শহরেরই একটি পুরনো বাড়ির বইয়ে ঠাসা একটা লাইব্রেরি-ঘর গোছের। সেই ঘরের অদ্ভুত-কিছু ব্যাপার শুনে সেখানে রাত জাগতে গেছেন মেজকর্তা। মেজকর্তা গলির নাম করেননি, কিন্তু গলি আর বাড়িটার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সেটা উত্তর কলকাতার কোনও আদ্যিকালের ঘিঞ্জি, সিপাই-যুদ্ধের আগেকার সব বসতির পাড়া বলেই মনে হয়।

সেই পাড়া, সেই গলি আর সেই বাড়ি বা লাইব্রেরি-ঘরের অস্তিত্ব এখন আর নেই নিশ্চয়। মেজকর্তা যখন সেখানে গেছেন, তখনই বাড়িটার জরাজীর্ণ অবস্থা। আর লাইব্রেরি-ঘরটা তো একটু জোরে নাড়া দিলেই যেন হুড়মুড় করে ধসে পড়তে পারে।

তবু এমন একটা ঘরে রাত কাটাতে গেছলেন কেন মেজকর্তা? কীরকম ভূতের সন্ধানে?

মামুলি খোনা গলার কি চোখের পলকে বিদঘুটে চেহারায় দেখা-দেওয়া আর মিলিয়ে- যাওয়া ভূতটুত নয়, তাঁকে নাকি একেবারে উদ্ভুটে এক ভূতুড়ে কাণ্ডের খবর দিয়েছে তাঁর চর।

কী সে কাণ্ড, সে চর তা জানে না, বা বলতে পারেনি, কিন্তু পরপর তিন রাত্তির যে কেউ ওই বই-ঠাসা ঘরে কাটাতে না পেরে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে, সে কথাটা বলেছে জোর দিয়েই।

মেজকর্তা তাই গোঁ ধরে এই ঘরে রাতের আস্তানা করেছেন এ ক-দিন।

প্রথম দিন কেটেছে, তারপর দ্বিতীয় দিনও। আজ হলেই তিন রাত কাটবে।

কিন্তু কাটবে কী ভাবে!

মেজকর্তা আগের দু রাতের কথা কিছু লেখেননি, শুধু এই ভূতুড়ে লাইব্রেরিতে রাত জাগতে আসার ভূমিকাটুকু করে একেবারে তিন দিনের দিন রাত পৌনে দুটোর ঘটনা দিয়েই শুরু করেছেন।

কিন্তু শুরু করে যতদূর এসেছেন, পরের পাতায় তার জের ঠিকমতো টেনেছেন কি?

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার মধ্যে কাটিয়ে বেপরোয়া হয়ে পাতাটা উল্টেই ফেললাম এবার। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে বেরিয়ে-আসা অস্ফুট চিৎকারটুকুও চাপতে পারলাম না।

ও পিঠে মেজকর্তা আগের পাতার জের টানতে ভোলেননি। কিন্তু প্রথমে যা চোখে পড়ল, তা লেখা-টেখা নয়, একটা ছবি। মেজকর্তার হাত পাকা না হোক, ছবিটার আসল কাজ তাঁর আঁকায় হাসিল হয়েছে।

ছবিটা সামনের দিকে আঙুল-তুলে-দেখানো একটা হাতের কঙ্কালের। এমনভাবে আঁকা যে, আঙুলটা যেন যে পড়ছে তার দিকেই তোলা মনে হবে।

pathagar.net

"হ্যাঁ, সেই ছবি!" এই বলে ছবিটার নীচে থেকে মেজকর্তার হাতের লেখা আবার শুরু হয়েছে, আর তার নীচে ছাপার অক্ষরে সেই শাসানি!

"যে-ই হও, এ ছবি দেখে এ লেখা যখন পড়েছ, তখন তোমার আর নিষ্কৃতি নেই। আমি হলধর পাল। নিজের আসল সাধ মিটিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু তুমি, তুমি আমার আশ মেটাবে। না মেটালে, যেখানেই পালাও না কেন, আমার এই হাত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ভিড়ের মাঝে থাকবে, তোমার জামার তলায় পিঠের ওপর আঙুল বোলাবে, একলা ঘরে ঘুমের মধ্যে ঝুলবে তোমার চোখের সামনে। লিখতে বসলে তোমার হাতের সঙ্গে কলম চেপে ধরবে, আর আয়নার সামনে দাঁড়ালে দেখবে তার মধ্যে থেকে হাতছানি দিচ্ছে। যা বলছি, মন দিয়ে তাই শুনে নাও। উত্তর-পুব কোণের আলমারিটা খোলো। তার নীচের তাকে ছাপানো একটা বইয়ের বান্ডিল পাবে। বইয়ের নাম 'বচনামৃত'। কবিতার বই। আমার লেখা। হরচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গালা গেজেট' বইটাকে গাল দিয়েছে। লিখেছে—'পাল মশাই লাঙ্গল চালাইলেই পারেন, তৎপরিবর্তে কলম চালাইবার নিমিত্ত অমৃত গরল হইয়াছে।' এ গালাগালের জবাব 'সমাচার দর্পণে' বার করতে হবে। কালই বই নিয়ে গিয়ে দেখা করব মার্শম্যান সাহেবের সঙ্গে। নইলে—"

শাসানিটা সব তুলে দিয়ে মেজকর্তা আবার সেই কঙ্কাল-হাতটা এঁকে তার তলা থেকে লিখেছেন—

"ওপরে নীচে কঙ্কাল-হাত-আঁকা এই শাসানি পড়ে ভয় যত পেলাম, তাজ্জব হলাম তার চেয়ে বেশি।

এ ছবি আর এ লেখা আমি আগেও এই পাঠাগারেই দেখেছি। একবার দুবার নয়। বেশ কয়েকবার। আগের দু রাত্রে নানা শেল্‌ফ থেকে যে ক-টা বই-ই টেনে বার করেছি, তা খুলে ধরতে প্রথমে এই ছবি-আঁকা এই লেখা-ছাপা পাতাটাই দেখা গেছে।

কিন্তু আজ রাত্রে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বইটায় এ লেখা আর ছবি আসে কী করে?

আজ রাত্রে এ-ঘরে ঢুকে সেল্‌ফের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ওই বইটা পেয়েছিলাম। সেই একেবারে আদ্যিকালের বই, আঠারশো বাইশে ছাপানো সংস্কৃত হাসির নাটকের অনুবাদ 'হাস্যার্ণব'।

বইটা ভাল করে উল্টে-পাল্টে দেখে পরে পড়বার জন্যে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। বইটার কোথাও ও ছবির বা শাসানির চিহ্নমাত্র ছিল না। তা হলে ও লেখা ও বইয়ের মধ্যে এল কী করে?

রাত পৌনে দুটোয় যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি তারই ভেতর কি এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা আছে? পিলপিল করে পিঁপড়ের সারের মতো শেল্‌ফের বইটা থেকে এ বইয়ের মধ্যে যা ঢুকতে দেখেছি, তা কি তা হলে এই লেখা আর ছবির ভূতুড়ে অক্ষর? হলধর পাল কি তাঁর 'বচনামৃত'-এর নিন্দের শোধ নেবার জন্যে এমনই করে এখনও মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

pathagar.net

কিন্তু আমি কী করতে পারি? ঘরের উত্তর-পুব কোণে কোনও আলমারি আর নেই। হলধর পালের 'বচনামৃত'-এর কোনও কপিও কোথাও খুঁজে পাইনি। আর পেলেই বা করতাম কী? 'বাঙ্গালা গেজেটি'র নামই এখনও শুনি। আসল নাম ছিল 'উইক্‌লি বেঙ্গল গেজেট'। লোকে বলত 'বাঙ্গাল গেজেটি'। সেইটেই নাকি প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক। কিন্তু সে কাগজের একটা নমুনাও কোথাও পাওয়া যায় না।

আর 'সমাচার দর্পণ' আঠারশো আঠারো থেকে মরে-বেঁচে আঠারশো একচল্লিশ পর্যন্ত কোনরকমে টিঁকে থেকে একেবারে শিঙে ফুঁকেছে। সে কাগজ এখন পেতাম কোথায়?

না, এমন আজগুবি আবদার শুনতে এখানে থাকারই কোনও দরকার নেই।"

* * *

মেজকর্তার লেখা ওখানেই শেষ হয়েছে। তাঁর শেষ কথাগুলো পড়ে সন্দেহ হয় যে, তিনি সেই রাত্রেই বোধহয় ও ঘর থেকে ভয়ে ভয়ে সরে পড়েছেন।

হলধর পালের কঙ্কাল-হাত কি তারপর তাঁর পিছু নিয়েছে? তাঁর খেরো খাতায় এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও হদিস পাইনি।

pathagar.net

মাথায় চন্দ্রবিন্দু

হ্যাঁ, গোটা মুল্লুকের মাথাতেই চন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সে বৃত্তান্ত বলার আগে মেজকর্তার কথা একটু বলে নিতে হবে। মেজকর্তা মানে সেই মেজকর্তা, যাঁর ছেঁড়াখোঁড়া, হলদে-হয়ে-আসা পাতার খেরো খাতাটা লাল শালুর একটা ফালিতে পুঁটলি-বাঁধা অবস্থায় কলকাতায় দক্ষিণ থেকে উত্তরের সব চেয়ে লম্বা পাড়ির বাস-এর একটা বেঞ্চিতে ভি আই পি রোড ছাড়িয়ে এয়ারপোর্টে যাবার রাস্তায় বেওয়ারিশ হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল।

যারা বেঞ্চির ওপর পুঁটলিটা পড়ে থাকতে দেখেছিল, আমি তাদের একজন।

বাস-এ তখনও যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ যখন পুঁটলিটা নিজের বলে দাবি করেননি, তখন বাইরের চেহারা দেখে আর ভেতরটা টিপে টিপে বের করার চেষ্টা করে পুঁটলিটা খুলে ফেলতে দোষ নেই বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।

পাঁচজনের সাক্ষাতে খুলে তার মধ্যে ওই বেরঙা তেলচিটে ছেঁড়া-খোঁড়া এলোমেলো আলগা পাতার খেরো খাতাটা দেখবার পর পুঁটলিটা সম্বন্ধে কেউ আর উৎসাহ বোধ করেনি। আর আমি একটু নেড়েচেড়ে দেখে নাম-ঠিকানা কিছু পেলে সেখানে পাঠিয়ে দেব বলে কথা দিয়ে খাতাটা তখনকার মতো বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে আপত্তি হয়নি কারও।

খেরো খাতাটা বাড়িতে নিয়ে এসে আমি যে ঘাঁটাঘাঁটি করার দায় নিয়েছিলাম সেটা নেহাত নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রেরণায় কিন্তু নয়। বাস-এর মধ্যেই খাতাটা পুঁটলি থেকে বার করার সময় তার ছেঁড়া সব আলগা পাতার একটা-দুটো কথা আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল আর সেকেলে হাতের ধাঁচে লেখা সে কথা ক-টাই মনটাতে একটু রহস্যের সুড়সুড়ি দিয়েছিল লাগিয়ে।

পুঁটলি-বাঁধা খেরো খাতাটা বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে যাবার আগ্রহটা তাই ছিল অত বেশি।

pathagar.net

বাড়িতে এসে খাতাটা ঘাঁটাঘাঁটি করবার পর বাস-এর মধ্যে প্রথম পাওয়া সুড়সুড়িটা নেহাত মিথ্যে ছিল না বলেই অবশ্য প্রমাণ পেয়েছি। কষ্ট করে এ বেয়াড়া পুঁটলিটা বাড়ি বয়ে আনা পণ্ডশ্রম হয়নি।

তবে যতদূর পর্যন্ত খাতাটার মর্মোদ্ধার করেছি তার মধ্যে এ খাতার মালিকের কোনও নাম-ঠিকানার হদিস কিন্তু মেলেনি।

পাবার মধ্যে পেয়েছি মেজকর্তা বলে একটা নাম আর তাঁর বাতিকের বৃত্তান্ত। কিন্তু তিনি কবেকার কোথাকার কী জাতকুলশীলের মানুষ তার কিছু মাত্র আভাসও মেলেনি।

তা না মিলুক, তাঁর বাতিকের বৃত্তান্তই ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। বাস-এ খেরো খাতার পুঁটলি খোলবার সময় দু-একটা কথা যা হঠাৎ চোখে পড়েছিল সেগুলোর রহস্যের সুড়সুড়িতে ফাঁকি ছিল না। সত্যিই আশা যা জেগেছিল তা মিটেছে।

কথা ক-টা কী জাতের যে ছিল তা এতক্ষণে কারও ধরে ফেলতে আর বোধহয় বাকি নেই।

হ্যাঁ, তার একটা হল 'গায়ে কাঁটা' আর একটা 'অশরীরী' আর বাকিটা একেবারে সোজাসুজি 'ভূত শিকার'।

মেজকর্তার খেরো খাতা আগাগোড়া শুধু ভূতুড়ে গল্পে ভরা। সে সব ভুতুড়ে গল্পও একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

প্রথমে একটা-দুটো গল্প পড়ে বিবেকেব দংশনে পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়েও দিয়েছি। ঠিকানা যাঁর মেলেনি তিনি যাতে কাগজে ছাপান গল্প পড়ে নিজের বলে চিনতে পেরে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে খাতাটা দাবি করতে আসতে পারেন।

তিনি আসবেন এটা কিছু আশা নয়, ভয়। প্রথম গল্প ছাপা হবার পর থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি, কখন হঠাৎ নীচে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে, আর জানলা থেকে 'কে?' বলে সাড়া দিতে অচেনা গলায় শুনতে পাই—'আমি মেজকর্তা, আমার খেরো খাতাটা নিতে এসেছি।'

না, এখনও পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি। সুতরাং ভয়ের ধুকপুকুনি নিয়েই আর-একটা গল্প সকলকে শোনাতে পারি।

এটাও মেজকর্তার ভূত শিকারের বৃত্তান্ত। মেজকর্তার নিজের জবানিতেই তাই শোনাচ্ছি—

* * *

"বটকেষ্টর ওপর তখন রাগ যা হচ্ছিল তাতে সামনে পেলে তাকে আর আস্ত রাখতাম না।

হতভাগা শেষ পর্যন্ত এমনই করে আমায় মিথ্যে হয়রানি করাবে তা ভাবতে পারিনি।

pathagar.net

Pandora.net

হয়রানি অবশ্য আমি গ্রাহ্য করি না যদি তাতে যা চাইছি আখেরে তা মেলে। কিন্তু এ তো দেখছি একেবারে কাটা কানের পেছনে ছুটে মরা, যার পেছনে ছুটছি সেটা সত্যিই কাটা কান কি না তারই ঠিক নেই।

বটকেষ্ট তার চিঠির চিরকুটটায় শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে লিখেছিল যে, এবারে সে এমন পাকা খবর পেয়েছে যার আর মার নেই।

কোনও রকমে বেনাপোলের হাটে গিয়ে পৌঁছে গেঁয়োখালার রাস্তাটা ধরে এগোলেই হল। গোটা অঞ্চলটারই মাথায় যেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া। সব সেই 'তেনা'দের রাজত্ব। সন্ধ্যের পর মানুষজন তো ছার, কুকুর-বেড়ালও নাকি হাটে মাঠে থাকে না। তেমন দায়ে পড়ে বার হত হলে রঘুপতি রাঘবের নামটা মনে মনে জপতে হয় আর দৈবাত আর কোনও জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গলার আওয়াজটা লক্ষ করতে হয়। রাত-বিরেতে ও অঞ্চলে নাকি খোনা আওয়াজ ছাড়া কিছু শোনাই যায় না।

বটকেষ্টর এসব রং-চড়ান ব্যাখ্যানে আমার অবশ্য হাসিই পেয়েছে। আহাম্মকটা কোথায় কেমন করে রং চড়াতে হয় তাও জানে না। তার ওসব বর্ণনা শুনে আমি এত দূর আসিনি।

তার একটা কথাই শুধু আমার মাথার মধ্যে ঝনাৎ করে গিয়ে বেজেছে। সে লিখেছে, 'গোটা অঞ্চলটার মাথাতেই যেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া।' এ রকম কথা তো আমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করা শ্রীমান বটকেষ্ট শর্মার মাথায় আসবে না। এ কথাটা ওখানেই সে কারও মুখে শুনেছে নিশ্চয়। আর এমন একটা কথা যাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তিনি শুধু কোনও মৌতাতের খুশির খেয়ালে শূন্য হাওয়ার ওপর অমন একটা লাগসই বর্ণনা বানিয়ে তুলতে পারেন না। তা সম্ভব নয়। একটুখানি সার এমন বর্ণনার তলায় কোথাও অবশ্যই আছে।

গোটা অঞ্চলটার মাথাতেই যেন চন্দ্রবিন্দু দেওয়া।

বেনাপোলে পৌঁছবার কোনও ঝামেলাতেই গা করিনি ওই বুকনিটি যাঁর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আশায়। হাটতলায় পৌঁছে ওরকম কথা বলতে পারে এমন মানুষের খোঁজ করেছি প্রথম।

কিন্তু কোথায় কাকে পাব—সব তো ভোঁ ভোঁ বললেই হয়। হাটবার অবশ্য দু দিন আগেই পার হয়ে গেছে। ভাঙা হাটে দু-চারজন ফড়ে শুধু ঝড়তিপড়তি কিছু সওদা এখনও ছড়িয়ে বসে আছে, নইলে হাট একেবারে ফাঁকা। হোগলার চালগুলোও গুটিয়ে তুলে নিয়ে যাবার পর দোকানপাটের বাঁশের ন্যাড়া খুঁটিগুলোই শুধু মাথা উঁচিয়ে আছে।

ফড়ে দু-চারজন যে আছে তা নেহাত দায়ে পড়েই বোধ হয়। আর সেই জন্যেই মেজাজ তাদের হয় তিরিক্ষি, নয় গোঁজ।

যারা গোঁজ তারা কথা বললে কেউ উত্তরই দিতে চায় না।

pathagar.net

নিজের গরজেই কারও কাছে গিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করি। তার বিছানা সওদাগুলো দেখে নিই অবশ্য তার আগেই। সরষের দানা, পোস্ত, হলুদ, তিল, এইসব নিয়েই তার বেসাতি।

আলাপটা তার ওপরই চালাতে হবে। তবে প্রথমে গায়ে পড়ে আপনার জন হয়ে উঠে একটা মনগড়া সমস্যার পরামর্শ চাইলাম, 'ও ভালোমানুষের পো, এখানকার মানুষ-জন যেন কেমনতরো। পথে জ্বরে পড়ে এ হাটবারে পৌঁছতে পারিনি। তাই আর হাটবার পর্যন্ত থেকে যেতে চাই। তা এ ক-দিনের জন্য একটা আস্তানার একটু খবর কেউ দিতে চায় না। এখানে চটি কি ধরমশালা বলে তো কিছু নেই। ক-দিন নিজেই না হয় একবেলা ডালে-চালে ফুটিয়ে খাব। কিন্তু রাত্তিরটুকু মাথা গুঁজে থাকবার মতো কোনও আস্তানা মিলবে?'

এতক্ষণ যে বকে মরেছি তা ভাল মানুষের পো পোস্ত-হলুদ-তিল-সরষের ফড়ে একবারও মুখ তুলে তাকায়নি। তাকে একটু মুখ তুলে চাওয়াবার জন্যেই কথাটা এমন টেনে লম্বা করেছি। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি তাতে। আমায় যেন চোখেই দেখতে পাচ্ছে না, ফড়ে বাবাজির এমন মুখ-গোঁজ-করা অগ্রাহ্যি।

তার অগ্রাহ্যিটা যেন লক্ষই করেনি এমন ভাব দেখিয়ে এবার বসেই পড়েছি বিছান সওদাগুলোর এক পাশে। তারপর ফতুয়ার জেব থেকে বার্ডসাই-এর বাক্স বার করে তা থেকে একটা বার্ডসাই এগিয়ে দিয়েছি ফড়ে বাবাজির দিকে।

বলেছি— 'চলবে নাকি?'

এই ফিকিরে কাজ একটু হয়েছে। গোমড়া মুখ নরম হয়নি, কিন্তু ফড়ে বাবাজি হাত বাড়িয়ে বার্ডসাইটা নিতে অন্তত গড়িমসি করেনি। সেটা নিয়ে চোখের দু আঙুলে ধরে এদিক ওদিক পাক দিয়ে ঘুরিয়ে যেন যাচাই করে নিয়ে বাবাজি সেটায় আমার জ্বালান দেশলাইয়ের কাঠিটা ছোঁয়াতে দিয়েছে।

কিন্তু তাতেও লাভ যা হয়েছে বার্ডসাই-এর ধোঁয়াটুকুর বেশি কিছু বোধহয় নয়।

আগে যা জিজ্ঞেস করেছি তা যেন ফড়ে বাবাজির কানেই যায়নি। কথাটা আবার তাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি একটু ভনিতা করে।

'বলছিলাম কি, চারটে দিন বাদেই তো পরের হপ্তার হাট। এ ক-টা দিন আবার টানা-পোড়েন করে মরি কেন? এখানে এ ক-টা দিন থাকবার একটা জায়গা জোটে না?'

জবাব এবার মিলল। কিন্তু এ আবার কী রকম জবাব?

বার্ডসাইটা হাতের মুঠোর ভেতর কলকের মতো ধরে ফড়ে বাবাজি একটিমাত্র বাক্যি ছাড়লেন বার্ডসাইটার বকশিস হিসেবেই বোধহয়। বাক্যিটি এই—

'এখানে থাকতে নেই!'

ভাল রে ভাল! তোর কাছে উপদেশ কে চাইছে!

pathagar.net

এই ভেবে রেগে উঠতে গিয়ে হঠাৎ যেন টনক নড়ল।

আরে, এই তো আমার লাইনে পড়া কথা! এখানে থাকতে নেই? কেন থাকতে নেই? থাকতে নেই তো লোকে আছে কী করে? ফড়ে বাবাজি নিজেই থাকে কোথায়?

প্রশ্ন তো অনেকগুলোই আসে। তার মধ্যে কোনটা আগে করলে আমার লাইনটা চালু থাকে?

গোলে পড়ে শেষেরটাই আগে তুলে বসলাম।

'থাকতে নেই তবু থাকে তো কেউ কেউ। যেমন বাবাজীবন নিজে। তা বাবাজীবনের নিজের কোথায় থাকা হয়?'

ফড়ে বাবাজির তখন বার্ডসাইটাও শেষ হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে গলার ফুটোও এসেছে বুজে।

প্রায় না শোনার মতো গলায় জবাব দিলে, 'তাতে কার কী দরকার?'

সেই সঙ্গে শেষ-হওয়া বার্ডসাই-এর টুকরোটাও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার খাতিরটা এখন কী তাই বোধ হয় বুঝিয়ে দিলে।

এখানে বসে গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টা করে আর লাভ নেই। তাই উঠেই পড়লাম।

এবার আর কী করা যায়? গোমড়া মুখের কাছে এই খাতিরের পর তিরিক্ষি বাবাজির কাছে যে কী খিঁচুনি শোনা যাবে, তাও জানাই আছে।

তবু দোনামোনা হয়ে ভাগ্যিস একবার কাছে গিয়ে কথাটা পেড়েছিলাম!

জবাবটা যেমন আঁচ করেছি তেমনই এল অবশ্য প্রথমে। দাঁত খিঁচিয়ে বেশ চিড়বিড়িয়ে উঠে তিরিক্ষি বাবাজি বললে, 'না! না! থাকবার জায়গা-টায়গা জানি না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর আমার তিনকেলে সম্বন্ধী এসেছেন আমার সঙ্গে রসিকতা করতে! উনি বেনাপোলের হাটে থাকতে চান!'

একেবারে তেলাকুচো-বাটা মাখান গলাটা শুনেই চলে আসতে গিয়েও কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল।

তিরিক্ষি বাবাজি বলছে কী? এ দাঁতখিঁচুনির ভেতর যেন একটা কী অন্য ইশারা আছে!

ইশারাটা তিরিক্ষি বাবাজির কথাটা শেষ হতেই ফুটে বেরোল।

বাবাজির শেষ টিপ্পনিটা হল, 'অত যদি চন্দ্রবিন্দুর শখ তো এখানে কেন? কলিমুদ্দির সওয়ারি হলেই পারেন!'

কে কলিমুদ্দি? তার কীসের সওয়ারি? চন্দ্রবিন্দুর শখ বলতে আমি যা শুনে ছুটে এসেছি তাই বোঝাচ্ছে কি?

এ সব কিছুই জানবার আর উপায় নেই। আমায় দাঁতখিঁচুনিটুকু দিয়েই ফড়ে বাবাজি তখন তার ঝোলাঝুলি গুটিয়ে পাশে দাঁড় করান বাঁশের ছোটো ঠেলাটায় তুলতে শুরু করেছে। ঠেলাটা নিজেই কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে কে জানে! আমার দিকে কিন্তু

pathagar.net

ভ্রূক্ষেপ নেই। জবাবের জন্য বার কয়েক মিথ্যেই সাধাসাধি করে শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেলাম।

যা করবার নিজেই এবার করব। আর কিছু না হোক চন্দ্রবিন্দুর নাম তো একবার শুনেছি। এখন কে কলিমুদ্দি, কেমন তার সওয়ারি হওয়া সারা রাত জেগে তাই অন্তত দেখব।

অনেক পোড়ো ভিটেতে রাত কাটিয়েছি। উদোম মাঠ-ময়দানে শুয়ে থেকেছি সারা রাত। কিন্তু বেনাপোলের হাটতলা না ঘর, না ঘাট। না ভিটে, না মাঠ।

সেই জন্যেই ছমছমে অস্বস্তির ভাবটা অনেক বেশি।

ভাঙা হাটেরই আজ ছিল শেষ দিন। সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই গোঁজ আর তিরিক্ষি দুই ফড়েই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়েছে।

সব একেবারে খাঁ খাঁ। তার ওপরে একেবারে উদোম মাঠ না হয়ে একটুখানি মানুষ-জনের গন্ধ-লেগে-থাকা ব্যাপারীদের ফেলে যাওয়া ঘরগুলোর নাঙ্গা বাঁশের খুঁটিগুলোর দরুন জায়গাটা কেমন যেন, কেমন যেন—হ্যাঁ, ঠিক লাগসই কথাটাই পেয়েছি—কেমন যেন মাথায় চন্দ্রবিন্দু লাগান!

জনমনিষ্যি তো কোথাও নেই-ই, একটা কুকুর বেড়ালও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকা হাটের এক কোণে গোলদারদের একটা টিনের গুদোমঘর আড়-করা বাঁশের হুড়কো আর তালা দিয়ে বন্ধ করা। দমকা উত্তুরে হাওয়া মাঝে মাঝে তারই গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাথার টিনের চাল কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত গোঙানি গোছের শব্দ তুলে যাচ্ছে।

শীতের শুরু। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটা বাড়ছে। গরম চাদরটা ভাল করে গাঁয়ে জড়িয়েও দমকা হাওয়ার ঝাপটা এলে একটু কাঁপুনিই ধরছে।

এমন করে এই জায়গাটাতেই রাত কাটান খুব আরামের হবে না। রাত্রে ঘুমোবার ইচ্ছে থাকলে উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটা এড়াবার জন্যে উদোম ঘরটায় দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষেই শুতে হবে।

কথাটা মনে করেই নিজেকে একবার চাপড়াতে ইচ্ছে হল।

শুয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটাতেই এখানে এসেছি নাকি! এখন খোঁজ করতে হবে তো কলিমুদ্দির। সওয়ারি হতে হবে তার গাড়ির। তবেই চন্দ্রবিন্দুর সাধ মিটবে।

কিন্তু কোথায় করব কলিমুদ্দির খোঁজ? সে খোঁজ কি হাটতলায় চাদর জড়িয়ে বসে থেকে মিলবে? তার কী গাড়ি, কেমন গাড়ি, কিছুই জানি না। তবু সওয়ারি হবার গাড়ি যখন, তখন তা তো এই হাটতলার ওপর নয়, রাস্তাতেই চলবে।

খোঁজ করতে হলে সেই রাস্তাতেই করতে হয়।

কিন্তু তাই বা কোথায় করব ভেবে তো কূল-কিনারা পেলাম না। বেনাপোলের এ হাটতলায় আসবার তো এই একটাই রাস্তা। বাজারঘাটে খেয়া পার হবার পর মাঠ বন

pathagar.net

বাদাড়ের ওপর দিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ প্রায় হাড়গোড় ভাঙা এক গোরুর গাড়িতে যে এসেছি তাতে দূরে প্রায় লি-লি করা একটা-দুটোর বেশি গাঁ-ও চোখে পড়েনি।

কলিমুদ্দির গাড়ি কি সেখান থেকে আসবে? তা ছাড়া আসবেই বা কোথা থেকে? আর সে সব গাঁ থেকে এসে নির্ঘাত গোরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছু তো হতে পারে না।

সেই গোরুর গাড়ির সওয়ারি হলেই চন্দ্রবিন্দুর শখ মিটবে? বিশ্বাস হোক না হোক, সে গাড়ির আশাতেই বসে থাকতে হবে।

তবে গোরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছু যখন হতে পারে না, তখন রাস্তায় গিয়ে না দাঁড়ালেও বোধহয় চলবে।

চারিদিকে শীতের কুয়াশা নেমে যেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তেমনই সব একেবারে নিস্তব্ধ। কলিমুদ্দির গোরুর গাড়ি তো আর লাট-বেলাটের ল্যাণ্ডোবগি নয়। চাকার ক্যাঁচক্যাঁচানিতে এসে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই জানান দেবে নিশ্চয়।

এই কথা ভেবে চাদরটার মাথা পর্যন্ত আরও ভাল করে মুড়ি দিতে-না-দিতেই — হঠাৎ ও কী!

হ্যাঁ, গাড়িরই শব্দ। কিন্তু ক্যাঁচক্যাঁচানি তো নয়, এ যে স্পষ্ট ঘোড়ার খুরের নালের খট্-খটা-খট্!

কলিমুদ্দি ঘোড়ার গাড়িই চালিয়ে আসছে তা হলে! কোথা থেকে কেমন করে তা সম্ভব, সে সব ভাববার তখন আর সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে চাদর সামলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঠিক! বাজারঘাটের দিক থেকেই শব্দটা আসছে। জোড়া ঘোড়ার পায়ের খট্-খটা-খটের সঙ্গে পুরনো নড়বড়ে গাড়ির ঝরঝরে আওয়াজ। গাড়ির তলায় ঝোলান মিটমিটে আলোটাকেও দুলে দুলে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

হাতটা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু গাড়িটা যেন নিজে থেকেই থামল।

বেশ কাছে এসে দাঁড়ালেও অন্ধকার কুয়াশায় গাড়িটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার গায়েই যেন একটা ঝাপসা কালো ছোপ পড়েছে মনে হচ্ছে।

গাড়িটা ঝাপসা হলেও কানে আওয়াজ এবার যেটা এল সেটা একেবারে স্পষ্ট।

'কেরায়া যাবেন, কর্তা?'

'কেরায়া?' প্রথমটায় একটু চমকে উঠলেও বেশ ব্যস্ত হয়েই তারপর জানালাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেরায়া যাব। তুমি, মানে তোমার নাম কি কলিমুদ্দি?'

'হ্যাঁ, কর্তাবাবু। তা আপনি যাবেন কোথা?'

তাই তো? কোথায় যাব এখন বলি? গাড়ির ওপরে গাড়োয়ানের আসনে কলিমুদ্দিকে একটু ভাল করে লক্ষ করবার চেষ্টা করে আমতা আমতা করে বললাম, 'আমি যাব মানে, আমার একটু ওই কী বলে—'

'বুঝেছি কর্তা।' কলিমুদ্দি আমায় ফ্যাসাদ থেকে বাঁচালে। 'জায়গার নামটা মনে

pathagar.net

করতে পারছেন না। ও রকম ভুল সকলেরই হামেশা হয়। তা, আপনার কোনও ভাবনা নেই। আপনি গাড়িতে চড়ে বসুন। ঠিক জায়গায় আপনাকে পৌঁছে দেব।'

হ্যাঁ, এই চন্দ্রবিন্দুর দেশের মতো কথা বটে!

'কিছু না জেনে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে তুমি?' অবাক যেমন তেমনই খুশিও হয়ে বললাম, 'তা তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?'

'আজ্ঞে কর্তা, আমি তো সামনে বাগেই যাই।'

জবাব দেবার ধরনে আমার প্রশ্নটা কলিমুদ্দির খুব পছন্দ হয়নি মনে হল। তাড়তাড়ি তাই সামলে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। সামনে পেছনে যে বাগেই যাও, আমায় পৌঁছে দিলেই হল। তোমায় ভাড়া কত দেব এখন বলো।'

'সে আপনার যেমন খুশি দেবেন।' একটু অধৈর্যই যেন ফুটে উঠল কলিমুদ্দির গলায়। 'এখন গাড়িতে ওঠেন তো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ উঠছি।' গাড়ির পা-দানে একটা পা তুলেই বললাম, 'কিন্তু ভাড়াটা আগে ঠিক করে নেওয়াই ভাল কলিমুদ্দি। তা হলে পরে আর গোলমাল হয় না। তুমি কত চাও তাই বলো।'

'কত চাই বলব!' কলিমুদ্দির মুখখানা তো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গলায় যেন একটু হাসির আভাস পেলাম, 'পয়সা-কড়ি কিছুতেই তো আমার কাজ নেই কর্তা। আপনি বরং যা আপনার দরকার নেই তাই আমায় দেবেন বকশিশ বলে।'

'যা আমার দরকার নেই তাই দেব! এ তো বড় মজার কথা। কী আমার সঙ্গে এমন আছে যাতে আমার দরকার নেই?'

ফাঁপরে পড়ে দু-চার লহমা বুঝি চুপ করে ছিলাম। আমার ফাঁপরে পড়া বুঝে কলিমুদ্দি নিজে থেকেই মুশকিলটা আসান করে দিলে। বললে, 'আপনার গায়ের ওই মলিদাটা দেবেন কর্তা, তা হলেই হবে।'

মলিদাটা দেব? বলে কী কলিমুদ্দি! এই শীতে মলিদাটাই আমার অদরকারি জিনিস হল নাকি!

কিন্তু এমনিতেই সময় অনেক গেছে। মলিদা নিয়ে কিছু বলতে গেলে আরও দেরি হয়ে যায়।

কিছু না বলে গাড়ির ভেতর তাই চড়ে বসলাম। বসবার সঙ্গে সঙ্গে কলিমুদ্দির ছিপটির আওয়াজও পেলাম গাড়ির ওপর থেকে। সেইসঙ্গে জোড়া ঘোড়ার নাল বাঁধা আট পায়ের খট্-খটা-খট্ও।

বাইরেটার চেহারা যেমন হোক, কলিমুদ্দির গাড়ির ভেতরটার কিন্তু খুঁত ধরবার কিছু নেই। বসবার গতি বেশ পুরু আর নরম। গাড়ির গায়েও চারিদিকে কাঁধ পর্যন্ত গদি আঁটা। তাতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নেওয়াও যায় একটু।

গাড়ির দোলানিতে তেমনই একটু তন্দ্রার ভাব এলেও কিছুতেই ঘুমোব না বলে তখন ঠিক করেছি। সারাক্ষণ জেগে সব কিছু আমার খেয়াল করা চাই।

pathagar.net

চোখে দেখবার অবশ্য কিছু নেই। গাড়ির দু দিকের দরজার ওপরকার খড়খড়ি দুটোই শুধু খোলা। তা দিয়ে গাড়ির চাকার আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এলেও চোখে কিছুই দেখবার নেই।

শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, যেন অন্ধকারেরই স্রোত দু দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, তার আর কোনও অদল-বদল নেই— কিন্তু এ কী!

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে পেলাম, গাড়ির চাকার শব্দ কই? কই জোড়া ঘোড়ার আট পায়ের খট্-খটা-খট্ আর মাঝে মাঝে কলিমুদ্দির ছিপটির আওয়াজ?

তার বদলে ঝম-ঝমা-ঝম এ কী মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ! সেই শব্দই কি আর সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে?

কিন্তু বৃষ্টি আরম্ভ হল কখন? পৌষ মাসের গোড়ায় এমন আকাশ-ফুটো-করা বৃষ্টি আবার হয় নাকি!

মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরের অন্ধকার বেশ একটু ফিকে হয়ে আসছে বুঝতে পারছি। রাত কেটে তা হলে ভোর হয়ে আসছে। মাঝখানে সারারাত আমি তো তা হলে অঘোরে ঘুমিয়েছি দেখছি। কখন বৃষ্টি এসেছে, কখন থেমেছে, কিছুই টের পাইনি। কতক্ষণ গাড়িটা থেমে আছে? গাড়ি থামিয়ে কলিমুদ্দি করছেই বা কী?

'কলিমুদ্দি! কলিমুদ্দি!'

ভেতরের ডাক কলিমুদ্দির কানে পৌঁছচ্ছে না বোধ হয়। বৃষ্টিটা ধরে গিয়ে দিনের আলো বেশ ভাল করেই ফুটছে এখন। কলিমুদ্দিকে ভাল করে ডাকবার জন্যে জানলা থেকে মুখ বাড়ালাম।

মুখ বাড়িয়ে একেবারে তাজ্জব। কোথায় কলিমুদ্দি! শুধু কলিমুদ্দিই নয়, গাড়িতে ঘোড়াগুলোও তো জোতা নেই! আমার ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির জন্যেই সেগুলো খুলে নিয়ে কলিমুদ্দি কোথাও অপেক্ষা করছে নাকি?

না, এখন একবার গাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু গাড়ির এধার ওধার দু দিকের দরজা এমন আঁট হয়ে গেল কী করে? মরচে ধরে গেছে যেন হাতলের কব্জায়। রাত্রের অন্ধকারে যেগুলো অত ভাল মনে হয়েছিল. সে গদিগুলোও তো দেখছি ছেঁড়াখোঁড়া ভেতরের ছোবড়া বার করা।

কোন রকমে লাথি মেরে পায়ের জোরে দরজা খুলে বেরিয়েও পড়লাম। বেরিয়েও অবাক। গাড়িটা এ কোথায় পড়ে আছে! রাস্তায় পড়ে আছে! রাস্তায় নয়, রাস্তার ধারের একটা আগাছার জঙ্গলের মধ্যে। গাড়ির যেমন চেহারা তার হালও তাই। দু-দুটো চাকাই দেখছি খোলা।

সব কি ওই আমার ঘুমিয়ে-পড়া রাতটুকুর মধ্যে হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছি না জায়গাটাও। মনে হচ্ছে কোনও ছোটোখাট মফস্‌সলি শহরের বাইরের দিকে এসেছি। কিন্তু কোথায় কোন শহর? তা ছাড়া রাস্তায় এত জল কাদা কেন? বৃষ্টি এখনকার মতো থামলেও আকাশের আর পথঘাটের চেহারা দেখে মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে, বৃষ্টি আগেও বেশ ক-দিন হয়েছে আর এখনও যথেষ্ট হবে। পৌষ মাসের গোড়ায় এমন নাগাড়ে বৃষ্টি হয় নাকি! তা ছাড়া বেনাপোলের হাটতলা থেকে রাতটুকুর মধ্যে কতটাই বা এসেছি? সেখানে একেবারে খটখটে শুকনো, আর ক ঘণ্টার পথ এসেই এমন ঘোর বর্ষা! শীতের বর্ষার ঠাণ্ডা তো নেই-ই, রীতিমতো গরমই তো হচ্ছে।

গরম লাগাটা টের পেতেই গায়ের মলিদার কথাটা খেয়াল হল। গাড়ির দরজা খুলে নামবার সময় সেটা গায়ে দিয়ে নামিনি। গাড়ির ভেতরেই পড়ে আছে তা হলে।

তাড়াতাড়ি তাই দেখতে গেলাম। মলিদা সেখানে নেই।

না, এবার আর অস্থির না হয়ে মনে মনে একটু হাসলাম শুধু। কলিমুদ্দি তার বকশিশ তা হলে ঠিকই নিয়ে গেছে। আমার দরকার যা নেই তেমন জিনিসই নিয়েছে। কিন্তু ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে কি?

যেদিক থেকে এসেছি, এতক্ষণ বাদে সেই বেনাপোলের দিক থেকেই একটা গোরুর গাড়িকে আসতে দেখে সেটা থামালাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথা থেকে আসছ বাছা?'

'আজ্ঞে উই উধারের গাঁ বেনাপোল থেকে।' গাড়োয়ান একটু অবাক হয়েই জবাব দিলে।

'ওদিক পানে বৃষ্টি-টিষ্টি পেলে?'

'আজ্ঞে বলেন কী কর্তা, বর্ষাকালে বৃষ্টি পাব না!' লোকটা আমায় একটু পাগল বলেই ঠাউরে গোরুর ল্যাজ মলে তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেল।

প্রশ্নটা অনেক ভেবেচিন্তেই কিন্তু করেছিলাম। উত্তর পেয়েই যা বোঝবার বুঝে নিয়েছি।

বটকেষ্ট তা হলে ভুল খবর আনেনি। সত্যিই মাথার ওপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া মুল্লুকই এটা বটে। কলিমুদ্দি তাই এক রাতের সওয়ারি করে আমায় শীত থেকে একেবারে বর্ষায় এনে দিয়ে গেছে।

শহরের দিক থেকে একজন কে আসছে।

কোথায় নিয়ে এসেছে তা কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করব না। আবার খুলনোর বদলে মালদো জেলার কোনও শহরের পাছে নাম করে বসে, এই আমার ভয়।

শীত থেকে বর্ষায় এসে পৌঁছনটাই আগে সামলে নিই।"

pathagar.net

ভূত যদি ভুলো হয়

"মোমবাতির আলোর শিষটা আস্তে আস্তে একবার বাঁ দিকে আর একবার ডান দিকে হেলল।

আলোর শিখাটাই যেন পলতে। কেউ অদৃশ্য হাতে সেটা ধীরে এদিকে ওদিকে বাঁকিয়ে নোয়াচ্ছে।

ঘরটায় এদিকে ওদিকে চাইলাম। না, কোনও দিক থেকে কোনও হাওয়া আসছে না। আসবার উপায় নেই। হাওয়া আসবার মতো একটি যে ছোটো জানলা আছে সেটিও ভাল করে বন্ধ করে দিয়েছি বাইরের কনকনে শীতের রাতের ঝড়বৃষ্টির দাপট এড়াতে।

তবু এমন আজগুবি ধরনের আলোর শিষটা এদিকে ওদিকে হেলছে যে কেন তা বুঝতে আমার দেরি হয়নি।

কলমটা খাতা থেকে তুলে তাই বেশ কড়া গলাতেই ধমক দিলাম, 'আবার, আবার বিরক্ত করতে এসেছেন?' "

*　　*　　*

না, ওপরের কথাগুলো আমার নয়। আমি ও সব কিছু কোথাও লিখতে যাইনি।

যাঁরা বোঝবার তাঁরা ঠিকই বুঝেছেন যে কোটেশনের মধ্যে দেওয়া কথাগুলো সব মেজকর্তার সেই ছেঁড়াখোঁড়া খেরো খাতা থেকে তোলা, কলকাতা শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাস-এ, পুরনো ধাপার মাঠ ছাড়িয়ে দমদমে যাওয়ার পথে একটা খালি বেঞ্চের ওপর লাল শালুতে বাঁধা বেওয়ারিশ একটা পুঁটলির মধ্যে যেটা পেয়ে দাবিদার তখনকার মতো কেউ না থাকায়, ছেঁড়াখোঁড়া খাতাটা ঘাঁটাঘাঁটি করে মালিকের হদিস কিছু পেলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব এই কড়ারে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম।

ঘাঁটাঘাঁটি করে মেজকর্তা বলে একটা নাম ছাড়া আর কিছু নাম ঠিকানার হদিস তাতে পাইনি বলেই খাতাটা এখনও আমার কাছেই আছে এ কথাও অনেকে বোধহয় জানেন।

pathagar.net

মেজকর্তা দালাল লাগিয়ে ভূতুড়ে কাণ্ডের কোথাও খবর থাকলে তার খোঁজ করতেন। শুধু খোঁজই নয়, শিকারিরা যেমন সব রকম তোড়জোড় করে বাঘ ভল্লুক শিকার করতে যায়, তিনিও তেমনই যেতেন ভূতের সন্ধানে।

মেজকর্তার ভূতশিকারের বৃত্তান্ত তাঁর খেরো খাতা থেকে কয়েকটা এ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পেরেছি। তিনি সত্যি কি মিথ্যে বানিয়ে এ সব লিখেছেন তা জানি না, তবে বর্ণনাগুলি যে অদ্ভুত আর মামুলি ভুতুড়ে কাহিনির সঙ্গে তার যে কোনও মিল নেই এটুকু সবাইকেই স্বীকার বোধ হয় করতে হবে।

যে বিবরণ তুলে দিয়ে এ লেখাটা আরম্ভ করেছি মেজকর্তা সেটা যেখানে বসে লিখেছেন সে আস্তানাটা তাঁকে বেশ কষ্ট করেই আবিষ্কার করতে হয়েছে।

খবরটা এনেছিল তাঁর এক দালালই। কিন্তু সে ঠিক মতো ঠিকানাটা তাঁকে দিতে পারেনি।

কোনও এক তীর্থস্থানের ভক্ত যাত্রীদের ভাড়া দেওয়ার জন্যে নদীর ধারের ক-টা বাড়ি।

বর্ণনা পড়ে নদীটা গঙ্গা আর তীর্থস্থানটা নবদ্বীপধাম বলেই মনে হয়। তবে কালটা তো বর্তমান নয়। কতকাল আগের তাও ঠিক করে বোঝাই শক্ত। নবদ্বীপের বদলে অন্য কোনও জায়গাও হতে পারে। বিশেষ করে জায়গাটার ও বাড়িগুলোর ছন্নছাড়া অবস্থার কথা জেনে সে রকম একটু সন্দেহও হয় না এমন নয়। মেজকর্তা তাঁর নিজের সম্বন্ধে যেমন জায়গাটার নাম-ধামও তেমনই স্পষ্ট করে কোথাও একটু দেননি। দেবার দরকারই বোধ করেননি মনে হয়। কারণ তাঁর যা নিয়ে কারবার সেই ভূতশিকারের ব্যাপারে এ সব নাম-ধাম এক দিক দিয়ে অবান্তরই বটে।

নাম-টাম কিছু না জানালেও জায়গাটার বর্ণনা তিনি বেশ ভাল করেই দিয়েছেন। যা দিয়েছেন তা পড়লেই কেমন একটা অস্বস্তির সঙ্গে গা-টা একটু ছমছম করে সত্যিই।

নদীর ধারের বাড়িগুলো খুব যে ভাঙাচোরা পোড়ো গোছের তা নয়, কিন্তু দেখলেই সেখানে মানুষজন কেউ থাকে বলে মনে হয় না।

কেমন যেন ভুলে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া জায়গা, মানুষের স্মৃতি থেকে যা প্রায় মুছে যেতে বসেছে।

বাড়িগুলোর ওই ভাবটা নদীর দিকের ঘাটগুলোর জন্যেই আরও বেশি ফুটে উঠেছে, মনে হয়। বাড়িগুলো ভাঙাচোরা তেমন না হলেও ঘাটগুলোর অবস্থা একেবারে শোচনীয়। কোন মান্ধাতার আমলে তৈরি হবার পর থেকে সেগুলোতে কারও মেরামতের হাত পড়েনি বলে সাবেকি ঘাটের ইট-পাথর নদীর পাড়ের কাদার মধ্যে ডুবে গিয়ে কোথাও কোথাও ঘাটের চিহ্নই গেছে লোপ পেয়ে।

নেহাত তীর্থস্থানের নামটা একেবারে মুছে যায়নি বলে ওই সব ঘাট ভেঙে দু-চারজন তীর্থযাত্রী পাণ্ডাদের সঙ্গে এখনও নদীতে স্নান করতে আসে। স্নান সেরে

pathagar.net

ফিরে যাবার সময়ই নদীর দিক থেকে দেখলে বাড়িগুলো সমেত সমস্ত জায়গাটাকে জানা-শোনা সব ভূগোল থেকে হারিয়ে যাওয়া কিছু বলে মনে হয়।

বাড়িগুলো কিন্তু সব শূন্যপুরী নয়। সে রকম যাত্রী পেলে পাণ্ডারা এইসব বাড়িতেই দু-এক দিনের জন্যে তাদের তোলে।

এই যাত্রীবাড়িরই একটিতে মেজকর্তা যা খুঁজছেন তা পাবেন বলে তাঁর দালাল আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কোন বাড়িটি আসল তা চেনবার কোনও উপায় বলে দিতে পারেনি। তা যেমন পারেনি নিজের বকশিশটাও সে তেমনই মুলতুবি রেখেছে মেজকর্তার সে বাড়ি সত্যি সত্যি খুঁজে পাওয়া অপেক্ষায়।

জোগাড়যন্তর করে তীর্থযাত্রী সেজে আসবার পর আসল বাড়িটা পাওয়া খুব সোজাই মনে হয়েছে মেজকর্তার। গোড়াতেই নিজে থেকে ভূতুড়ে কাঠির খোঁজ চাইলে পাণ্ডারা মুখে কুলুপ এঁটে তাঁকে পাত্তাই দিতে চাইবে না বুঝে যে-পাণ্ডার হাতে নেহাত বরাত জোরে তিনি প্রথম পড়েছেন তার কাছে ক-রাত কাটাবার একটা যাত্রীবাড়ি ছাড়া আর কিছুর কথা তিনি তখন বলেননি।

তাঁর নিজের আর কিছু বলার দরকারই হয়নি তারপর। বাড়ি একটা পাওয়ার পর আপনা থেকে যা সব হিতৈষী তাঁর জুটেছে তারাই তাঁর সমস্যা মিটিয়ে দেবে বলে মনে হয়েছে তাঁর।

দুখিনী সে তীর্থধামে তাঁর মতো শাঁসাল মক্কেলের দেখা পাওয়াই যায় না বোধ হয়। তাঁকে হাত করবার জন্যে বেশ একটু রেষারেষি চলেছে তাই। তবে সামনাসামনি নয়, একটু আড়ালে আবডালে একলা পাওয়া সুবিধে নিয়ে।

যার হাতে তিনি পড়েছেন সে কী একটা কাজে একটু সরে যেতেই তার সঙ্গী আর-এক পাণ্ডা এনে জানিয়েছে সোজাসুজি, 'উঠলেন, উঠলেন, শেষ কালে এই কুঠিতেই উঠলেন!'

'কেন, এ কুঠির হয়েছে কী?' মেজকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে এবার, আর জবাব যা পেয়েছেন তাতে ভেতরের খুশিটা চেপে রাখাই শক্ত হয়েছে তাঁর পক্ষে।

নতুন পাণ্ডা আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় না রেখে স্পষ্টই জানিয়েছে, 'আজ্ঞে, এখানে ওনারাই আসা যাওয়া করেন কি না।'

'ওনারা মানে?' খুশি আর চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছেন মেজকর্তা, 'এটা ভূতুড়ে বাড়ি বলছেন? বেশ বেশ!'

এ পাণ্ডা-ঠাকুরকে বেশ কিছু বকশিশ দিয়ে রীতিমতো হতভম্ব অবস্থায় বিদেয় করে মেজকর্তা বরাত জোরে আসল বাড়িটাই পেয়ে গেছেন মনে করে বেশিক্ষণ খুশি থাকতে কিন্তু পারেননি।

খুশি মনেই তাঁর নিজের পাণ্ডাকে একটু চমকে দেবার জন্যে বাড়িটার ভূতুড়ে বদনামের কথা বলায় সে একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠে আসামিকে ঠিক মতো শনাক্ত করেই বলেছে, 'ভূতুড়ে বাড়ি! কে বলেছে—ভূতুড়ে বাড়ি? ওই সুঁটকো ছুঁচোটা বলেছে তো! ভূতুড়ে ওর জিম্মায় ওই যাত্রীবাড়ি। এক রাত্তির কেউ তাই ওখানে বাস করে না!'

pathagar.net

pathagar.net

আর বাক্যব্যয় না করে আগের পাণ্ডাকে আশাতীত প্রণামিতে যেমন অবাক তেমনই খুশি করে মেজকর্তা সেই সুঁটকো ছুঁচোটার যাত্রীকুঠিতেই গিয়ে উঠেছেন তারপর, আর তাতে ভুল যে করেননি তার প্রথম প্রমাণ পেয়েছেন একটু বাদেই।

সুঁটকো ছুঁচো পাণ্ডাই তাঁর মালপত্র সমেত তাকে তাঁর যাত্রীবাড়ির ওপরের কুঠুরিতে তুলে দিয়ে গেছল। যাবার আগে নিজের নফরকে দিয়ে মেজকর্তার বিছানাটাও পাতিয়ে দিয়ে যেতে ভোলেনি।

পাণ্ডা বিদায় নেবার পর মেজকর্তা একটু ভাল করে তাঁর কুঠুরিটা দেখে শুনে নিয়েছেন। এমনিতে ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই বটে। তবে লম্বায় চওড়ায় মাপটা একটু চলনসই হলেও সমস্ত ঘরে একটি ছাড়া আর জানলা নেই। সে জানলাটিকেও ঘুলঘুলি বললেই যেন মানায়।

সে জানলা দিয়ে নদীর দিকটা যেটুকু দেখা যায় তা দেখে বিছানার দিকে আসতে গিয়েই মেজকর্তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

তাঁর বিছানাটা কেমন করে যেন গুটিয়ে যাচ্ছে।

বিছানা অবশ্য তাঁর নিতান্ত সাদাসিধে। সতরঞ্চির ওপর একটা চাদর একটা কম্বল আর বালিশের বেশি কিছু নয়। সেই বিছানাটাই একদিক থেকে গুটিয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের ওপরে।

না হাওয়ায় উড়ে, উল্টে আসাটাসা নয়, বেশ পাট করে গুছিয়ে গুটিয়ে রাখা।

মেজকর্তা খুশি হয়ে মাথা নেড়েছেন। হ্যাঁ, আরম্ভটা ভালই হচ্ছে। আশা হচ্ছে পরে আরও জমবে।

মেজকর্তা গুটনো বিছানাটা আবার পেতে তার ওপর বসে তাঁর খেরো খাতাটা খোলবার পর আরও খুশি হওয়ার মতো কিছু পেয়েছেন।

নীচে থেকে ওপরে আসবার সিঁড়িতে কে এক বুড়ো যেন দমফাটা হাঁফানি কাশি কাশতে কাশতে ঠুক ঠুক করে ওপরে উঠে আসছে।

মেজকর্তা ফিরেও তাকাননি সিঁড়ির দিকে। খেরো খাতার পাতায় এই নতুন বৃত্তান্তের গোড়াপত্তনটুকু করতে করতে মাথা নিচু রেখেই বলেছেন, 'কে আপনি? এই কুঠির জিম্মাদারি নিয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু যে-ই হোন ওসব বস্তাপচা মামুলি প্যাঁচ ছেড়ে ঝেড়ে কাশবেন আসুন।'

সিঁড়িতে হাঁফানির কাশি থেমেছে, কিন্তু সামনে ঝেড়ে কাশতে কেউ আসেনি। তার বদলে কুঠুরিটার এক দেয়াল থেকে আর-এক দেয়াল পর্যন্ত কিচ্ কিচ্ করতে করতে ক-টা ছুঁচো যেন ছোটাছুটি করেছে ক-বার। ছুটতে গিয়ে তারা যেন মেজকর্তার গায়ের ওপরই এসে পড়বে মনে হয়েছে।

খেরো খাতাটা মুড়ে রেখে মেজকর্তা এবার খুক খুক করে হেসে বলেছেন, 'কে আপনি জানি না, কিন্তু কী আপনি চান বলুন তো? আমায় ভয় দেখাতে! ওই সব বাচ্চা কাঁদান চালাকিতে ভয় পেয়ে আমি এ কুঠরি ছেড়ে পালাব ভাবছেন?'

pathagar.net

এ কথার জবাবে ঠিক পেছনেই যেন গলা-টিপে-মারা কারও গোঙানি শোনা গেছে।

মেজকর্তা মুখই ফেরাননি। কুঠুরিতে রেখে যাওয়া রেড়ির তেলের প্রদীপটার সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে চকমকি ঠুকে সেটা ধরাবার চেষ্টা করতে করতে বলেছেন, 'হয়েছে! হয়েছে! খুব বাহাদুরি দেখিয়েছেন! এবার কী করবেন তাও আগে থাকতে বলে দিচ্ছি। প্রথমে হুড়মুড় করে সিঁড়িটাই যেন ভেঙে পড়ার শব্দ শোনাবেন, তারপর আমার ঘাড়ে আর কানের পেছনে যেন কার ঠাণ্ডা নিশ্বাস লাগাবেন, তারপর আরও ওইরকম কিছু ছেলেমানুষি কাণ্ডকারখানা করবেন। কিন্তু তাতে কিছু হবে না। আমি এখান থেকে নড়ছি না কিছুতেই।'

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। মেজকর্তা ততক্ষণে প্রদীপটা জ্বালিয়ে ফেলেছেন। তারপর বিছানায় গিয়ে খেরো খাতাটা খুলতে যাচ্ছেন এমন সময়ে স্পষ্ট মানুষের গলাই শোনা গেছে।

'কী চাও তুমি?'

গলাটা হালকা নয়, বেশ ভারী-ই! কিন্তু সেটা জবরদস্ত করবার চেষ্টায় একটু যেন কাঁপা মনে হল মেজকর্তার। কাঁপুনিটা হিসেবের মধ্যে ধরেই মেজকর্তা নিজের গলাটা কড়া করেছেন, 'কী চাই আমি? চাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে। চেহারাটা একবার বার করুন।'

'না।' ভূতুড়ে গলাটা যেন খেঁকিয়ে উঠেছে, 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! তুমি আমায় চেহারা দেখাতে বলো!'

'বেশ।' বলেছেন মেজকর্তা, 'আমার অনুরোধটা যদি আস্পর্ধা মনে হয় তা হলে দেখা দেবেন না! কিন্তু আমায় মিছিমিছি আর বিরক্ত করবেন না। আমার এখন রাত জেগে এই খাতায় কিছু লেখার আছে।'

'না, না!' ভূতুড়ে গলাটা এবার কড়ার চেয়ে যেন কাতরই বেশি মনে হয়েছে—'তোমায় যেতেই হবে এখান থেকে আর আজই, এক্ষুনি। না গেলে—'

'না গেলে কী করবেন আপনি?' মেজকর্তা একটু বিরক্ত হয়েই বলেছেন, 'ঘাড় মটকাবেন আমার? তাই চেষ্টা করে দেখুন। ভূতেরা এটা-সেটা একটু-আধটু নাড়াচাড়াই করতে পারে। তার বেশি যা শাসায় তা ওদের বারফট্টাই। এখন যান। এখনও সাধ থাকে তো আরও কিছু ফন্দি করুন ভয় পাওয়াবার।'

খানিকক্ষণ আবার সব চুপচাপ। কোনও ভূতুড়ে কাণ্ডও দেখা যায়নি তার মধ্যে।

তারপর সেই গলা আবার শোনা গেছে। এবার একটু করুণ। 'একটা কথা শুনবেন?'

'আবার এলেন জ্বালাতে!' মেজকর্তা একটু নরম গলাতেই বলেছেন, 'কিন্তু এখন আবার "শুনছেন" কেন? ওপারে যখন গেছেন তখন বয়সে তো বড় হবেনই। আমায় "তুমি"ই বলুন।'

'বলছিলাম কী?' ভুতুড়ে গলায় মিনতির সুরেই শোনা গেছে, 'তুমি তো এখানে নতুন। তোমার কাছে এ বাড়িও যা পাশের বাড়িও তাই। সেখানে একটা ঘর আছে এর চেয়েও অনেক ভাল। সেইটেতেই তুমি যাও।'

pathagar.net

'কেন?' মেজকর্তা গরম হয়েছেন এবার। 'সেখানে যেতে বলছেন কেন?'

'তা—তা—' ভূতুড়ে গলাটা দু বার আমতা আমতা করে তারপর কড়া হয়েছে। 'তা বলতে পারব না।'

'তা হলে আমিও এখান থেকে নড়ব না।' মেজকর্তা কড়া মেজাজে বলেছেন, 'যান। আর একটা কথাও আপনার শুনতে চাই না।'

ভূতুড়ে গলাটা ক্ষোভে অপমানেই নিশ্চয় চুপ হয়ে থেকেছে বহুক্ষণ। তারপর সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি।

প্রদীপের শিখাটা এধার ওধার একটু হেলিয়ে আবার একটু মনোযোগ টানবার চেষ্টা করতে মেজকর্তা ধমক দেবার পর যা হয়েছে তা মেজকর্তার খেরো খাতা থেকেই তুলে দিচ্ছি।

মেজকর্তা লিখেছেন,

"ধমকটা দেবার পর কিছুক্ষণ আবার সব নিঃঝুম। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে সেই ভূতুড়ে গলার মিনতি, 'দোহাই তোমার। এ কুঠুরিটা তুমি ছেড়ে দাও। আমার কথা রাখো।'

'কিন্তু কেন?' কড়া গলাতেই বললাম, 'কেন, এ কুঠুরি আমায় ছাড়তে বলছেন, তা আগে শুনতে চাই।'

'মানে— মানে,' বেশ তোতলা হয়ে গেল ভূতুড়ে গলাটা, 'তা বলতে আমার লজ্জা করে।'

'ও সব লজ্জাটজ্জা বুঝি না।' আবার ধমক দিলাম, 'কেন এ ঘর আমায় ছাড়তে বলছেন, তা বলতে হবে। ঘর আমি ছাড়ব কি না তা বিচার করব আপনার কথা শুনে।'

খানিক আবার চুপচাপ। তারপর প্রায় ফিসফিস করে শোনাল সেই ভূতুড়ে গলা, 'তোমায় এ ঘর এখন ছাড়াতে না পারলে আমার মাথা কাটা যাবে।'

'মাথা কাটা যাবে আপনার!' হাসব না রাগ করব বুঝতে না পেরে ধমকের সুরেই বললাম, 'আপনার আবার মাথা আছে না কি যে কাটা যাবে!'

'ওই মানে—' ভূতুড়ে গলা থতমত খেয়ে যেন ক বার ঢোক গিলে বললে, 'ওটা কথা বলার পুরনো অভ্যাসের দোষ। মাথা কাটা যাবে মানে আমার জাত যাবে। না, না থুড়ি— মানে—'

ভূতুড়ে গলা বেশ ফাঁপরে পড়ে আবার তোতলা হয়ে ওঠাতে নিজেই কথাটা জুগিয়ে দিলাম, 'আপনি বলতে চাইছেন আপনাদের ওপারের সমাজে আপনার মান থাকবে না, সবাই ছি ছি করবে?'

ভাষা-সংকট থেকে এমন করে উদ্ধার করায় ভূতুড়ে গলা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছ। আজ তোমাকে এ বাড়ি না ছাড়াতে পারলে আমার নামটাই কাটা যাবে ওদের খাতা থেকে। এমনিতেই আমার নামের পাশে ঢেরা পড়েছে অনেক—'

'কেন ঢেরা পড়েছে?' কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি ওপারের পক্ষে একেবারে অকর্মা, তাই তো? কারও পিলেটিলে চমকান গোছের কিছুই পারেন না!'

pathagar.net

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!—' করুণ হয়ে উঠল ভূতুড়ে কণ্ঠ, 'ভয়টয় কাউকে দেখাতে গেলে আমি কেমন বেসামাল হয়ে যাই, আমার কেমন সব চালের ভুল হয়ে যায়। যা বদনাম আমার হয়েছে তাতে আজ তোমায় এ ঘর না ছাড়াতে পারলে আমাকেই ওরা এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। কোথায় আবার এখন নতুন ডেরা খুঁজে পাব বল তো! দিনকাল যা হচ্ছে পোড়ো বাড়িটাড়ি কোথাও থাকছে কি আর। তোমরাই যেটুকু পারো মেরামত করে, ছাগল ঘোড়ার মতো গাদাগাদি করে ঢুকে পড়ছ!'

অনেক দুঃখে হাউ হাউ করে বলে ফেলা কথাগুলো শুনে মায়াই হল একটু।

বললাম, 'বেশ! আমি ছেড়েই যাচ্ছি এ কুঠুরি। কিন্তু তার আগে আপনার চেহারাটা দেখান।'

'চেহারা দেখাব!' ভূতুড়ে গলাটা রাগ দুঃখ মিলিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'খুব দয়া করলে আমায়! জানো, আমাদের চেহারা দেখান মানে কী? তোমাদের ওখানকার ভাষায় রক্ত জল হয়ে যাওয়া যাকে বলে। তাও খুশি মতো চেহারা ফোটান যায় কি? আমার মতো হেঁজি-পেঁজিদের বরাদ্দ বছরে মাত্র তিন বার। আমার তিন বারই খরচ করে ফেলেছি।'

শেষের কথাটা বলতে বলতে ভূতুড়ে গলাটা যেন দুঃখে হতাশায় ধরে এল।

মায়াটা আরও বেশিই হল এবার। নরম গলাতেই বললাম, 'আচ্ছা। দেখা দিয়ে আপনার কাজ নেই। শুধু এপারে ডিঙিয়ে আসবার আগের আপনার নাম-ধাম পরিচয়টা দিন।'

'নাম-ধাম পরিচয় জানতে চাইছ?' ভূতুড়ে গলাটার খুব উৎসাহ টের পাওয়া গেল না, 'আমার নাম হল রণছোড়লাল।

'বেশ অবাক হয়েই বলতে হল, 'কী নাম বললেন? রণছোড়লাল? ও আবার কী নাম?'

'ও হল রাজপুত নাম!' ভূতুড়ে গলাটা এবার জোরালই শোনাল।

'তা রণছোড়জি!' এবার না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না, 'নিজেদের রাজস্থান ছেড়ে এই বাংলা দেশে এসেছিলেন কেন? লোটা কম্বল নিয়ে লগ্নির কারবার করতে?'

'না, না!'—রণছোড়জি গরম হয়ে উঠলেন, 'আমরা রাজপুত ক্ষত্রী। লগ্নির ব্যবসা করব আমি! আমি মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলাম, তারপর এই পথে, প্রতাপাদিত্যকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়—'

'থামুন!' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললাম, 'সব ঝুট বলছেন। প্রতাপাদিত্যকে মানসিংহ ধরা তো পরের কথা, হারাতেই পারেনি। আর মানসিংহের দেশে ফেরার পথও এটা নয়।'

'তাই নাকি!' জাল রণছোড়জি একেবারে কেঁচো হয়ে বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে তা হলে। মানে—'

'আবার ধমক দিয়ে বললাম, 'ওসব মানে-টানে ছেড়ে ঠিক করে বলুন কী আপনার পরিচয় ছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', ভূতুড়ে গলা মিন মিন করে জানাল, 'আমার আর একটা পরিচয়ও ছিল।'

pathagar.net

'পরিচয়?' কড়া গলায় জানতে চাইলাম।

'আমি—মানে আমি ভবানী পাঠক ছিলাম।'

'কী ছিলেন?' হেসে উঠব, না ধমক দেব ঠিক করতে পারলাম না।

'ভবানী পাঠক।' ভূতুড়ে গলা আবার একবার সতেজে—'সেই বিখ্যাত ডাকাত ভবানী পাঠক এইখানে যে সাহেবদের সঙ্গে লড়ে মরেছিল।'

'আপনি ছিলেন ভবানী পাঠক!' এবার সত্যি জ্বলে উঠলাম, 'ভবানী পাঠকের ডাকাতির অঞ্চল এটা নয়। আর তিনি সাহেবদের সঙ্গে লড়াইয়েও মারা যাননি। তিনি দ্বীপান্তর খেটে ফিরে রীতিমতো বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছলেন।'

'তাই বুঝি!' জাল রণছোড়সিং আরও মেকি করুণ হতাশ সুরে বললেন, 'আমার কী যে হয়েছে! যা পড়েছি শুনেছি আর নিজে যা যা ছিলাম সব কেমন গুলিয়ে জট পাকিয়ে গেছে। কোনটা যে ঠিক নিজেই জানি না। এখন কী উপায় আমার হবে! তুমি আর কি আমায় বিশ্বাস করে এ কুঠুরি ছাড়বে? কী যে আবার ভাগ্যে তারপর আছে! ছন্নছাড়া হয়ে কোনও চুলোয় কি আর তারপর জায়গা পাব!'

নিজের নামটা সুদ্ধু সব গুলিয়ে ফেলা ভূতমশাইয়ের এই বুক-ফাটা হা-হুতাশের মধ্যেই নিজের বিছানাপত্র একটু গুছিয়ে নিয়েছিলাম। তাঁর আক্ষেপ শেষ হতেই দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'আপনার কোনও ভাবনা নেই। আমি এ ঘর ছেড়েই যাচ্ছি, আর এখনই। শুধু যাচ্ছি না, আপনার দর বাড়াবার জন্যে একেবারে আর্তনাদ করতে করতে পড়ি-কি-মরি করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাচ্ছি।'

যা বলেছিলাম তাই করেছি। অভিনয়টা ভালই হয়েছিল নিশ্চয়। কারণ আমার চিৎকারে আমার চেনা দুই পাণ্ডা তো বটেই, পাণ্ডা-পাড়ার প্রায় সবাই ছুটে এসে মাথায় জলটল দিয়ে হাওয়া করে আমায় সুস্থ করেছে।

আশা করি ভুলো-মন ভূতমশাই নিজের জ্ঞাতিগুষ্ঠির কাছে ভালরকমই কলকে পেয়েছেন এখন।"

* * *

মেজকর্তার খেরো খাতার লেখা ওখানেই শেষ।

কোনও ধূর্ত-রসিক ভূত তাঁকেই বোকা বানিয়ে নাচিয়েছে, না তিনি নিজেই আমাদের মতো ভাবী পাঠকদের নিয়ে একটু মজা করবার প্যাঁচ করে গেছেন এ গল্পে তা ঠিক করে বলার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই।

pathagar.net

"ভূতেরা বড় মিথ্যুক"

"ভূতেরা বড় মিথ্যুক।"

না, কথাটা আমার নয়। এ শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাস-এ দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাবার মুখে বেশ খালি হয়ে আসা বাস-এর একটি বেঞ্চিতে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ একটি পুঁটলিতে ছেঁড়াখোঁড়া একটা খেরো খাতা পেয়ে মালিকের নাম-ঠিকানা তাতে খুঁজে পেলে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে সেটা নিয়ে এসেছিলাম, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম ভূত-শিকারি দুর্জ্ঞেয় পরিচয় সেই মেজকর্তাও একথা বলেননি। এ মন্তব্যটি হল মুনশি মুলুকচাঁদের, মেজকর্তার খেরো খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে যাঁর খোঁজ পেয়েছি।

মুনশি মুলুকচাঁদ মেজকর্তাকে বেশ একটু টিটকিরি দিয়েই বলেছিলেন, 'যাদের পেছনে ছুটে ছুটে মাথার অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এতদিনেও তাদের একটু চিনলেন না! বড়া আফশোশ কি বাত কর্তামশাই, আপনার জন্যে বড়া দুখ হয়, আপনি এখনও জানেন না যে, একদম ষোল আনা সাচ্চা আদমিরও ওপারে গেলে জবান ঝুটা হয়ে যায়। সব ভুল ভাল যা মন চায় কিসসা শুনিয়ে দেয় আপনাদের। আর দেবে নাই বা কেন? তাদের যে-রকম জ্বালাতন আপনারা করেন, তাতে আপনাদের নিয়ে একটু বেয়াড়া রসিকতা করে শোধ নিতে চাওয়া তাদের খুব অন্যায় কি?

'এই ধরুন, আপনাদের কী-এক নয়া যন্তর এসেছ, কী ওই পেলেনচিট না প্যালান্‌চি কী যেন নাম! কাঠের একটা পানপাতার তলায় তিনটে চাকা বসানো। যেখানে-সেখানে যখন-তখন একটু সুবিধে আর সময় পেলেই কজনে মিলে টেবিলের ওপর ওই প্যালান্‌চি নিয়ে আপনারা বসে যান। আপনারা কজনে ওই কাঠের পানপাতার ওপর হাত রেখে চোখ বুজে বসে যারা ওপারে গিয়েছে তাদের কথা ভাবেন আর তাতেই মনে করেন ওপারের ওরা চুম্বকের টানে লোহার মতো ওই প্যালান্‌চিতে ভর করে তা যে চালায় তাও ঠিক। কিন্তু কেন আসে জানেন? আসে কখনও-কখনও আপনাদের বুদ্ধিশুদ্ধির দৌড় দেখে আপনাদের নিয়ে একটু মজা করতে। যেমন

pathagar.net

দু-চারটে অজানা খবর আপনাদের মনের লুকনো পাতা থেকেই পড়ে নিয়ে আচমকা জানিয়ে দিয়ে তাক লাগান। তাক লাগাবার পর ওই পানপাতা প্যালান্‌চি নাড়িয়ে যা লেখে তাতেই আপনাবা ভয় ভক্তি বিশ্বাসে গদগদ।

'সে যারা যা হয় হোক, আপনার মতো পাকা জহুরি কিনা ওদের কথা শুনে এমন ভুলটা করলেন?'

'যার তার তো নয়,' বলেছিলেন মেজকর্তা, 'কথা শুনেছি তো খোদ লালা রাজারামের!'

'লালা রাজারামের!' হেসেছিলেন মুনশি মুলুকচাঁদ।

হেসে তিনি কী বলেছিলেন, আর তার জবাবে কী বলেছিলেন মেজকর্তা, কথাটা উঠেছিল কী থেকে, আর কোথায় কেনই বা এমন সব কথা হয়েছিল তা স্বয়ং মেজকর্তার কাছ থেকে তাঁর নিজের জবানিতে শোনাই নিশ্চয় ভাল।

* * *

"আশা তো দূরের কথা," তাঁর খেরো খাতায় লিখেছেন মেজকর্তা, "যা ভাবতে পর্যন্ত পারিনি তাই এবার সত্যি ঘটেছে একেবারে অবাক করে দিয়ে।

কিন্তু অবাক-ই বা হই কেন? একটু ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারি, যা সোজা আর হিসেবমাফিক তার চেয়ে উল্টোটা দুনিয়ায় বড় কম ঘটে না।

এই যেমন মাছ ধরার বেলায় হামেশা দেখি। বেশ করে আগে থাকতে চার ফেলে নিখুঁত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একেবারে সেরা ছিপ-টিপ নিয়ে আর সবচেয়ে সরেস টোপ ফেলে যেখানে বসি, সেখানে এবেলা ওবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাতনার ধ্যানই কতবার না সার হয়। আর তাইতেই বদমেজাজ নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বেয়াড়া কোনও আঘাটায় নেহাত হেলায় ফেলায় টোপ-গাঁথা বঁড়শিটা একবার ছুঁড়ে দিয়েছি কী, চোখের পাতা না পড়তে পড়তে চোঁ-চোঁ কীসের টানে জলের তলায় ফাতনা উধাও হওয়ার সঙ্গে সুতো ছাড়ার বেগে হুইলের গোঙানি যেন আর থামতে চায় না।

ভাগ্য আর-একটু ভাল হলে সেই দফাতেই শেষ পর্যন্ত হয়তো আধমনি একটি মাছের রাজাকে কাটা কলাগাছের ভেলায় চড়ে জল থেকে শেষ পর্যন্ত তুলে আনতে হতে পারে।

এ যাত্রায় আমার যা হয়েছে তা ঠিক ওই। আমার সেই চিরকেলে নেশার তাগিদে নয়, স্রেফ একটু বিদেশ ঘোরাফেরা আর সেই সঙ্গে যেটুকু তীর্থধর্ম হয় তা সারবার জন্যে কিছু দিনের মতো বেরিয়ে পড়েছিলাম।

সময়টা মোটে ভাল নয় বলে অনেকে একটু বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো ডাঙার পথ মাড়াচ্ছি না বললেই হয়। আমাব নিজের ফরমাশ দিয়ে বানান বজরা, মাঝিমাল্লাও সব আমার পুরনো পাকা লোক। যেখানে যাবার, জলে-জলেই যাব তাদের

pathagar.net

নিয়ে। ছোটোখাটো তো নয়, প্রায় অকূল নদী। এপারে কিছু লোক দেখলে ওপারে গিয়ে ভিড়লেই হল। সুতরাং আমার ভাবনাটা কীসের?

তা সেরকম ভয়-ভাবনার কিছু হয়নি এ পর্যন্ত। হেসেখেলে ভেসে ভেসে অমন দু-দুটো মুল্লুক তো পার হয়ে এলাম, তার মধ্যে কখনও সখনও রাতবিরেতে গুড়ুম-গাড়ামের মতো যা আওয়াজ শুনেছি তা মেঘের ডাক যে নয়, তা কে বলতে পারে!

ওসব কিছুর বদলে যা হল তা এই—

কৃষ্ণপক্ষের নবমী-দশমী। রাত তখন প্রথম প্রহর পার হয়েছে। মেঘে ঢাকা আকাশ যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার নদীর জল। স্রোত আর হাওয়ার সুবিধে নিতে যে-পাড় ঘেঁষে বজরা যাচ্ছে, সেখানকার সব কিছুও যেন গাঢ় কালির পোঁচ লাগান।

এরই মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে বড় মাঝিকে ব্যস্ত হয়ে ডাকলাম, 'দেওলাল! দেওলাল! দেখতে পেয়েছ? শুনতে পাচ্ছ কিছু?'

দেওলাল তখন আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। একটু যেন দ্বিধা করে বললে, 'হাঁ, সরকার।'

'তা হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' একটু ধমকের সুরে বললাম, 'বজরা রোখো, লাগাও ওই ঘাটে।'

'কিন্তু সরকার', দেওয়াল আমার ধমক খেয়েও সামান্য একটু আপত্তি করে, 'দিনকাল বড় খারাপ! একেবারে অজানা ঘাটে এমন করে বজরা ভিড়ানো কি—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আবার ধমকে উঠলাম, 'দিন-কাল খারাপ তো কী? অজানা ঘাটে ওই একটা মানুষ আমাদের বজরা সমেত এতগুলো মানুষকে খেয়ে ফেলবে? মানুষটা আমার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেয়েছ?'

এমন অসম্ভব জায়গায় ওই নাম ধরে ডাকাটা যত তাজ্জবই করুক তা শোনার পর বজরা না থামিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যেখানে মানুষটাকে দেখেছি, বজরা এতক্ষণে স্রোতের টানে তা ছাড়িয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। সেখান থেকে বজরা ঘুরিয়ে যথাস্থানে লাগাবার হুকুম দিয়ে দেওলাল আমার কাছে ফিরে আসবার পর বললাম, 'যাও, আমার কামরা থেকে বন্দুকটা বরং নিয়ে এস।'

দেওলাল বন্দুক আনতে গেল না। আনলে বজরা ঘাটে লাগবার পর রীতিমতো লজ্জাতেই পড়তাম। কারণ এমন একটা অসম্ভব জায়গা থেকে এমন অবিশ্বাস্যভাবে যে আমায় ডেকেছে, সে আর কেউ নয়, লালা রাজারাম। তার সঙ্গে এই পথে দেখা হওয়ার ব্যবস্থা খত লিখে আগে থাকতেই আমাদের ঠিক হয়ে আছে।

তা থাকলেও লালা রাজারামের এমন জায়গায় এ সময়ে এসে দাঁড়িয়ে আমার বজরা থামাবার জন্যে ডাক দেওয়াটা অবশ্য একেবারে অদ্ভুত কল্পনাতীত ব্যাপার! সেটা কেমন করে সম্ভব হল?

pathagar.net

বজরা পাড়ে লাগবার পর তা থেকে বেশ কষ্ট করেই সেই আঘাটায় নেমে সেই কথাই রাজারামকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, 'এই এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কেন, লালাজি? তোমার তো আমার সঙ্গে কাল সকালে দিলদারনগর ছাড়িয়ে সেই জামানিয়ার ঘাটে দেখা করার কথা!'

'সেখানে কাল সকালে থাকতে পারব না বলেই তোমায় যাবার পথে ধরবার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' জানাল লালাজি।

তার এ জবাবে বিস্ময়টা বাড়ল বই কমল না। বেশ একটু হতভম্ব হয়েই তাই বললাম, 'কী বলছ, লালাজি? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কিন্তু জায়গাটা চৌসা বলেই মনে হচ্ছে। এখান থেকে নদী দিয়ে জামানিয়া যেতে পঞ্চাশ মাইলের কম নয়। এই এতখানি রাস্তার মধ্যে ঠিক কোথায় দাঁড়ালে আমার বজরা ডেকে থামাতে পারবে তা তুমি ঠিক করলে কী করে?'

'বুদ্ধু নয় বলেই ঠিক করতে পারলাম।' জবাব দিয়ে লালাজি বেশ সোজাভাবেই রহস্যটা পরিষ্কার করে দিল। লালাজি এই অঞ্চলের পয়লা নম্বর কারবারি। এখানকার নদীর হাড়হদ্দ তার জানা। তাই এ পথে পুব থেকে পশ্চিমে যেতে ছোটো বড় সব নৌকোকে স্রোতের প্যাঁচে এই জায়গাটিতে নদীর দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে যেতে হবে জেনেই লালাজি এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল আমার অপেক্ষায়।

লালাজির এই ব্যাখ্যার পরও একটা-দুটো প্রশ্ন মনে জেগেছিল। কিন্তু তা আর না তুলে বললাম, 'যাক, দেখা যখন হয়ে গেছে, তখন বজরায় ওঠো এসে। যেখানে যেতে চাও যেতে যেতে তোমার সব ব্যাপারটা শুনি।'

কিন্তু বজরায় উঠতে রাজি হল না লালাজি। বললে, 'না, আমি বজরায় উঠব না। তুমি বজরা এখানে মাঝিদের জিম্মায় বেঁধে রেখে আমার সঙ্গে এস।'

'তোমার সঙ্গে যাব!' এবার সত্যিই একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'এখানে এই আঘাটায় নেমে কোথায় যাব তোমার সঙ্গে? আর যাবই বা কেন?'

'যেতে যেতেই সব বলছি। এস।' বলে লালাজি অন্ধকারেই আঘাটায় পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

লালাজির আবদারটা অত্যন্ত বেয়াড়া হলেও অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। লালা রাজারাম এদিকের এই সমস্ত তল্লাটের মস্ত বড় নামি লোক। শুধু অগাধ ধনী শেঠই নয়, মস্ত বড় দাতা। সারা দেশময় সব বড় বড় শহর আর তীর্থস্থানে কত ধরমশালা যে সে বসিয়েছে তার ঠিক নেই। বাংলাদেশে ভাগীরথীর ধারের সব তীর্থস্থানে এমনই কিছু ধরমশালা বসাবার ব্যবস্থা করবার সময় তার সঙ্গে আমার আলাপটা দোস্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। এ রকম একটা সাচ্চা মানুষ আমি খুব কম দেখেছি বলে সাক্ষাৎ দেখাশোনা না হলেও চিঠিপত্রে সে দোস্তিটা আমি ফিকে হয়ে যেতে দিইনি। যত বেয়াড়া আজগুবি মনে হোক, এ-রাত্রে তার ফরমাশ শুনে তার সঙ্গে তাই না গিয়ে পারলাম না।

সঙ্গে যেতে যেতে তার কাছে যা শুনলাম তা খুব দুঃখের হলেও একেবারে অভাবিত কিছু নয়। এ অঞ্চলে এখন দারুণ গণ্ডগোল। কুনওয়ারা সিং আরার কাছে জগদীশপুরে কোম্পানির গোরা পল্টনের কাছে হেরে গেছে। তার সঙ্গে যোগ ছিল বলে কোম্পানির ফৌজ রাজারামের জামানিয়ার কুঠির ওপর চড়াও হয়ে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। সেখানে আর তার থাকবার উপায় নেই বলেই লালা রাজারাম আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিন্তু কী দরকার ছিল অত বড় বিপদের পর তোমার এত কষ্ট করে আমার জন্যে এখানে এসে দাঁড়াবার?' আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমার তো কোনও সত্যিকার দরকার নেই। এই পথে যাচ্ছিলাম বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

'বাঃ!' লালাজি আমার কথায় যেন দুঃখ পেয়ে বললে, 'আমি কথা দিয়েছিলাম না যে, তোমার সঙ্গে দেখা করব? আমার কথার কোনও দাম নেই?'

লালাজির নরম জায়গাটায় ঘা লাগাবার ভয়ে কথাটা ওইখানেই চাপা দিয়ে এতক্ষণের সত্যিকার যা নিয়ে উৎকণ্ঠা সেই প্রশ্নটাই করলাম। 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

শুধু আঘাটা দিয়ে উঠে নয়, অন্ধকারে আদাড়-পাদাড় বন-জঙ্গল আর ছড়ান ইট-পাথরের পোড়ো জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে যেভাবে এতক্ষণ এসেছি, তাতে এই প্রশ্নটাই আগে করার কথা। রাজারামের কথায় বাধা দিতে চাইনি বলেই এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

প্রশ্নটা শুনে লালাজি মনে হল যেন একটু ঠাট্টার সুরে আমার কথাটাই আবার আউড়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছি? এখুনি দেখতে পাবে।'

তা সত্যিই পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন সামনে একটা কালো পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে মনে হল।

পাহাড় নয়, বিরাট একটা সাবেকি মঞ্জিল। এখন অবশ্য প্রায় ধ্বংসস্তূপ হতে চলেছে।

তারই ভেতর এ-ঘর ও-ঘর, এ-গলি ও গলি দিয়ে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লালাজি।

লালাজি অবশ্য যেতে যেতেই সে কথা আমায় জানিয়েছে। কোম্পানির সে এখন বিষনজরে পড়েছে। কুনওয়ারা সিংয়ের হারের পর কোম্পানির ফৌজ আর চরেরা সিংজির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব যাদের ছিল, নির্মম হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। লালা রাজারাম তাদের কাছে পয়লা নম্বর দুশমন। লালাজিকে তাই এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কোম্পানির হাতে ধরা পড়লেও সোনাদানা হিরা-জহরৎ নিয়ে তার বিপুল সম্পত্তি যাতে তাদের হাতে না পড়ে তাই লালাজি অনেক খুঁজে খুঁজে এই পুরনো মঞ্জিলের ধ্বংসস্তূপটা বার করে তার একটা গোপন কামরায় সেগুলো লুকিয়ে রাখবার

ব্যবস্থা করেছে। নিজের ভাগ্যদোষে ধরা পড়লে বা মারা গেলেও এই বিপুল ঐশ্বর্য যাতে বেপাত্তা না হয়ে গিয়ে তার বিশ্বাসী ভাল একজনের কাজে লাগে তাই সে আমাকে সে গুপ্ত কামরাটা দেখিয়ে রাখবার জন্যে এনেছে।

তা এনেছে, ভালই করেছে। কিন্তু সে কামরা আমায় দেখাবে কখন? ঘরের পর ঘর, গলির পর গলি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, এই করতে করতে সব জায়গাটা আমার কাছে গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল মনে হচ্ছে যে! রাজারাম নিজে সে কামরা আবার চিনতে পারবে তো?

সে প্রশ্নের জবাব যা পেলাম তা কল্পনাতীত। একটা বেশ লম্বা আবছা অন্ধকার ঘুলঘুলি দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে যেতে লালাজি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কীরকম বিশ্রী অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, 'এইখানটায়! এইখানটায় আমি নিজেই তারপর হারিয়ে গেছি!'

এই কথা ক-টা উচ্চারণের পরই সামনে থেকে সে এক নিমেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'লালাজি! লালাজি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

তার জবাবে প্রথমে একটা বিকট হাসি সমস্ত বাড়িটার ভেতর দিয়ে যেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে গেল। তারপরই লালাজির বিদ্রূপে বাঁকা গলা, 'খোঁজো, খোঁজো বাবুজি। সোনা চাঁদি, হিরা-জহরতের বহুত লালচ তোমার দিলের মধ্যে, কেমন? খোঁজো, খোঁজো তা হলে জান দিয়ে। আর কিছু না পারো, সেই লুকনো কামরায় হিরা-জহরতের ওপর তোমার হাড্ডিগুলো হয়তো সাজান থাকতে পারবে।'

'লালাজি! লালাজি!' আমি প্রায় ককিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'এসব তুমি কী বলছ? তুমি এপারের বদলে ওপারেই যদি গিয়ে থাকো তা হলেও আমার সঙ্গে বেইমানি কি তোমার সাজে? তোমার লুকনো দৌলতখানা আমি দেখতে চাই না, তুমি শুধু আমায় এ গোলকধাঁধা থেকে বার হবার হদিস বাতলে দাও। বাতলে দাও লালাজি।'

উত্তরে আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

পাগলের মতো এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-গলি থেকে অন্য গলি তারপর ছুটে বেড়াতে লাগলাম। দেওয়ালে চৌকাঠে ঠোকা লেগে লেগে হাত-পা-মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তবু বার হবার রাস্তা পেলাম না।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত তা পাব না নাকি? এই অজানা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার কঙ্কাল চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে থাকবে নাকি?

অস্থির উৎকণ্ঠায় আর-একবার ছুটে বার হবার চেষ্টা করতেই আলোটা দেখতে পেলাম।

আলো! তার মানে তো নিশ্চয় মুক্তির উপায়!

সেই আলোর রেখার দিকে পড়ি-কী মরি করে ছুটলাম। আলো পাছে আলেয়া হয়ে যায়, এই ভয়।

তা হল না। একটা বাঁক ঘুরতেই আলোটা দেখতে পেলাম। বেশ লম্বা-চওড়া একটা ঘর। ঘরের মধ্যে এক কোণের দিকে দড়িতে বোনা দুটি ছোটো চৌকি। তার একটিতে

pathagar.net

বসে এক প্রৌঢ় সরু লম্বা একটা খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর দড়িতে বোনা চৌকির পাশেই বেশ উঁচু মাটির পিলসুজের ওপর একটা প্রায় গোলাকার প্রদীপের মোটা মোটা ক-টা সলতে রেড়ির তেলের জোরেই বোধহয় জ্বলছে।

ঘরটার ভেতর ঢুকে সেখানকার সরঞ্জাম আর অচেনা প্রৌঢ়টিকে দেখে একটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

প্রৌঢ় কিন্তু বিন্দুমাত্র না চমকে, চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামাবার সঙ্গে হাতের লম্বা খাতাটা মুড়ে আমাকেই রীতিমতো অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন, বাবুজি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আমার নাম হল মুনশি মুলুকচাঁদ।'

'আপনার নাম মুনশি মুলুমচাঁদ! আর আপনি এই গোলাকধাঁধা মঞ্জিলে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন!'

কথাগুলো আমার গলা দিয়ে বার হয়নি। আমার চোখমুখের চেহারাতেই প্রকাশ পেল।

মুনশি মুলুকচাঁদ তা ঠিকমতো বুঝে পাশের অন্য দড়ির চৌকিটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'বসুন বাবুজি, ঠাণ্ডা হয়ে বসুন। আজ আপনার বহুত পরেশানি হয়েছে ঝুটমুট।'

ঝুটমুট! এবার রাগের জ্বালায় আমার গলায় আবার কথা ফুটল, 'শুধু ঝুটমুট বললে কিছুই বলা হয় না, মুনশি মুলুকচাঁদজি। কাউকে নিয়ে এরকম বিশ্রী তামাশা শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়, আর সে শয়তানি যে করেছে তার ঠিকানা এখন এপারের, না ওপারের?'

আমার এই কথা শুনে মুনশিজি বলেছিলেন, 'যাদের পেছনে ছুটে ছুটে অর্ধেক চুল ঝরিয়ে ফেললেন, এতদিনেও তাদের চিনলেন না?' "

* * *

মুনশিজি আর মেজকর্তার মধ্যে তারপর যা কথা হয়েছিল, এই বিবরণের শুরুতেই তা কিছুদূর পর্যন্ত দেওয়া আছে। মেজকর্তার নিজের জবানি গোড়া থেকে ধরবার জন্যে যেখানে তা কাটা হয়েছিল, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত মেজকর্তার নিজের কথাতেই আবার বোনা যেতে পারে। মেজকর্তা কথায় কথায় লালা রাজারামের নামটা করায় 'লালা রাজারামে'র বলে হেসেছিলেন মুলুকচাঁদ।

মেজকর্তা তাঁর খেরো খাতায় তারপর লিখেছেন—

"মুনশিজির হাসির ধরনে একটু গরম হয়েই বললাম, 'হাসছেন কী? লালা রাজারাম কে তা আপনি জানেন?'

'তা একটু জানি বইকী!' একটু যেন চাপা বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন মুনশিজি।

তাতেই আরও জ্বলে উঠে বললাম, 'জানেন, লালা রাজারামের কথার কী দাম! লোকে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের চেয়ে তাঁর কথায় বেশি বিশ্বাস করে।'

pathagar.net

pathagar.net

'করে নয়, করত।' বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ একটু মুচকি হেসে, 'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি যে এপারের সঙ্গে ওপারের কোনও মিল নেই। এপারে যে ষোল আনা সাচ্চা, ওপারে হামেশা সে আঠারো আনা ঝুটা হয়ে যায় স্রেফ মজা করবার জন্যেও!'

'তা বলে লালা রাজারামও তাই হবে!' অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, 'এই দুদিন আগে দেশের জন্যে যিনি জান দিয়েছেন তাঁর এমন প্রবৃত্তি!'

'যদি বলি ওই জান দেওয়াটাও ঝুটা বাহাদুরি!' আগের মতোই মুখ টিপে হেসে বললেন মুনশি মুলুকচাঁদ। 'লালাজি কুনওয়ারা সিংকে ছেড়ে কোম্পানিরই শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর জান নিয়েছে কোম্পানির ফৌজ নয়, তাঁর আগের দলেরই লোক, বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।'

'কখ্খনো না। হতে পারে না!' আমি প্রায় মারমুখো হয়ে বললাম, 'কী জানেন আপনি লালা রাজারামের বিষয়ে? কে আপনি?'

'আমি লালা রাজারামেরই মুনশি। তাই সব জানি।' গম্ভীর হয়ে বললেন মুনশিজি।

মাথাটা প্রথমে গুলিয়ে গেলেও এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছি। তবু মুনশিজির মুখের দিকে না চেয়ে নীচের মেঝেতে প্রদীপের আলোর ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, 'আপনি লালা রাজারামের মুনশি ছিলেন, তাই সব জানেন, কেমন মুনশিজি? আপনি লালাজিকে নিজের দলের সঙ্গে বেইমানি করবার জন্যে তাদের হাতে মরতে দেখেছেন, তারপর ওপারে গেলে সাচ্চারাও সব ঝুটা হয়ে যায় জেনে এখানে আমার মতো নিরীহ মানুষ যাতে লালাজির হাতে বেশি নাকাল না হয় তাই দেখবার জন্যে এখানে পাহারাদার হয়ে বসে আছেন, এই তো আসল ব্যাপার! না মুনশিজি?'

মুনশিজি এবার খুশি হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বলে গেলাম, 'আপনাকে কিছু আর বলতে হবে না, মুনশিজি। আপনি যা করছেন তা অতি মহৎ কাজ। কিন্তু এপারের কারও পক্ষে ওপারের কারও ওপর পাহারাদারি করায় বেশ একটু ঝামেলা নেই কি?'

'তা আছে।' মুনশিজি স্বীকার না করে পারলেন না, 'তবে, মানে—'

মুনশিজিকে আবার থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তবে আপনার নিঃস্বার্থ গরজটা বড় বেশি। লালা রাজারামের লুকনো দৌলতখানা যাতে যার-তার হাতে না পড়ে, তার জন্যে সব কিছু সহ্য করতে আপনি প্রস্তুত।'

'ঠিক! ঠিক ধরেছেন!' উৎফুল্ল হয়ে বললেন মুনশিজি।

'কিন্তু তার সঙ্গে আরও যা-যা ধরেছি, সেটাও তা-হলে শুনুন।' এবারে সোজা মুনশিজির মুখের ওপর চোখ রেখে বললাম, 'আপনি নিজে আর এপারের কেউ নন। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, আপনি শুধু লালা রাজরামের মুনশি ছিলেন না। কোম্পানির চরও ছিলেন সেই সঙ্গে। আপনার কাছে গোপন খবর পেয়ে কোম্পানি রাজারামজিকে কুনওয়ারা সিংয়ের দলের বলে জেনে তাঁর আস্তানায় চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু তার আগে নিজের ধনদৌলত লুকবার ব্যবস্থা করে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার

শাস্তি দিতে লালাজি ভোলেননি। ওপারে যাবার পর আপনার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, ওপারে গেলেই সবজান্তা হওয়া যায় না। তাই রাজারামজির লুকনো দৌলতখানার হদিস আপনি পাচ্ছেন না। তা পাবার জন্যেই এখানে এসে এমন পাহারা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনি ডালে ডালে বলেই রাজারামজিকে পাতায় পাতায় যেতে হয়েছে। এতক্ষণে বুঝেছি, আপনাকে হদিস না দেবার জন্যে আমার মতো দোস্তের সঙ্গেও বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন বিশ্রী চালাকি করতে হয়েছে। তবে যা তিনি করেছেন, তা একেবারে ঝুটমুট নয়। ওই বেয়াড়া রসিকতার ভেতর দিয়েই আমায় আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর লুকনো দৌলত উপযুক্ত হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। আমি সেই চেষ্টাই এবার করব। দেশের জন্যে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর দৌলত দেশের কাজেই যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ওপারের মিথ্যে ছায়াবাজি দিয়ে লালা রাজারামের লুকনো দৌলতখানা আপনার বংশের কারও হাতে তুলে দেওয়ার আশা আপনার আর নেই।'

মুনশি মুলুবচাঁদের ফ্যাকাশে মুখটা তখন প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে।

সেদিকে চেয়ে বললাম, 'আপনি যে এপারের নন, সেটা প্রথম কী করে বুঝলাম, তাই ভাবছেন নিশ্চয়। একটা কথা তা হলে আপনাকে বলে যাই। ওপারের হয়ে এপারের সাজতে হলে কায়ার চেয়ে ছায়াটার দিকেই বেশি নজর রাখতে হয়। আপনি এমনিতে আজকের আসরটা ভালই সাজিয়েছিলেন। কিন্তু ধরিয়ে দিয়েছে আপনার ছায়াটা। প্রদীপের আলোয় আপনার ছায়াটা ঠিকমতো পড়তে না দেখেই আসল ফাঁকিটা ধরে ফেলে আর সব ব্যাপার আমি বুঝে নিয়েছি। ঠিক যে বুঝেছি, তা তো আপনার ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা নমস্কারটা তা হলে নিয়ে যান।' "

* * *

মেজকর্তার লেখা এখানেই শেষ। যা তিনি লিখে গেছেন, তা সত্য মিথ্যা যাই হোক, তাঁর নিজের হদিস এবারে একটু দিয়ে ফেলেননি কি?

কুনওয়ারা সিংয়ের তিনি নাম করেছেন। কুনওয়ারা সিং তো সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিহারের আরা জেলার কাছে তাঁর জগদীশপুরের রাজ্য থেকে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

মেজকর্তা কি তা হলে সেই সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার মানুষ? তাঁর খেরো খাতা আর-একটু ভাল করে ঘেঁটে দেখতে হবে।

pathagar.net

"ভূত যদি ভক্ত হয়"

"..... সে এক দারুণ জ্বালা!"

ওপরের ওই কোটেশন-মার্কা কথাগুলো আমার নয়।

হ্যাঁ, কাহিনির নামটা যারা পড়ে নিয়েছ, তারা অনেকেই হয়তো ঠিকই অনুমান করেছ যে, কথাগুলো রহস্যময় মেজকর্তার, নাম-ধাম বাদে যাঁর ওই সম্বোধনটুকুই শুধু পেয়েছি লাল শালুতে মোড়া পুঁটলির সেই ছেঁড়াখোঁড়া খেরো খাতা থেকে। কলকাতা শহরের সবচেয়ে লম্বা বাসরুট-এ ভি আই পি রোড ধরে দমদমের দিকে যাওয়ার সময় বেওয়ারিশ অবস্থায় যেটা পাওয়া গিয়েছিল বাস-এর একটি লম্বা সীটের ওপর, আর ওপর ওপর সামান্য একটু নেড়েচেড়ে যার দু-একটা লেখা চোখে পড়ায় কৌতূহলী হয়ে যে পুঁটলিটা নাম-ধাম কিছু পেলে যথাস্থানে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনা আপত্তিতে নিজের দখলে নিতে পেরেছিলাম।

খেরো খাতার পুঁটলিটা বাড়িতে এনে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও ওই মেজকর্তা নামটি ছাড়া কোনও পরিচয় কি ঠিকানার হদিস না পেলেও মেজকর্তার মতিগতি আর নেশা সম্বন্ধে যেসব বৃত্তান্ত পেয়েছি সেসব খেরো খাতার ছেঁড়া পাতাগুলো ঘেঁটে পড়বার চেষ্টা করবার আগে কল্পনাও যে করতে পারিনি, তা অকপটে স্বীকার করছি।

অনেক রকম মানুষের অনেক রকম নেশা, পেশা, বাতিকের কথাই তো শোনা যায়, কিন্তু মেজকর্তার যে খেয়ালের নেশা তা একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

মেজকর্তার একমাত্র নেশা শিকার, আর সে জল-স্থলের কোনও জন্তু-জানোয়ার নয়, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগতে ক্বচিৎ কদাচিৎ যাদের ক্ষণিকের আভাস মেলে, বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার বাইরের সেই অশরীরী ভূতপ্রেতরাই তাঁর মৃগয়ার লক্ষ্য।

তাঁর এ মৃগয়া নেহাত এলোপাথাড়ি যেখানে-সেখানে হানা দেওয়া নয়, রীতিমতো খোঁজখবর নেওয়া তোড়জোড় করা অভিযান। বেশ কয়েকজন মাইনে-করা চর তাঁর জন্যে সারা দেশে তাঁর ওই অদ্ভুত শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর কোথাও কিছু হদিস পেলে সেখানে ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে পাকা খবর তাঁকে জানায়।

pathagar.net

মেজকর্তাকে এ সব শিকারের সন্ধান দেওয়ার ঝক্কি বড় কম নয়। পাকা খাঁটি খবর হলে যেমন দরাজ হাতের বকশিশ, বাজে কাঁচা খবর হলে তেমনই কড়া বকুনি-তাড়ুনি তো বটেই, ঠিক সুখের না হোক এমন মজার চাকরিটাও টলে যেতে পারে।

মেজকর্তার ছেঁড়াখোঁড়া খেরো খাতার ঢাউস পাততাড়ি ঘাঁটতে ঘাঁটতে এখনও পর্যন্ত এ-সত্যটি অন্তত জেনেছি যে, তাঁর সবচেয়ে পাকা হুঁশিয়ার চর হল নসুরাম দাস।

নসুরাম যা খবর আনে তার ষোল আনা না হোক, বারো আনা অন্তত একেবারে ভুয়ো গুজব বলে প্রমাণ হয় না।

নসুরামের এবারের খবরও ভুয়ো গুজব ছিল না। খবরাখবর নসুরাম যা দিয়েছিল তা সবই ঠিকঠিক মিলে গিয়েছিল। কিন্তু অমন একটা পাকাপোক্ত সাচ্চা শিকার শেষ পর্যন্ত যে অমন জ্বালা হয়ে দাঁড়াবে, মেজকর্তা তা কি ভাবতে পেরেছিলেন?

মেজকর্তা লিখেছেন—

* * *

"জায়গাটা দেখে খুশিই হয়ে উঠলাম, নসুরাম দাস খুব একটা বাজে খবর দেয়নি। সে বড় একটা দেয়ও না। তার কথামতো বড় গাঙে কুমিরখালের ঘাটে নৌকো লাগিয়ে নৌকো ছেড়ে খালের ধারের বড় পালেদের আড়ত থেকে মুনিবদের কাউকে নিয়ে হাঁটাপথে ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি খুঁজতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল নসুরাম।

তার এই পরামর্শটা শুনিনি। ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি খুঁজতে কাউকে সঙ্গে নিতে চাওয়ার মানে নিজের মতলবটা প্রায় ঢাক পিটিয়ে জানান।

আড়তের কাউকে না নিয়ে যা করেছি, নসুরাম তা করতে পইপই করে বারণ করেছিল। সে বলেছিল, আর যা করেন, মজা খালের মুখ থেকে কোনও ডোঙা কি শালতিতে উঠবেন না। মিনি-মাগনা নিয়ে যেতে চাইলেও না। এমনিতে সেখানে শালতি কি ডোঙা বড় একটা থাকে না। বহু দূরের বাদা কি বিলের তল্লাট থেকে গোলপাতা কি গরান কাঠের বোঝা মাঝে মাঝে বয়ে আনার দরকারে ছাড়া তারা এখানে আসেই বা কখন।

তেমনভাবে এসে পড়ে খালের মুখে বাঁধা থাকলে তারা যা-সব লোভ দেখায়, তার টান এড়িয়ে যাওয়া কিন্তু সহজ নয়। হাঁটা পথের অন্তত দেড়বেলা সেখানে পৌঁছতে লাগে, তারা দেড় ঘণ্টায় সেই ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে হলফ করে দেখা দেয়। আর শুধু কি তাই? ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়িতে নিয়ে যাবার পথে তারা আরও অন্তত দশটা আজব কিছু দেখাবার ভরসা দেয়, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই জানায় যে, ল্যাংড়া সাহেবের যখের ধনের পাতাল-কুঠরির হদিস, সে-ই কিছুটা অন্তত দিতে পারে।

নসুরাম এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে, কখনও ওদের বিশ্বাস যেন না করি, ওরা প্রত্যেকেই এক-একটি খুনে ডাকাত। জলা-বাদা আর

pathagar.net

জঙ্গলের অকূল পাথারের মুল্লুকে কোথায় কে থাকে কেউ জানে না। কখনও সখনও নতুন শিকারের খোঁজে এদিকে আসে। এদের গায়ে নাকি সেই তিনশো সাড়ে তিনশো বছর আগেকার মগ আর ফিরিঙ্গি হার্মাদদের রক্তও আছে। এরা তাই এ তল্লাটের মানুষখেকো বাঘ-কুমিরের চেয়েও হিংস্র আর শয়তান।

নসুরামের এত কড়া হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও মজা খালের মুখে ডোঙা কি শালতির খোঁজেই গেছলাম কুমিরখালির ঘাটে বজরা থেকে নেমে। গিয়েছিলাম নসুরামের কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দেবার মতো ভেবে একবারে অবিশ্বাস করে নয়। নসুরামের কথাগুলো পুরোপুরি আজগুবি কল্পনা নয়। তার মধ্যে সত্যের কিছু ছিটেফোঁটা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেইটুকুর জন্যে বরাত-জোরে সত্যিই সেই হার্মাদদের সুদূর কোনও নাতির নাতি তস্য নাতির দেখা পেয়ে যাওয়ার আশাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

মজা খালের মুখে কোনও শালতি কি ডোঙার দেখা পেলাম না। একটু হতাশ হয়ে চলে আসছি, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলাম—'ও কর্তা, চলে যেতে আছেন যে!'

চমকে বেশ একটু অবাক হয়েই পেছন ফিরলাম। আরে! সত্যিই তো খালের কিনারায় এক শালতি বাঁধা। তার মাঝিই আমায় ডাকছে। প্রথম এসে একেবারেই তার শালতি বা তাকে দেখতে পাইনি, এইটেই আশ্চর্য।

আমি ফিরে দাঁড়াতে মাঝি শালতি থেকেই বললে, 'আসেন না কর্তা। কুঠিবাড়ি যাবেন তো?'

.এবার অবশ্য ততটা অবাক হলাম না। তবু খালের আর-একটু কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাব তুমি জানলে কী করে?'

'তা আর জানব না কর্তা? ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি দেখতে ছাড়া আপনার মতো মানুষ এই লুসিফারের অরুচি মুলুকে আসবে কেন?'

মনে মনে এবার রীতিমতো চমকালেও বাইরে কিছু বুঝতে না দিয়ে পাড় দিয়ে শালতিটার কাছে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুঠিবাড়ি তো বললে। কার কুঠিবাড়ি তা জান?'

'তা আর জানি না কর্তা!' মাঝি হেসে বললে, 'এখানে ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়ি ছাড়া আর কোনও কুঠিবাড়ি আছে নাকি? আর থাকলেও তা দেখতে আসছে কে?'

একটু থেমে লগি ঠেলে শালতিটা একেবারে পাড়ের গায়ে লাগিয়ে মাঝি আবার বললে, 'আসেন কর্তা। ওঠেন আমার পিনিসে।'

একটু সাবধানে শালতির মধ্যে পা বাড়িয়ে উঠতে উঠতে ঠাট্টার সুরেই বললাম, 'এ তোমার পিনিস বুঝি? আমি তো ভেবেছিলুম আরও বড় কিছু।'

লগির ঠেলায় শালতিটা আশ্চর্য নৈপুণ্যে একেবারে স্থির রেখে মাঝি বললে, 'মানুয়ারও বলতে পারেন কর্তা। দরকার হলে কী না হতে পারে আমার এই শালতি!'

'মানুয়ার' মানে তো ম্যান অব ওয়ার। মানে যুদ্ধজাহাজ। এ কথাটাও শালতিওয়ালার মুখে শুনে আশ্চর্য হয়ে শালতির পেছনের দিকে জোড়া-তক্তাটার ওপর বসে অনেক কিছু বেশ গোলমেলে মাথা নিয়েই ভাবতে শুরু করেছি।

সে ভাবনাগুলো মনেই চেপে রেখে মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়িতে তো নিয়ে যাবে বলছ। সে কুঠিবাড়ি কোথায় জান তো ঠিক?'

'তা আর জানি না?' লগি দিয়ে শালতিটা খালের মাঝামাঝি ঠেলে এনে সামনের দিকে চালিয়ে দিতে দিতে বললে, 'ল্যাংড়া সাহেবকে ল্যাংড়া করলে কে?'

ল্যাংড়া সাহেব অন্তত দেড়শো বছর আগেকার মানুষ। তাকে খোঁড়া করার দাবিতে, মাঝি আর যাই হোক বেশ রগুড়ে মানুষ তা বুঝে, মনের সব প্রশ্নগুলো তারই সঙ্গে মিলিয়ে হালকা করবার চেষ্টা করলাম।

হাসিমুখে বললাম, 'তুমিই তা হলে ল্যাংড়া সাহেবের ঠ্যাং ভেঙেছ! তুমি তো তা হলে বাহাদুর মানুষ। তা তোমার নাম কী?'

'নাম?' মাঝি নাম জিজ্ঞাসাতে একটু যেন অবাক হয়ে বললে, 'নাম আমার মানুল কর্তা। তা সবাই মানুই বলে।'

'নাম তোমার মানুল?' বিস্ময় আর কৌতূহলটা গলার স্বরে খুব লুকতে পারলাম না।

মাঝি কিন্তু সেটা লক্ষ না করেই বলল, 'হ্যাঁ, কর্তা, আমার নাম মানুল পিদরু।'

মানুল পিদরু! অবাক হয়ে ভাবলাম তার মানে কি ম্যানুয়েল পেড্রো? অত করে যা আশা করেছিলাম, সত্যি কি তারই সন্ধান পেলাম। সেই দুরন্ত ভয়ংকর ফিরিঙ্গি হার্মাদদেরই রক্ত যার শিরায় বইছে, এমন কেউ এই মানুল পিদরু? প্রথম থেকেই তার চেহারাটা অবশ্য একটু কেমন বেয়াড়া লেগেছিল। শালতি পাওয়ার ব্যাপারটাই বেশি মনোযোগ কেড়ে রাখায় অন্য সব কিছু তখনকার মতো চাপা পড়েছিল। এখন মানুল পিদরু নামটা প্রথমেই লক্ষ-করা চেহারার বেশ কিছুটা আলাদা ধরন সম্বন্ধে মনটাকে সজাগ করে তুললে।

হ্যাঁ, চেহারাটা আগেই চোখে পড়ে একটু অদ্ভুত লেগেছিল। ফর্সা ঠিক নয়, কিন্তু গায়ের রঙ কেমন একটু হালকা তামাটে, যা এখানকার সাধারণ মানুষজনের মধ্যে দেখাই যায় না।

আর শুধু কি গায়ের রঙ! লম্বাটে পাকানো শুকনো মুখের ওপর মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোও যেন কেমন বেয়াড়া রকমের লালচে। সেই সঙ্গে দু চোখের তারাও যেন আমাদের আর পাঁচজনের মতো কালো কি বাদামি নয়। তাতে যেন কোথায় একটু সবুজের, হ্যাঁ, সবুজেরই ঝিলিক রয়েছে।

মনে মনে তখন আমি নিশ্চিত বুঝে নিয়েছি যে, এই মানুষটা অন্তত দু-তিনশো বছর আগেকার কোনও ফিরিঙ্গি বোম্বেটের বংশধর না হয়ে যায় না। এখানে হানা দেওয়া হিংস্র নেকড়ের পালের মতো সেই হার্মাদেরা কবে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু এই জংলা- জলা-বাদার দেশে তাদের ক-ফোঁটা রক্ত এখনও যেন একেবারে ধোয়া-মোছা হয়ে যায়নি।

কিন্তু এমন একটা চেহারার মানুষ আর তার শালতিটাকে প্রথমে এসে দেখতে পাইনি

pathagar.net

কেন? আমি খুব তাড়াহুড়ো করে যেমন তেমন করে চোখ বুলিয়েই ফিরে যাবার জন্যে মুখ ঘোরাইনি। বেশ ভাল করেই খালের মুখটা লক্ষ করছিলাম।

মনের ধোঁকার কথাটা মুখেই প্রকাশ করলাম এবার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা তোমায় প্রথমে দেখতে পাইনি কেন বল তো? তুমি তো এইখানেই ছিলে?'

'তা ছিলাম বই কী, কর্তা!' মানুল পিদরু ধাঁধার মতো করে জবাব দিলে, 'তবে দেখা দিতে না চাইলে দেখবেন কী করে?'

মানুল পিদরুর যে একটু মজা করে কথা বলার স্বভাব, তা আগেই টের পেয়েছি। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই বললাম, 'শেষ পর্যন্ত দেখা দিতে চাইলে কেন? সওয়ারি পছন্দ হল বলে?'

'তা একটু হল বই কী। নইলে আমার পিনিসে আপনাকে ওঠাব কেন?' বললে পিদরু।

'তা পছন্দটা হল কীসে, তা একটু জানতে পারি?' হালকা সুরে হলেও সত্যিকার কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'পছন্দ হল কেন জানতে চান?' পিদরুর গলা যেন আগের মতো অত হালকা মনে হল না, 'পছন্দ হল নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি বলে।'

'নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি! সে আবার কী?' সত্যিই পিদরুর কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'নির্ঝঞ্ঝাট বুঝলেন না, কর্তা?' মানুল পিদরু আগের মতোই আধা-গম্ভীর স্বরে বলল, 'তার মানে শাবল-কোদাল, গজ-ফিতে, বন্দুক-সড়কি-টড়কির কোনও ঝামেলা নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা।'

'ঝাড়া হাত-পা-র বদলে ওইরকম লটবহর নিয়ে কেউ কেউ আসে নাকি?' একটু বোকার ভান করেই জানতে চাইলাম।

'কেউ কেউ নয়, প্রায় সবাই তাই আসে,' বললে মানুল পিদরু, 'আর আসবে না-ই বা কেন? তারা ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়ি চোখে দেখে তারিফ করতে আসে না, আসে তার যখের ধনের লুকনো পাতাল কুঠরি খুঁড়ে বার করে তার সোনাদানা-হিরে-চুনি-পান্নার পুঁজি বাগিয়ে নিয়ে যেতে। মজা খালের ডোঙা শালতি তারা বড় একটা নেয় না। তার বদলে গাঙের ঘাটের আড়ত থেকে কাউকে নিয়ে হাঁটা পথে দেড়-দু-বেলার হয়রানিতে ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিকে পোড়ো ভিটের জঙ্গল মনে করে যেখানে সেখানে এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে শাবল-কোদাল চালিয়ে জান কয়লা করে ফেলে, তার ফলে একটা ফুটো কি ঘসা পেসোও মেলে না তাদের কপালে।'

পয়সার বদলে পিদরুর 'পেসো' বলাটা মনে মনে টুকে রেখে বললাম, 'সেটা ল্যাংড়া সাহেবের আসল কুঠিবাড়ি নয় বলেই কেউ কিছু পায় না বুঝি? কিন্তু ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়ি বলে সত্যি কোথাও কিছু আছে কি?'

'তা আছে বই কী, কর্তা।' পিদরু বেশ একটু জাঁক করেই বললে, 'ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি যেখানে ছিল, সেখানে তার গুপ্তধনের পাতাল-কুঠুরিও এখনও ঠিক আছে।'

pathagar.net

মানুল পিদরুকে একটু তাতিয়ে দেবার মতো তোয়াজ করে বললাম, 'তা তুমিও ল্যাংড়া সাহেবকে খোঁড়া করেছিলে যখন তখন আর কেউ না জানুক, তুমি পাতাল-কুঠুরির পাত্তা জান নিশ্চয়?'

'আমি ছাড়া আর কে জানবে?' পিদরু যেন বুক চিতিয়ে বললে, 'ও পাতাল-কুঠুরির যখের ধনের আমিই তো পাহারাদার।'

'তুমিই পাহারাদার?' চেষ্টা করেও আমার গলার উপহাসটা পুরোপুরি লুকতে না পেরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা সে পাতাল-কুঠুরি কোথায় একটু জানতে পারি?'

'হ্যাঁ, শুধু একটু জেনে নিলে দোষ কী?'

আমি পিদরুকে আশ্বাস দেবার সুরে বললাম, 'দেখছ তো আমি শাবল-কোদাল নিয়ে আসিনি। কুমতলব থাকলেও তোমারই শালতি থেকে তোমায় ফাঁকি দিয়ে তাই খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু নিয়ে যেতে পারব না। সুতরাং জায়গাটা শুধু আমায় নির্ভয়ে দেখিয়ে রাখতে পার।'

'বেশ, তাহলে দেখেই রাখুন।' পিদরু কীরকম এক অদ্ভুত গলায় বললে, 'আপনি যেখানে বসে আছেন কর্তা, যখের ধনের পাতাল-কুঠুরি ঠিক তারই নীচে।'

'কী!' প্রায় অস্ফুট চিৎকারের সঙ্গে প্রথমে নীচের দিকে আর তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বুকটা হঠাৎ যেন কেমন হিম হয়ে গেল।

এ কোথায় আমায় এনেছে পিদরু! যে দিকে চাই, সে দিকেই তো শুধু কূলকিনারাহীন জলা। সে জলার চেহারা যেন আরও ভয়ংকর করে তোলবার জন্যেই এখানে সেখানে গরান ক্যাওড়া কসাড়ের মতো সব জলা-জংলার গাছের বিরাট সব ঝোপের জটলা উঠেছে।

এ কোন জায়গা? মজা খালে মানুল পিদরুর শালতিতে ওঠবার পর তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন এই অকূল জলার রাজ্যে এসে পড়েছি তা লক্ষই করিনি নাকি?

কিন্তু যার শালতিতে চড়ে এসে গেছি, সেই পিদরুই বা এখন কোথায়? শালতির ওপর আমি একলা বসে আছি। মানুল পিদরুকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আমার চারিধারে ওটা কী বিশ্রী শব্দ শুনছি। আচমকা যে ঘূর্ণি হাওয়াটা আমার শালতিটাকে দুলিয়ে দুটো পাক দিয়ে ঘুরিয়ে বয়ে চলে গেল এ শব্দটা কি তারই? তবে এমন বিদঘুটে গায়ে-কাঁটা-দেওয়া অট্টহাসির মতো শোনাচ্ছে কেন?

শালতিটা যেরকম ভয়ংকরভাবে দুলছে, তাতে তা থেকে জলে ঝাঁপ দিলেই এর চেয়ে নিরাপদ হবে মনে হচ্ছে বটে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে জোর করে শালতির দুটো ধার জম্পেশ করে ধরে বসে আছি। হার মানব না। কিছুতেই মানব না। দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়।

হলও সত্যি কিছু। আর যা হল তাতে সন্দেহ হল এতক্ষণ আমার নিজেরই মাথাটা হঠাৎ একটু ঘুরে গিয়েছিল বলে সব ভুল দেখেছি কি না!

pathagar.net

নইলে ওই তো পিদরু শালতির ধারের জল থেকে এক হাতের মুঠোয় কী একটা নিয়ে শালতির সামনের দিকটা হাত বাড়িয়ে ধরে সেই হাতের ওপরই ভর দিয়ে ওপরে উঠে এল। আমি অকূল জলায় এদিকে ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখার সময় সে শালতি থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিয়েছিল মনে করাই উচিত।

কিন্তু তা মনে করতে পারলাম কই?

মানুল পিদরুর গায়ে মাথায় বুকে কি হাঁটুর ওপর তোলা আঁটসাঁট করে মালকোঁচা-মারা খাটো কাপড়ের কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্ন নেই। জলের বদলে সে যেন এক শূন্য হাওয়াতেই ডুব দিয়ে উঠে এসেছে। নতুন কিছুর মধ্যে তার হাতের মুঠোয় কিছু একটা জিনিস আর তার কোমরে জড়ানো চামড়ার বেল্টে নকশা-তোলা সেকেলে খাপে একটা ছোরা।

যা বুঝবার তা বুঝে বুকের ভেতরটা একবার যে কেঁপে ওঠেনি, তা বলব না। মানুল তার সবুজের ছিটে দেওয়া চোখে যেভাবে আমার দিকে তখন তাকাচ্ছে, তাতে এ সর্বনাশা শালতি থেকে জলার ওপরেই ঝাঁপ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে একবার যে অস্থির হয়ে উঠিনি এমনও নয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে কোনওরকমে সামলে মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, 'এক ডুবেই যেন বেশ কিছু তুলে এনেছ মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তা খুব জবর কিছুই এনেছি, কর্তা!' একটু যেন বেশি গম্ভীর স্বরে বলল পিদরু।

বাঁ হাতটা তার মুঠো করাই ছিল। সে মুঠো তেমনই বন্ধ রেখে, হঠাৎ ডান হাতে কোমরবন্ধের খাপ থেকে সেখানকার ছোরাটা সে বার করে আনল।

শিউরে-ওঠা ভয়ে চমকান দৃষ্টির জন্যেই বোধহয় আমার মনে হল, ছোরার ঝকঝকে ইস্পাতের পাতটা ঠিক যেন হিংস্র জীবন্ত কিছুর মতো লকলক করে উঠল।

'এ বড় বেয়াড়া চাক্কু, কর্তা। কত জানের খবর নিয়েছে তার হিসেব নেই। একবার ধরলেই হাত যেন কেমন নিশপিশ করে ওঠে চালাবার জন্যে। একবার ধরে দেখবেন নাকি, কর্তা?'

মানুল পিদরু খোলা ছোরাটা আমার দিকে ছুঁড়তে যাচ্ছিল। আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'না, হাত নিশপিশ করাবার লোভ আমার নেই। ও ছোরা তোমার কাছেই থাক।'

'তাহলে এই এসকুদো-টাই দেখুন।' বলে পিদরু বাঁ হাতের মুঠো থেকে যা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে, কোনওরকমে সেটা লুফে নিতে পারলাম। লুফে নেবার পর হাত খুলে দেখি সেটা একটা সোনার মোহর। কিন্তু বাদশাহি মোহর নয়। সেটার ওপর ভিনদেশি অক্ষরের ছাপ। সেই জন্যেই পিদরু বোধহয় এটাকে এসকুদো বলেছে। তার মানে এটা ফিরিঙ্গি হার্মাদদের নিজেদের দেশ পোর্তুগাল কি ইস্পানিয়ার মোহরই হবে নিশ্চয়।

মোহরটা সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল থাকলেও সেটা ফেরত দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে শুধু বললাম, 'এটা তো বিদেশি মোহর দেখছি!'

pathagar.net

'হ্যাঁ, কর্তা, সাত-সমুদ্দুর পারের মোহর!' বলে পিদরু যেন অবাক হয়ে বললে, 'আরে! ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন কর্তা? ওটা আপনিই রাখুন।'

'না', একটু হেসেই বললাম, 'কে জানে কত পাপের রক্ত লাগা ও মোহরে। ওতে আমার লোভ নেই কোনও।'

'লোভ নেই?' পিদরু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললে, 'তা হলে ফেলেই দিন ওটাকে জলায়।'

'না, ফেলতে হলে তুমিই ফেলো।' বলে মোহরটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

পিদরু কিন্তু সেটা ধরবার চেষ্টা করলে না এবার। মোহরটা যেন তার গায়ের ভেতর দিয়েই জলার মধ্যে গিয়ে পড়ল। পিদরু একটু যেন অবিশ্বাসের সুরে শুধু বললে, 'সত্যিই তা হলে মোহরটা নিলেন না কর্তা?'

একটু থেমে লোভ দেখাবার চেষ্টা করে আবার বলল, 'ওই একটার বদলে একটা ঘড়া ভর্তি মোহর হলে নেবেন কি?'

এসকুদো-মোহরটা মানুল পিদরুর ঠিক যেন গায়ের ভেতর দিয়ে জলে গিয়ে পড়বার পর আপনা থেকে একটু না শিউরে উঠে পারিনি। সেই তখনকার অস্বস্তির অনেকটা এতক্ষণে কাটিয়ে উঠে বেশ একটু জোর গলাতেই বললাম, 'অমন এক-দু ঘড়া কেন, দশ-বিশ জোড়া সিন্দুক বোঝাই পেলেও তা নিতে চাই না। শুধু একটা কথা তোমার কাছে জানতে পারলে খুশি হব।'

'কী কথা?' পিদরু কেমন সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, 'কথাটা এই গুপ্তধন সম্বন্ধেই। এসব তো সেই ল্যাংড়া সাহেবের গুপ্তধন। কিন্তু গুপ্তধনের পাতাল-কুঠরি সে এমন অথই জলের মধ্যে বানাতে গেল কেন?'

'ল্যাংড়া সাহেব এমন অথই জলায় তার পাতাল-কুঠরি বানায়নি কর্তা। সে শক্ত শুকনো ডাঙা-জমিতেই তার কিল্লা-কুঠি আর পাতাল-কুঠরি তৈরি করেছিল। কিন্তু তারপর এল সেই দারুণ সব-লণ্ডভণ্ড-করা তুফান, আর খ্যাপা সাগরের সেই মেঘ-ছোঁয়া পেল্লায় ঢেউ, যা সবকিছু ভাসিয়ে এ মুল্লুকটাই দিলে জলেব তলায় চুবিয়ে।'

'তার মানে?' বেশ একটু উত্তেজিতই হয়ে উঠলাম, 'চল্লিশের সেই ঘূর্ণি তুফান আর সমুদ্রের সেই রাক্ষুসে পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের—'

মানুল পিদরু আমার কথার মাঝখানেই আমায় থামিয়ে দিয়ে বললে, 'চল্লিশের কথা কী বলছেন, কর্তা?'

'চল্লিশ মানে? আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'সেই বারোশো চল্লিশ, সাহেবদের আঠারোশো তেত্রিশ সালের ভয়ংকর ঝড় আর সমুদ্রের রাক্ষুসে বানের কথা বলছি—এই জলা-জঙ্গল গ্রাম-গঞ্জ যা ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল।'

'তা দিয়েছিল বটে কিন্তু তাতে কী?' মানুল পিদরু একটু যেন মেজাজ দেখিয়ে বললে, 'ও সব আপনাদের নতুন সাহেবি হিসেব ভুলে যান কর্তা। যে-সালের কথা

pathagar.net

বলছেন তার কতকাল আগে কতবার এসব তল্লাটে অমন সর্বনাশা তুফান সব ওলট পালট করে গেছে, তার খবর ক-জন জানে। শুনুন কর্তা, আপনার ওই নতুন সাহেবি হিসেবের তেত্রিশ সালের অন্তত দুশো বছর আগের কথা আমি বলছি। যাদের আপনারা ফিরিঙ্গি হার্মাদ বলেন, তাদের দুই সর্দার একসঙ্গে মিলে এই অঞ্চলের ছোটোবড় অনেক রাজত্ব লুটেপুটে ছারখার করে এখানেই এক কিল্লাকুঠি বানিয়েছিল। সেই কিল্লাকুঠিই ছিল তাদের হানা দিতে বার হবার আর লুটতরাজের সম্পত্তি এনে জড়ো করবার মূল ঘাঁটি।

'এ দুই সর্দারের একজন ছিল আমার বাবা আনটুনি পিদরু আর অন্যজন সান্‌চো গোমাই। লুট-করা ধনদৌলতের পুঁজি যখন অনেক জমে উঠেছে, তখন এ-দেশের রেওয়াজ মাফিক এক মতলব আমার বাবার মাথায় আসে। মতলবটা হল কোথাও গুপ্তধনের এক লুকনো পাতাল-কুঠরি তৈরি করে সমস্ত লুটের ধনদৌলত সেখানে লুকিয়ে রাখা। বন্ধু গোমাইকে সে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ মতলবে রাজি করায়। মনে মনে সান্‌চো গোমাই তখন কী ভয়ংকর শয়তানি মতলব যে এঁটেছে, তা তার এতদিনের দোসর হয়েও আনটুনি পিদরু একটুও আঁচ করতেও পারেনি। সান্‌চো গোমাইয়ের নিজের কোনও ছেলেটেলে ছিল না, কিন্তু আনটুনি পিদরুর ছিল একটি। সে আর আনটুনি মারা যাবার পরও গুপ্তধন যাতে নিপাত্তা না হয়ে যায় তাই গুপ্ত কুঠরিটা দেখিয়ে রাখার জন্যে সে আখেরে আসলে ওয়ারিশ হিসেবে আনটুনি পিদরুর ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা তোলে। কোনও রকম সন্দেহ না করে আনটুনি পিদরু তাতে রাজি হয়।

'তারপর সানচো গোমাই অতি সহজেই তার মতলব হাসিলের ব্যবস্থা করে। তারপর গুপ্তধনকে যখের ধন করে তোলবার জন্যে আর তা আগলাতে আনটুনি পিদরুর ছেলেটাকে জোর করে ধরে পাতাল-কুঠুরির গহ্বরে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে ওপর থেকে গহ্বরের মুখটা ভারী পাথর চাপা দিয়ে এঁটে দেয়। আনটুনির ছেলেটা বাপকে খুন হতে দেখে অনেক চেষ্টা করেছিল সানচো গোমাইয়ের কবল থেকে ছাড়া পাবার। কিন্তু আট-দশ বছরের একরত্তি একটা ছেলে গোমাইয়ের মতো শয়তান দৈত্যের সঙ্গে পারবে কেন। সানচো গোমাই তাকে প্রায় দলা-পাকিয়ে পাতাল-কুঠুরির গহ্বরের ভেতর ফেলে দিয়ে দেড়মনি পাথরটা চাপা দেবার আগে বলেছিল, খুব ভাল করে পাহারা দিবি, আমি বা আমার বংশের আর কেউ যেন এ যখের ধনের একটা দামড়িও না ছুঁতে পারে।

'তা আনটুনির বেটা সে কথা তার রেখেছে এখনও পর্যন্ত। নসিবও তাকে সাহায্য করেছে। তাকে পাতাল-কুঠুরিতে বন্ধ করার পরের দিনই সেই দুনিয়ার ঝুঁটি-ধরে-পাক-খাওয়ানো ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে কালাপানির মেঘ-ছোঁয়া ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে দিয়েছিল লণ্ডভণ্ড করে।

'সান্‌চো গোমাইয়ের গাঁথা পাতাল-কুঠুরির ওপরের পাথর তাতে এমন কিছু না নড়লেও নীচের দিকের গাঁথুনি প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় গেছে আলগা হয়ে, আর সেই সেদিকে ধসে পড়া গাঁথুনির ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে আনটুনি পিদরুর ছেলেটা।

'বেরিয়ে এসেও বেশ কিছুদিন কোনও মতো তাকে প্রাণটুকুকে ঠোঁটের ডগায় আটকে বাঁচা-মরার কিনারায় ঝুলে থাকতে হয়েছে। তারপর তুফান ঠাণ্ডা হয়েছে, কালাপানির ঢেউ কিছুটা ফিরে গেছে, কিন্তু তামাম মুল্লুকটায় ডুব-জল সেই থেকে আর নামেনি।

'পাতাল-কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আনটুনি পিদরুর বেটা কাছের একটা কসাড়-ঝোপে আটকে-থাকা তার বাপের মুর্দা থেকে ছোরা সমেত এই কোমরবন্ধটা খুলে নিয়ে নিজের কোমরবন্ধে বেঁধেছে। তারপর কিছু দূরের আর-একটা গরান-জংলায়-ভেসে-এসে-লাগা কোথাকার একটা ভাঙা শালতি পেয়ে সেইটেকেই তার বাসা করেছে।

'বদলার জন্যে খুব বেশিদিন তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। সান্‌চো গোমাই তুফানে আর কালাপানির ঢেউয়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে খেয়ে আছড়ে গিয়ে পড়েছে অনেক দূরের এক ডাঙায়। কিন্তু প্রাণে মারা যায়নি। কিছুদিন বাদে আপদ-বিপদ কিছুটা কাটলে নতুন আস্তানায় একটা ডিঙি জোগাড় করে সে তার যখের ধনের পাতাল-কুঠুরির খোঁজ করতে এসেছিল।

'খোঁজ তাকে আর পেতে হয়নি। গরান-জংলার একপাশে তার ভাঙা শালতিতে আনটুনি পিদরুর বেটা এমনই একটা মওকার জন্যেই দিন গুনছিল। গরান-জংলার ওদিক থেকে সান্‌চোর ডিঙিটা বেরিয়ে আসা মাত্র কসাড়-ঝোপের আড়াল থেকে সে তার শালতি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তারপর আর এক লহমাও দেরি করেনি। কোমরবন্ধের খাপ থেকে লকলকে ছোরাটা টেনে বার করে প্রায় নির্ভুল নিশানাদারিতে ছুঁড়ে দিয়েছে সান্‌চো গোমাইয়ের দিকে। ছোরাটা গিয়ে বুকে না হলেও প্রায় হাতল অবধি বিঁধেছে গোমাইয়ের উরুতে। গোমাইও তখন তার গাদা কারবাইন বন্দুকটা ছুঁড়েছে আনটুনির বেটার দিকে। কিন্তু ফল কী হয়েছে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে পারেনি। দেখতে দেখতে শরীর তার অবশ হয়ে আসছে। হাতে তার বন্দুকটা ধরে রাখবার জোরও যেন নেই। এরপর আনটুনি পিদরুর বেটা তার শালতি নিয়ে এসে চড়াও হলে কী হবে বুঝে সে শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে বন্দুকটা ফেলে ঠেলা দিয়ে ডিঙিটা চালিয়ে কোনও রকমে পালিয়ে গেছে তার নতুন আস্তানায়।

'সান্‌চো গোমাই নিজের ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে মরেনি, কিন্তু একটা পা তার একেবারে গেছে বরবাদ হয়ে। সেই থেকে সান্‌চো গোমাইয়ের বদলে ল্যাংড়া সাহেব বলেই তার পরিচয়।

'একটা পা খোয়া গেলেও ঘা-টা শুকোবার পর ল্যাংড়া সাহেব আবার তার গুপ্তধনের খোঁজে আসতে ছাড়েনি। এখনও সে হামেশাই আসে। ওই দেখুন না—'

pathagar.net

মানুল পিদরু যে-দিকে আঙুল বাড়িয়েছে, সে-দিকে মুখ ফিরিয়ে এবার শিউরে উঠেছি। সত্যিই ছোট একটা ডিঙি বেয়ে দৈত্যাকার যে-মানুষটা আমাদের দিকে আসছে, তার চেহারায় হিংস্র ভয়ংকর এমন একটা কিছু আছে, স্পষ্ট দেখা না গেলেও দূর থেকেই তা যেন একটা আতঙ্কের তরঙ্গ ছড়ায়। আমাদের দিকে কিছুদূরে এসেই সে হঠাৎ তার ডিঙিটা থামিয়ে তার কাঁধের গাদা বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরল আমাদের দিকে।

ভয়ে শিউরে উঠে হঠাৎ বেসামাল হয়ে শালতি থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম কি না জানি না, কিন্তু ভয়ের কাঁপুনিটা শুরু হবার সঙ্গেই পিদরুর গলা শুনলাম, 'ভয় পাবেন না কর্তা। আমার মতো দোভাঁজ চোখ ও ল্যাংড়া সাহেবের নেই। ও শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছে, আপনাকে নয়।'

কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করার মধ্যেই ওদিকের ডিঙির সানচো গোমাইয়ের গাদা-বন্দুকের জবাবে মানুল পিদরুকে খাপ থেকে তার ছোরা খুলে নিয়ে এক ঝটকায় ছুঁড়ে দিতে দেখলাম। ল্যাংড়া সাহেবের গাদা বন্দুকও সেই মুহূর্তে গর্জে উঠেছে। পিদরুর ছোরাটা তার উরুতে গিয়ে গাঁথবার সঙ্গে সঙ্গেই পিদরুও যেন গুলিলাগা রক্ত-মাখা মুখে শালতির তলায় ঝাঁপ দিলে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাথাটা ঘুরে গিয়ে চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। তারপর—তারপর একটু সামলে উঠেই দেখলাম চারিদিকের অকূল জল-জংলার মাঝে ভাঙা শালতির মধ্যে আমি একা। দিনের আলো এর মধ্যে বেশ ম্লান হয়ে এসেছে। জনমানবহীন সমস্ত অঞ্চলটার ওপর বুকের-মধ্যে-অদ্ভুত-গা-ছমছম-করানো কাঁপুনি তোলা একটা অজানা অদৃশ্য কিছুর ঘেরাটোপ যেন নেমে আসছে।

ভয় ভাবনায় উদ্বেগে এমন করে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকলে কিন্তু চলবে না। যেমন করে হোক আমার বজরা যেখানে বাঁধা গাঙের ধারের সেই মজা খালের মুখে পৌঁছতে হবে। পথের হদিস জানি না, শুধু আকাশের আলো দেখে আন্দাজে যতটা সম্ভব দিক নির্ণয় করে শালতির লগিটা তুলে নিয়ে জলের তলায় ঠেলা দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গেলাম।

কিন্তু লগি আর ঠেলতে হল না। চমকে উঠে দেখলাম আমি আর শালতিতে একা নই। শালতির মাথায় সেই মানুল পিদরু ঠিক আগেকার মতোই বসে আছে। লগিটা আমি জলে নামাবার আগেই একটা হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে টেনে এনে নিয়ে সে বললে, 'ও কী করছেন, কর্তা? এই লগি কি এখানকার জলের তল পাবে? অমন পাঁচ লগিতেও না।'

'তা হলে!' চেষ্টা করেও ভেতরের উদ্বেগটা সম্পূর্ণ লুকতে না পেরে বললাম, 'এখান থেকে ফিরব কী করে? মজা খালের মুখে আমায় পৌঁছতেই হবে যে আজ।'

'পৌঁছতেই হবে আজ?' মানুল পিদরু বেশ বিষণ্ণ গলায় বললে, 'বেশ, চলুন তা হলে।'

pathagar.net

লগি-টগি সে আর নিলে না। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শালতির পেছনের প্রান্তে বসে একদিকে একটু নুয়ে জলে ক-টা চাপড় দিতেই শালতিটা সামনের দিকে ভেসে চলল।

কী করে যে চলছে তা বুঝলাম না। চেষ্টাও করলাম না বোঝবার। শালতিটা শুধু আমার জন্যে চললেই হল।

তা চলছিল বেশ ভালই। তরতর করে যেন কলের নৌকার মতো জল কেটে দু ধারের গরান-জংলা আর কসাড়-ঝোপগুলো ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ এমনই গিয়েই হঠাৎ শালতিটা যেন লাগামের টানে গেল থেমে। সামনের দিকেই মুখ করে বসেছিলাম। হঠাৎ থামায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে অবাক হয়ে পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল কী, এমন করে হঠাৎ থামল যে!'

'আজ্ঞে, আমিই থামিয়ে দিলাম,' জবরদস্তি-টস্তি নয়, মানুল পিদরু প্রায় করুণ গলাতেই বললে, 'আপনার যাওয়া হবে না, কর্তা।'

'যাওয়া হবে না, মানে?' ভয় উদ্বেগ রাগ কোনওটাই আমার গলার স্বরে আর পুকনো রইল না। 'কী, বলছ কী তুমি?'

'আজ্ঞে, আমার কথাটা একটু শুনুন কর্তা', মানুল পিদরুর গলায় রাগের জবাবে রাগ নয়, তার বদলে করুণ মিনতির সুর। সত্যিকার বিষণ্ণ গলায় করুণ আবেদন জানিয়ে সে বলল, 'কী দরকার কর্তা আপনার ফিরে যাবার? কোথায় বা আপনি যাবেন এমন মুলুক ছেড়ে? আপনাকে সত্যি কথাটা বলছি। শোনেন, কর্তা। ঢের ঢের সওয়ারি আমার এ শালতিতে নিয়েছি, কর্তা, ল্যাংড়া সাহেবের আসল যখর ধনের নমুনা তাদের তুলে এনে দেখিয়েছি। শুধু মুখ দিয়ে নয়, তাদের চোখ দিয়েও লালসের লালা গড়িয়ে পড়া আর থামেনি। তারপর সেই আদ্যিকালের আসল পালা যখন সামনে মেলে দিয়েছি, হাতের মুঠোর মোহর তারা ছাড়েনি, কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে এই কামঠ-কুমির-কিলবিল করা জলায়। তাতেই বদনাম হয়েছে আমার শালতির, মজা খালের মুখে গাঙের ঘাটে। আমিই যেন তাদের চুবিয়ে মেরেছি ল্যাংড়া-সাহেবের পাতাল-কুঠুরি দেখাবার লোভ দেখিয়ে। আমি তাদের ডুবিয়ে মারিনি কর্তা, তারা নিজেদের লালসে ডুবেছে, অনেক বেইমানির কালো কলিজার গলতিতে। এদের সকলের থেকে আপনি আলাদা কর্তা। কোথায় আপনি ফিরে যেতে চান? কোন দুঃখে? এই আনজান জলার মুল্লুকে আপনাকে শাহানশা বাদশা করে রাখব কর্তা। ল্যাংড়া-সাহেবের কুঠি যার কাছে ঝোপড়ি, এমন আজব মঞ্জিল দেব আপনাকে খুঁজে, ওই ল্যাংড়া-সাহেবের পালার চেয়ে জম-জমাট রমরমে দুশো বছরের অমন অমন দশ হাজার কিসসার পালা সাজিয়ে দেখাব। না কর্তা, আপনার ফিরে যাওয়া আর হবে না। আপনার মতো মানুষ পেয়ে আর আমি ছাড়ি?'

মানুল পিদরুর কথা শুনতে শুনতে আমি তখন এই ভক্ত ভূতের হাত থেকে কী করে নিষ্কৃতি পাব ভাবতে ভাবতে চোখে অন্ধকার দেখছি।

pathagar.net

ভূতেরা কি মনের ভেতরটা দেখতে পায়? তা পারলে আমার আজ অবশ্য দফা একেবারে রফা। তবু হয়তো মনের কথা জানার ক্ষমতা তাদের নেই, এই আশায় ভেতরের কাঁপুনিটা যথাসম্ভব লুকিয়ে খুশি-হয়ে-ওঠা মুখে উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'ঠিকই বলেছ তুমি। আমার ফিরে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না, ফিরে যেতে চাইও না আমি।'

এক লহমার জন্যে একটু যেন থমকে থেমে পড়ে ভুরু কুঁচকে মুখটা ব্যাজার করে বললাম, 'কিন্তু ওই একটা ঝামেলার কথাই শুধু—'

'ঝামেলা!' মানুল পিদরুর আমার কথার মাঝেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'কী ঝামেলা?'

অনেক কিছুই এর মধ্যে ভেবে নিতে হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে গোলমেলে ব্যাপারটা যেন সোজা করে বোঝাবার জন্যে নতুন দিক থেকে কথাটার একটা খেই ধরলাম, 'আচ্ছা, ল্যাংড়া-সাহেব মানে সান্‌চো গোমাই যাকে তার গুপ্তধনের যখ করেতে চেয়েছিল, তুমিই তো সেই আনটুনি পিদরুর ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা' একটু গর্বভরেই বললে মানুল পিদরু।

'নেহাত বাচ্চা ছিলে তো তখন', আমি যেন দরদ দেখিয়ে বললাম, 'তাই দুনিয়ার সব হালচাল জানবার সুবিধে হয়নি।'

'না, কর্তা,' পিদরু প্রতিবাদ জানালে, 'নেহাত বাচ্চা নয়, যখ হবার সময় তেমন লায়েক না হলেও শয়তান সান্‌চো গোমাইকে ছোরা গেঁথে খোঁড়া করবার পর সেও যেমন ল্যাংড়া- সাহেব হয়ে অনেকদিন টিঁকে ছিল, আমিও তেমনই তার বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হলেও তখনই টেঁসে যাইনি।'

'হ্যাঁ,' আমি সায় দিয়েই বললাম, 'সানচো গোমাইকে খোঁড়া করবার দিন তুমি যে তার গুলিতে খতম হওনি, তা তোমার এখনকার এই চেহারা দেখেই বুঝেছি। কিন্তু বাচ্চা-বেলায় খতম না হলেও দুনিয়ায় ক-টা বেড়াজালের জ্বালার কথা জানবার বদনসিব তোমার হয়েছে? দায়রা সোপর্দ চারশো বিশের মামলায় ফৌজদারি সমনজারির হুলিয়া কি পিছু নিয়েছে কখনও?'

'কী!'

কী, তা আমিই কি জানি! পিদরুর গলার আওয়াজ আর চোখের ঘোর দেখেই বুঝলাম হঠাৎ-ভেবে পাওয়া প্যাঁচটা ঠিকমতোই খেটে গিয়ে পিদরুর ভুতুড়ে মাথাতেও ভাল রকম চরকি পাক লাগাতে পেরেছে।

মানুল পিদরুর ভ্যাবাচাকা মুখের জিজ্ঞাসার জবাবে মুখটা যতখানি সম্ভব থমথমে করে বললাম, 'আমার ঝামেলা হল ওই একটা মামলার সাক্ষী দেওয়ার তলব। ঠিক দিনের দিন আদালতে হাজিরা না দিলে সমনজারিটা হুলিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াবে।'

পিদরু একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'সে হুলিয়া এখানে পর্যন্ত এসে খুঁজে পাবে কি?'

pathagar.net

'না পেলে নিস্তার আছে নাকি?' আমি হতাশ গলায় বললাম, 'সমনটা এখানকার কোনও গরানের জংলায় লটকে দিয়ে গেলেই হল। সে সমন আর ঠেকাতে পারবে কেউ? তার চেয়ে মামলার সাক্ষীর জবানবন্দিটা দিয়ে আসাই ভাল।'

'কিন্তু সাক্ষী দিয়ে আপনি,' একটু সন্দিগ্ধ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে পিদরু, 'ঠিক ফিরে আসবেন কি?'

'বাঃ, আসব না তো যাব কোথায়!' জোর গলায় বললাম, 'আর না এলে তুমিই তো টেনে আনবে গিয়ে।'

'না, না!' মানুল পিদরু সভয়ে বললে, 'আপনাদের ওই মানুষ গিজগিজ-করা সমন আর হুলিয়ার শহরে আমার যাবার ক্ষমতাই নেই। এখানে এই মজা খালের মুখে বড় গাঙের ঘাটের ধারে কাছে গেলেও আমার কেমন ফিকে হয়ে গিয়ে হাওয়ার সামিল হওয়ার অবস্থা হয়।'

'তাই নাকি?' আহ্লাদের ঢেউটা কোনও মতে গলা পর্যন্ত ওঠার আগেই বুকের মধ্যে চেপে রেখে বললাম, 'বেশ! তোমায় যেতে হবে না। আমি নিজেই আসব। এখন আমায় একটু জলদি গাঙের ঘাটে পৌঁছে দাও দিকি।'

পিদরু তা-ই দিয়েছিল। আর এখনও ও কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়াও করেনি। তবে আমিও এখনও ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং কি বজবজ পর্যন্তও যাবার নামটুকু করি না। শুধু আনটুনি পিদরুর বেটা, ল্যাংড়া-সাহেব সান্‌চো গোমাইয়ের দুশমন, আর তার যখের ধনের পাহারাদার মানুল পিদরুর জন্যে মাঝে-মঝে বেশ একটু দুঃখ হয়।"

*　　*　　*

মেজকর্তার লেখা এখানেই শেষ। তাঁর খেরোখাতার পুঁটলি ঘেঁটে মানুল পিদরুর কথা আর কোথাও পাইনি।

pathagar.net

"ভূত যদি বোকা হয়"

"বসু মেলেন পক্ষ
দুই চন্দ্রে এবার
যমজ হেন সখ্য।

যোগ করে যা পাও
গুণে পা বাড়াও।

পুবে গেলেই সোজা
সাঙ্গ হবে খোঁজা।

সেথায় স্বপ্নধাম
পুরায় মনস্কাম।

একটি শুধু শর্ত
কুবের হতে চাইলে
ছাড়তে হবে মর্ত্য।"

মূল রহস্যের একটু আভাস দেবার জন্যে ছড়ার ধাঁধাটা প্রথমে ছেপে দিলেও কাহিনির আরম্ভ শিরোনামার ওই কোটেশন মার্কার মধ্যে রাখা অসমাপ্ত ওই উক্তিটিতে।

তবে কোটেশন মার্কা দেওয়া কথাগুলো যে আমার নয়, যার খেরো খাতার লালশালুতে বাঁধা পুঁটলি কলকাতার সব চেয়ে লম্বা পাল্লার বাসরুট-এ বেওয়ারিশ অবস্থায় পেয়ে তা থেকে এ পর্যন্ত অনেক আজব কাহিনী উদ্ধার করেছি সেই অন্য কোনও পরিচয়হীন মেজকর্তার তা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না।

এ কাহিনির যা শিরোনামা, কথা প্রসঙ্গে এক জায়গায় তা লিখে মেজকর্তা কিন্তু গোড়ায় বেশ অস্থিরতার যন্ত্রণা দিয়েছেন।

কথাটা লেখা খেরোখাতার একটা ছেঁড়া পাতার একেবারে তলার লাইনে। তার পরে শুধু একটি মাত্র শব্দই লেখার জায়গা হয়েছে। সেই শেষ কথা হল— "তা হলে"।

সব সুদ্ধু জড়িয়ে বাক্যটার আরম্ভ তাই এই দাঁড়িয়েছে— "ভূত যদি বোকা হয় তা হলে—"

তা হলে কী? সেইটিই সরাসরি জানতে না পারার দরুন অস্থিরতার যন্ত্রণাটুকু পেতে হয়েছে। মেজকর্তা যে ইচ্ছে করে এ যন্ত্রণাটুকু দেবার ব্যবস্থা করেছেন তা বোধহয় নয়। লিখতে লিখতে একটা পাতার তলাতেই কথাগুলো এসেছে। তারপর তাঁর ভুলো অগোছাল স্বভাবে পরের কথাগুলো ঠিক পরের পাতার মাথা থেকে লেখা শুরু করেননি।

পরের কথাগুলো পাবার জন্যে ছেঁড়া খেরো খাতার এলোমেলা ভাবে ভাঁজ করে সেলাই করা পাতাগুলো যতক্ষণ হাঁটকাতে হয়েছে ততক্ষণই উদ্বেগ আর যন্ত্রণাভোগটা চলেছে।

ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে শেষপর্যন্ত? ছেঁড়া খেইটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে তো? না মেজকর্তা আরও কয়েকবার যেমন করেছেন তেমনই খেয়ালি অন্যমনস্কতায় লিখে থাকলেও পরের পাতাগুলো এ খাতার বান্ডিলে জুড়তেই গেছেন ভুলে?

না, তা তিনি ভোলেননি। শেষ পর্যন্ত সব লেখাটাই পাওয়া গেছে। এলোমেলো ভাবে এখানে সেখানে জুড়ে দেওয়া বলে লেখার পাতাগুলো খুঁজে বার করে সাজিয়ে নিতে বেশ একটু হাঙ্গামা হয়েছে, এই যা।

"ভূত যদি বোকা হয় তা হলে" বলে অসমাপ্ত বাক্যটি মেজকর্তা যা দিয়ে পূরণ করেছেন তা কিন্তু সত্যি চমকদার।

"ভূত যদি বোকা হয় তা হলে" পর্যন্ত পড়ে পরের কথাগুলো যা যা হতে পারে বলে অনুমান করেছিলাম সে সব একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে মেজকর্তা লিখেছেন—

"তা হলে তার দাম লাখ লাখ।"

হ্যাঁ, ওই আজব কথাই লিখেছেন মেজকর্তা। লাখ লাখ মানে যে লাখ লাখ টাকা তা বোঝা শক্ত নয়, কিন্তু ভূত বোকা হলে তার দাম লাখ লাখ টাকা বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন মেজকর্তা?

কথাটা তো প্রলাপ বলেই মনে হয়।

প্রলাপের মতো শোনালেও খেরো খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে মেজকর্তাকে যেটুকু জেনেছি বুঝেছি তাতে তাঁর কথা ভূতে-পাওয়া কোনও অভাগার আবোল তাবোল বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। কথাটার একটা গূঢ় মানে নিশ্চয় আছে। সেই মানে খোঁজার অদম্য তাগিদে খেরো খাতা ওলট পালট করে ঘেঁটে যা পেয়েছি তা মেজকর্তার নিজের জবানিতে তুলে দেওয়াই ভাল।

pathagar.net

"ভূত যদি বোকা হয় তা হলে" পর্যন্ত এক পাতায় লিখে মেজকর্তা তারপর আর এক ছেঁড়া পাতায় "তার দাম লাখ লাখ" বলে বাক্যটা পূরণ করে তারপর লিখেছেন—

*　　*　　*

"বরাত যখন খোলে তখন না চাইতেই খোলে! না চাইতেই কেন, বরং না চাইলেও খোলে বলা যায়। আমার বেলা বেশির ভাগ অন্তত তাই হয়। যেন ভাল করে চার-টার ফেলে পয়লা নম্বরের ছিপ বঁড়শি সুতো আর টোপের সরঞ্জাম নিয়ে মাচা বেঁধে বসেছি নাম করা দিঘিতে কমপক্ষে আধমনি একটা মাছ গেঁথে তুলব বলে, কিন্তু সারাদিনে ফাতনায় একটা ঠোকর পড়ে না। অথচ সস্তা কঞ্চির একটা মামুলি ছিপে ময়দার ডেলার একটু টোপ লাগিয়ে এলোপাথাড়ি যেখানে হোক কোনও আঘাটায় ফেলতে-না-ফেলতে ফাতনাটা চোঁ চোঁ ডুব মেরে প্রায় নিপাত্তা! কীসে টোপ গিলেছে? হাঙর, না কুমীর? না, হাঙর কুমীর কেন হবে? টোপ গিলেছে আসল মক্কেল।

মক্কেল কি যেমন তেমন? ফাতনাটা চোঁ চোঁ করে ডুবে যাওয়ার পর হুইলের সুতো ছেড়ে আর গুটিয়ে তাকে বাগ মানিয়ে টেনে তুলতে তো জান কয়লা হবার জোগাড়। মাছ নয় তো, যেন জলের তলায় দানো। অনেক হয়রানির পর কোনওমতে তাকে পাড়ের কাছে এনে তোলবার আশা করছি, হঠাৎ ছিপে এক হেঁচকা টান। বন বন করে হুইল ঘুরছে এমন জোরে যে সুতোই বুঝি ছিঁড়ে যায়। সুতো না ছিঁড়ুক, হুইল একবার জ্যাম হয়ে গেলে ওই প্রচণ্ড টানে ছিপসুদ্ধু আমাকেই তো জলে গিয়ে পড়তে হবে ছিপ আর মাছের মায়া না ছাড়লে! ভাগ্যের জোরে হুইল জ্যাম হয় না। কিন্তু জলের দানো হুইলের সব সুতো প্রায় ফুরিয়ে দিয়ে হঠাৎ গোঁত্তা মেরে জোলো দামের এক জংলা ঝোপে জলের তলায় পাঁকের মধ্যে সেঁধিয়ে ঘাপটি মারে। সে কি যেমন তেমন ঘাপটি! দিঘির তলায় কোনও গহ্বরের মধ্যেই যেন সেঁধিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে আছে। হুইল গুটিয়ে যত টানই দাও, তাকে নড়ায় কার সাধ্যি। শেষে কলা গাছের ভেলা বানিয়ে তাতে চড়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তবে তাকে নড়িয়ে বার করা গেছে। কিন্তু বার করা মানেই তো বাগে আনা নয়! বার করবার পরই আবার সেই রাম ছুট আর নতুন করে ঘাপটি! এমনই যে কতবার তা গুণতেই গেছি ভুলে। সকালে যে মাছ টোপ গিলেছিল তাকে সন্ধ্যের পর মশাল জ্বালিয়ে আধ-মজা দিঘির পাড় পর্যন্ত টেনে আনতে পেরে কোনও রকমে জলের তলায় কাপড় বিছিয়ে দু-দুটো মদ্দ লেগেছিল ডাঙায় তুলতে।

দম ছুটনো হয়রানির পর বড় জবর খুশি করেছিল বলে আলটপকা পাওয়া মাছটার কথা একটু বেশি করেই লিখে ফেললাম। তবে লেখাটা একেবারে ধান ভানতে শিবের গীত নয়। না চাইতে পাওয়ার বরাতটা আমার সত্যিই বেশ একটু অদ্ভুত ধরনের। কখনও কখনও সেটা ছাতি-ফাটা-তেষ্টার সময়ে পাকা রেল পাওয়ার মতো ব্যাপার হলেও এক-এক সময়ে ছপ্পর ফুঁড়ে ঢেলে দেওয়া গোছের সৌভাগ্যও হয়।

pathagar.net

হবার আগে অবশ্য আঁচটুকুও পাওয়া যায় না। এবং তার উল্টো।

সেবার মুকসুদাবাদ থেকে বড়কর্তার ফরমাশ মতো বর্ধমান হয়ে আসতে গিয়ে কী হয়রানিটাই না হয়েছিল। মুকসুদাবাদের কাজটাই আসল। শুধু সেইটে সেরে আসার দায় থাকলে তোফা আরামে বড় বজরায় গঙ্গা বেয়ে যেমন গিয়েছিলাম তেমনই করে ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু বড়কর্তার ইচ্ছে মুকসুদাবাদের কাছারির কাজ শেষ করে বর্ধমানের রাজ দপ্তরে একটা হারান পুরনো দলিলের তলাশি করে আসি।

বড়কর্তা তাঁর ইচ্ছেটা নেহাত কথায় কথায় জানিয়েছেন। তেমন জোর দিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে মানেই আমার কাছে হুকুম। বিশেষ করে বিষয়-আশয় সংসার-টংসার ব্যাপারে আমি যতটা পারি ঝাড়া হাত-পা আছি বলেই কখনও কখনও বড়কর্তার মুখ দিয়ে কিছু শুনলে আমার কাছে তা শাহানশাহি ফরমান এর চেয়ে বেশি।

বড়কর্তার ইচ্ছে পূরণ করতে মুকসুদাবাদ থেকে নদী ছেড়ে ডাঙার পথেই বর্ধমান যাবার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু ডাঙা পথের যা ভরসা সেই কেরায়ার ঘোড়া পাওয়াই হয়েছে প্রায় অসম্ভব।

নবাবি যাবার পর থেকে মুকসুদাবাদের হাল এমনিতে বেহাল হতে শুরু করেছে। বড় বড় কুঠির অনেকেই কাশিমবাজারে উঠে গেছে কি যাই যাই করছে কলকাতায়। কেরায়ার গাড়ি-ঘোড়া জোগানদারেরাও ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে শুরু করেছে একে একে। এই সঙ্গে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে কোত্থেকে এক ছোঁয়াচে কাশির আমদানি হয়েছে আস্তাবলে আস্তাবলে। কেরায়ার ঘোড়া পাব কোথায়? দশ জোড়ার মধ্যে সাত জোড়াই মুখে লাল ঝোল বেরিয়ে খকর খকর কাশছে আর থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে কীসের যেন শিরশিরিনিতে।

এরই মধ্যে ডবল কেরায়া দিয়ে অতি কষ্টে যাও-বা একটা জোগাড় করলাম, একটা দিনের পথ পার হবার পর পয়লা চটিতে এসেই সে মুখ থুবড়ে কাত হয়ে পড়ল।

কেরায়াদের সঙ্গে সে একজন নফর সহিস দিয়েছিল পথে ঘোড়ার তদারকি করে ঠিকানায় পৌঁছে দেবার পর আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

বকাবকি ধমক-ধামকের পর সে আসল কথাটা জানিয়ে দিলে। ঘোড়াটাকে কিছুদিন আগে ওই ছোঁয়াচে কাশ রোগে ধরেছিল। সবে সেটা একটু সেরে উঠতে-না-উঠতেই টাকার লোভ সামলাতে না পেরে কেরায়াদার ঘোড়াটাকে ভাড়ায় পাঠিয়েছে। সওয়ারি বইবে কি ঘোড়াটাকে এখন প্রাণে বাঁচান-ই দায়।

তা, সে লোভী কেরায়াদার তার নিজের দায় সামলাক। এখন আমার উপায় কী? মুকসুদাবাদে ফিরে যাব। ফিরে যাওয়াই সমস্যা। তা ছাড়া সেখানকার অবস্থা তো দেখেই এসেছি। সেখানে ফিরে গিয়ে হয়রানি আর সময় নষ্ট ছাড়া লাভ কিছু নেই।

এখন যেমন করে হোক সামনের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সেই এগিয়ে যাওয়ার একটি মাত্র যা ব্যবস্থা সম্ভব তাই হল। অর্থাৎ ব্যবস্থা হল সেই সনাতন গোযানের।

pathagar.net

ব্যবস্থাটা চটিদারই করে দিলে। সেই সঙ্গে ওকালতিও যা করল তা শোনবার মতো। বললে, 'ঘোড়া-ঘোড়া কী করেন, কর্তামশায়? জাত ঘোড়ার ছুট তো এক দমে ফুরোয়! আর এই বলদ জোড়া দেখছেন, সাক্ষাৎ ভোলা মহেশ্বরের সেই কৈলাসের ষাঁড়ের বংশ। আপনার ও ঘোড়ার চেয়ে তাগড়া চারটে ঘোড়া যতক্ষণে খুরের নাল ক্ষইয়ে মাঝপথে খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে পড়ে থাকবে, ততক্ষণে এই বলদ জোড়া আপনাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম—চারধাম ঘুরিয়ে আনবে।'

চটিদার বারফট্টাইয়ের বাড়াবাড়ি যাই করুক, একেবারে ডাহা মিথ্যে কিছু বলেনি। বলদ জোড়া যেমন তাগড়া তেমনই মেহনতি। দানাপানি ঠিক মতো পেলে দিনরাত গাড়ি টানতেও ঘাড় বাঁকায় না।

কিন্তু বলদ জোড়া তাগড়া হলে কী হবে, গাড়োয়ান একেবারে তেএঁটে ত্যাঁদড়। সকাল বিকেল ধরে চার বেলা হনহনিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে হঠাৎ এমন বেয়াড়াপনা করবে ভাবতেই পারিনি।

প্রায় অর্ধেক পথ তখন মেরে এনেছি। সামনে পথ গিয়েছে এক টাঁড় মানে নেড়া পাহাড়ি তেপান্তরের ওপর দিয়ে। এই পাহাড়ি ডাঙাটা দু বেলার মধ্যে পার হতে পারলে বর্ধমান পৌঁছনর আর কোনও ভাবনা থাকবে না।

পথ যেখানে পাহাড়ি ডাঙায় গিয়ে উঠেছে তারই কাছাকাছি এক চটিতে রাতটার জন্যে আস্তানা নিয়ে চটিদারের কাছেই এই খবরাখবর পাচ্ছিলাম।

কিন্তু খবরাখবর নেওয়া মিছেই হল। পরের দিন সকালে গাড়ি জুতে বেরিয়ে গাড়োয়ানকে ডাঙার পথ ছেড়ে অন্য পথ নিতে দেখে আমি অবাক।

'এ কোথায় যাচ্ছ গো, গাড়োয়ানের পো?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাঙার রাস্তা তো আমাদের সোজা সামনে।'

'আজ্ঞে ও পথে যাব নাই।' গাড়োয়ান সোজা তার সংকল্পটা জানালে।

'ও পথে যাবে না মানে?' আমি অতি কষ্টে মেজাজ সামলে বললাম, 'বর্ধমান যাবার ওটাই তো খাস রাস্তা। ও রাস্তা ছেড়ে এ তুমি চলেছ কোন রাস্তায়?'

'ঠিক পথেই চলেছি আজ্ঞে।' গাড়োয়ান নির্বিকার ভাবে জানালে, 'আপনি গাড়িতে উঠি বসেন না কেনে? পাঁচ দিনে আপনাকে বর্ধমান পৌঁছে দিব।'

'পাঁচ দিনে বর্ধমান পৌঁছে দেবে'। আমি রেগে আগুন হয়ে বলেছি, 'ডাঙা দিয়ে আড়াই দিনের পথ ছেড়ে আমি পাঁচ দিনের পথে যাব কেন? না, ঘোরাও আমার গাড়ি। ওই ডাঙার পথেই আমরা যাব।'

'তবে আমাকে মাপ করবেন কর্তা।' গাড়োয়ান সোজা আমার মুখের ওপর বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার কারণটা একটু ব্যাখ্যা করে জানিয়েছে যে বিশ পঞ্চাশ বছর ধরে ও রাস্তায় কেউ যায় না।

'কেন? যায় না কেন?' ভেতরের রাগটা চেপে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কী আছে ও রাস্তায়?'

pathagar.net

pathagar.net

কী আছে ও রাস্তায় তা গাড়োয়ান বলতে পারেনি, কিন্তু সে শুধু সাফ জানিয়ে দিল যে ও রাস্তায় গেলে কেউ আর ফেরে না বলেই—সবাই জানে।

পাঁচ দিনের ঘুর পথের বদলে ও ডাঙার পথে আড়াই দিনে গেলে ভাড়ার লোক ন হয়। গাড়োয়ানের ডাঙার পথে যেতে আপত্তির সেইটেই হয়তো কারণ ভেবে তাকে সে লোকসান পুষিয়ে দেওয়ার চেয়েই বেশি বকশিশের আশ্বাস দিয়েছি। কিন্তু গাড়োয়ানের সেই এক কথা—'যে পথে গেলে কেউ ফেরে না হাজার টাকার লোভেও সে পথে সে গাড়ি চালাবে না।'

কোনও রকমে তাকে রাজি করাতে না পেরে শেষে জেদ ধরে একাই ওপথে যাব বলে ঠিক করেছি। গাড়োয়ানকে বলেছি ঘুরপথেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙার পথ যেখানে মিলেছে সেখানে গিয়ে আমার খোঁজ করতে। ডাঙার পথে গোলমাল যদি কিছু না থাকে তা হলে তার আগেই সেখানে আমি পৌঁছে তারই অপেক্ষায় থাকব। আর তা যদি না থাকি তা হলে আরও তিন দিন আমার অপেক্ষায় থেকে সে যেন ওপথে গেলে কেউ যে আর ফেরে না তারই প্রমাণ হিসেবে আমাকে বাতিলের দলে ফেলে আমার মালপত্র সমেত তার গাড়ি নিয়ে সোজা মুকসুদাবাদে ফিরে যায়। নেই-নেই করেও আমার মোটঘোটে সে যা পাবে তাতে বাকি জীবনটা গাড়োয়ানি করে আর তাকে চালাতে হবে না।

প্রস্তাবটা লোভনীয় হলেও বেশ খানিকক্ষণ গাঁই-গুঁই করতে ছাড়েনি।

গাড়োয়ানি তার সাত পুরুষের পেশা। হঠাৎ গাড়োয়ানি ছেড়ে নিষ্কর্মা হয়ে বসার তার কোনও লোভ নেই। তা ছাড়া আমার মালপত্র বিক্রি করবে সে কোথায়? করলে চুরির দায়ে ধরা পড়বে না কোতোয়ালিতে? চুরির চেয়ে আরও বড় দায়েই যে পড়বে না তা কে বলতে পারে? সওয়ারিকে গুম করে মালপত্র নিয়ে সে ভেগে এসেছে এমন কথাই বা লোকে ভাববে না কেন? না, অতসব ফ্যাসাদের মধ্যে সে যেতে পারবে না।

তার চেয়ে কর্তামশাই তার কেরায়া চুকিয়ে দিন। সে তাঁর মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে মুকসুদাবাদেই ফিরে যাবে।

গাড়োয়ানের বাঁকা ঘাড় সোজা করতে নগদ বেশ কিছু তাকে দিতে হল। মালপত্রগুলা তো তার কাছে রইলই, সারা পথের ভাড়াটাও আগাম তাকে দিয়েছিলাম। এখন তার ধম্মোজ্ঞানের ওপর ভরসা।

ক-দিনের হাঁটাপথে নেহাত যা না নিলে নয় তেমনই ক-টা জিনিসের একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে গাড়োয়ানকে ঘুরপথে রওনা করে দিলাম। তারপর ফিরে গেলাম এর আগে পথে যা ফেলে এসেছি সেই চটিতে।

চটিদার তো আমায় একা একা ঝোলা কাঁধে পায়ে হেঁটে ফিরে আসতে দেখে রীতিমতো সন্ত্রস্ত!

'কী হল কর্তা?' চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'গাড়োয়ান

pathagar.net

শয়তানটা লুঠপাট করে পালাল নাকি? জখম-টখম করতে পারেনি বলে তো মনে হচ্ছে।'

'না, তা পরেনি।' চটিদারের কথা থেকেই আমার এভাবে ফিরে আসার একটা কৈফিয়ত খাড়া করবার মশলা পেয়ে সেইটেই কাজে লাগিয়ে বললাম, 'পথে যেতে যেতেই ওর মতলবটা আঁচ করে ফেলে এক জায়গায় সুবিধে পেয়ে, যা কিছু পারি, এই ঝোলায় পুরে চুপিসারে নেমে পালিয়ে এসেছি।'

ভাল বা মন্দ যেমন মতলবেই হোক মিথ্যে কথার অনেক জ্বালা। এক মিথ্যে সামলাতে দশটা মিথ্যের জাল বুনে যেতে হয়।

আমারও হল তাই। চুপিসারে নিজের কেয়ারা করা গোরুর গাড়ি থেকে যা কিছু পারি সরিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি শুনে চটিদার আমার বুদ্ধির সঙ্গে বরাত জোরেরও তারিফ করে বলল, 'খুব বেঁচে গেছেন, কর্তা। বুদ্ধি করে পালিয়ে যে এসেছেন, এ আপনার বাহাদুরি। কিন্তু বরাত জোর না থাকলে ও বুদ্ধি কোনও কাজে লাগত না। লুঠপাটের জন্যে যাকে ওরা বাছে, জানেও তাকে তারা মারে। সাক্ষী যাতে কোথাও কেউ না থাকে। তা আপনি ওদের মতলব আগে থাকতে বুঝলেন কী করে, আর জানলেনই বা কী ফিকিরে? ওরা তো ঘুণাক্ষরে মতলব বুঝতে দেবার বান্দা নয়। ওদের তাক করা সওয়ারিকে ওরা যেন গুরু ঠাকুরের মতো করে নিয়ে যায়। কত আদিখ্যেতাই না করে তাঁকে নিয়ে। —না, না এখানকার জল খাবেন কী কর্তা! এখানকার সব অশুদ্ধ!—অশুদ্ধ! সে আবার কী? আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে একবার।—

তারা তাতে বলবে, জানেন না বুঝি? এ-গাঁয়ের মশাই যে প্রাচিত্তির করেননি এখনও। আপনাকে এবার আর কিছু বলতে হবে না। কীসের প্রাচিত্তির, কেন প্রাচিত্তির তারা নিজেই জানিয়ে দেবে। বলবে—সেই বানভাসির বছরে জমিদারের গোয়ালে বকনা বাছুরটা গলায় ফাঁস লেগে মরেছিল না, তা জমিদারেরই গোয়াল যখন তখন গো-বধের পাপটা তারই ওপর বর্তাবে না? কিন্তু এত বড় পাপের তিনি প্রাচিত্তির করলেন না কিছুতেই। বললেন—বকনাটা গলায় ফাঁস লেগে আবার মরল কোথায়? মাঠঘাট জ্বালানো খরার ঘাসগুলোয় পেটের জ্বালায় আঁদাড়ে পাঁদাড়ে আগাছা কুগাছা খেয়ে মুখ গলা থেকে পেটের নাড়ি পর্যন্ত বিষিয়ে উঠে মরেছে। এ বকনার প্রাচিত্তির করতে হয় তো যাদের পাপে এই দেশ জ্বালানো খরা সেই সারা গাঁয়ের লোক করুক। এমনই আজেবাজে গল্প শোনাতে শোনাতে তারা সে গাঁ কখন পার হয়ে যাবে আপনি খেয়ালও করতে পারবেন না। তা বলে তেষ্টায় কি আপনাকে তারা ছাতি ফাটা করে মারবে? না, তা মারবে না। সে দিকে তাদের টনটনে ধম্মোজ্ঞান। আপনাকে গাড়ির মধ্যে কোথাও এক বট-অশত্থের ছায়ে বসিয়ে রেখে ওদের কলসি নিয়ে দূর কোন গাঁয়ে যাবে জল আনতে। সে জল এনে আপনাকে খেতে তো দেবে আশ মিটিয়ে। কিন্তু সেই জল খাওয়ার পর থেকেই লাগবে আপনার ঘুমঘোর। সে ঘুমঘোরের মধ্যেই আপনার

কাবার হয়ে যাবার কথা। নেহাত যদি তা না হন তো দেখবেন কোথায় কোন জংলা বাদাড়ে কি ভাগাড়ে পড়ে আছেন শেয়াল শকুনের জন্যে প্রায় তৈরি লাশ হয়ে। যাক আপনার খুব ভাগ্যি যে, সময় মতো বুদ্ধিটা আপনার খুলেছে বলে এমন করে পালিয়ে আসতে পেরেছেন, এখন আর ভাবনা নেই। একটা ব্যবস্থা আমি করছি।'

চটিদার ব্যবস্থা যা করে তা মন্দের ভাল। মাল বলতে কিছুই আমার নেই। তবু তাও সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য হাবা-গোবা গোছের একটা আধবুড়ো চাষিকে সঙ্গে দেয়। মাল বওয়ার চেয়ে পাহাড়ি পাথুরে ডাঙা পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে পথটা সে চিনিয়ে নিয়ে যাবে তাকে নেওয়ার এই সুবিধে।

চটিদারের কথায় তাকে সঙ্গে নিলেও তার চেনানো পথটায় একটা রাত ডাঙার ওপর কাটাবার পরই ছেড়ে দিতে হল।

একটা বিরাট অশত্থ গাছের তলায় কাঠকুটো জড়ো-করা একটা ধুনি জ্বালিয়ে রেখে রাতটা সেখানে কাটিয়েছিলাম। সকালে উঠে তৈরি হয়ে সোজা দক্ষিণমুখো পথে রওনা হতে যাব—আমার তল্পি বওয়া আর পথ চেনাবার গোঁসাই হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না না, কর্তা, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়!'

'কেন রে গবা? ওদিকে নয় কেন, ওদিকে নয়তো, যাব কোন দিক দিয়ে।'

আমার পথ চেনাবার মাতব্বর গোবিন্দ মানে গবা পথ যা এবার দেখাল তাতে আমি তাজ্জব। সামনে সোজা রাস্তা ছেড়ে সে ঘুরিয়ে নাক দেখবার মতো সে প্রায় উল্টো পথ দেখালে।

'কেন?' তাকে ধমক দিয়ে বললাম, 'ডাঙার ওপর দিয়ে এই সোজা রাস্তা থাকতে অমন ঘুর পথে যেতে যাব কেন?'

'আজ্ঞে!' গবা ওরফে গোবিন্দ আতঙ্ক মেশান গলায় জানালে, 'ওদিকে গেলে যে আর ফিরতি পারবেন না। কেউ ফেরে না।'

'ফেরে না তো হয়েছে কী?' বিরক্তির সঙ্গে ধমক দিলাম, 'আমি কি ফিরতে যাচ্ছি। আমি তো ওদিক দিয়ে এ ডাঙা পার হতে যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে, পার হতেও পারবেন কি?' গোবিন্দ ধমক অগ্রাহ্য করে বলল, 'ওদিক দিয়ে কেউ পারও হতে পারে না, পারে না ফিরেও আসতে। ওদিকে যে সিংহিদের হানাগড়।'

'সিংহিদের হানাগড়!' চমকে ওঠার সঙ্গে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠে বললাম, "সিংহিদের হানাগড়! সে আবার কী।'

'আজ্ঞে, সে বড় বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার', গবা ওরফে গোবিন্দ বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'পেল্লায় পেল্লায় সে দালানকোঠা দেউল কবে থেকে ভেঙেচুরে পড়ে আছে কেউ জানে না। ওদিকে পানে যে যায় তাকে আর ফিরতে দেয় না। মাটির নীচের কোন পাতালে তলিয়ে দেয়।'

'পাতালে তলিয়ে দেয়, ফিরতে দেয় না বলছ, তবে এ সব কথা লোকে জানল কী করে!' অধীর আগ্রহটা চেপে বিরক্তি দেখিয়ে বললাম।

pathagar.net

'আজ্ঞে!' গোবিন্দ ব্যাখ্যা করে জানালে, 'ওই একজন কেমন করে পাইলে এসেছিল যে! মুখে রা ছিল না। পরমায়ুও গিয়েছিল ফুরিয়ে। মরবার আগে শুধু গোঁ গোঁ করতে করতে আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখাত আর বলার চেষ্টা করত না-না-না।'

আর সময় নষ্ট না করে সোজা দক্ষিণে সেই সিংহিদের হানাগড়ের পথই যে ধরেছি এবার তা আর কাউকে বোধহয় বলতে হবে না।

কাঁদো কাঁদো মুখে 'না-না-না' বলে আর শেষ পর্যন্ত হাত ধরেও টানাটানি করে গোবিন্দ যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। কিছুতেই না পেরে আমায় ছেড়ে যাবার হুমকি দিয়েও ফিরে চলে যেতে কিন্তু পারেনি। তাকে যেন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছি এমনই ভাবে তারপর পিছু পিছু এসেছে।

তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে সত্যিই আমি চাইনি। সারাটা পথ যাবার জন্যে মজুরি যা দেব বলেছিলাম তার পুরোটাই চুকিয়ে দিয়ে তাকে ফিরে যেতেও বলেছিলাম। কিন্তু সে তাও যায়নি। পুরো মজুরি হাতে পেয়েও ফিরে না গিয়ে একটু দূরে দূরে থেকে পিছু পিছু এসেছে।

খুব বেশি দূর যেতে হয়নি।

একটা রাত্তির পথে সুবিধে মতো একটা পাকুড় গাছ দেখে তার তলায় কাটিয়ে সকালে আবার রওনা হয়ে এক বেলা হাঁটবার পরই দুপুর নাগাদ দূর থেকে একটা উঁচুটিলা আর কাছাকাছি ছড়ান ভেঙেপড়া সব দালান কোঠার চিহ্ন দেখা গেছে।

গড় হলেও জায়গাটায় সে গড়কে ঘিরে লোকজনের বসতির কিছু দালান-কোঠাও ছিল বোঝা যাচ্ছে। সে সবই এখন ভাঙা ইঁট পাথরের জঞ্জাল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। খাড়া থাকবার মধ্যে একটা-দুটো থাম আর দেওয়ালের অংশ আর প্রায় পড়পড় একটা পালিশ পলস্তাবা তো বটেই, গায়ের চুনবালিও ঝরে-যাওয়া, মিনারের মাথা খসে-পড়া কঙ্কাল পুরনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরনো বলতে খুব বেশি কালের পুরনো নয় বলেই মনে হল। শ দুই-তিন বছরের বেশি আগের বলে মনে হল না।

এ দু-তিনশো বছরেই যে জঙ্গল এখানে ছেয়ে যাবার কথা, নেহাত শুকনো নেড়া ডাঙা বলেই বোধহয় তা হতে পারেনি। শুধু দু-চারটে অশথ বটের চারা এ ধারে গজান ছাড়া একটা বুনো লতাকেই বিরাট অজগরের মতো অনেক ইঁট পাথরের স্তূপ জড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

একটু দূর থেকে ভগ্নস্তূপটা দেখছি। হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে চমকে উঠলাম। এখানে অমন ঘণ্টা বাজায় কে?

কোনও কোনও মন্দিরের দরজার ওপরে যেমন টাঙান থাকে সেই রকম ঘণ্টা। তবে সে ঘণ্টা যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে পূজারিদের যেতে আসতে টেনে বাজাবার জন্য—এখানে সেরকম কিছু না দেখতে পেলেও আওয়াজটা সেইরকমই শুনছি।

pathagar.net

বেশ অবাক হয়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে অবাক হলাম আরও বেশি।

জায়গাটা একটা ভাঙা ধসে পড়া মন্দিরেরই চাতাল। সেখানে মন্দিরের একটি ধসে পড়া চুড়োর ওপর বসে হাড় পাঁজরা জিরজির করা একটা ছোট্ট মানুষ সামনে ঢাকা দেওয়া চুবড়ি নিয়ে ওই ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বলছে, 'আসুন, আসুন পান-তামাক খেয়ে যান, পান তামাক খেয়ে যান।'

এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! এখানে এই জন-মনিষ্যিহীন ধু ধু পাথুরে ডাঙায় কোন আদ্যিকালের এক পোড়ো গড়-বাড়ির ধ্বংসস্তূপে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে পথের পথিককে পান-তামাক খেতে ডাকছে—এ আবার কী রকম পাগল।

পাগল নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু।

এ ধু ধু পাথুরে ডাঙায় তেপান্তরে কে কখন আসছে যে অমন পান-তামাক খেতে ডেকে আপ্যায়ন করতে চাইছে সে? তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবার পর আসল ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না।

হাড়-চামড়া সার বামন গোছের লোকটা কোটরে ঢোকা যেন গো-সাপের মতো কুতকুতে চোখ দিয়ে আমায় খানিক দেখে খসখসে ভাঙা গলায় বললে, 'আসবে না কেন? শহরে যাবার এই তো সোজা রাস্তা।'

লোকটার গলা শুধু নয়, কথাগুলোর উচ্চারণও কেমন একটু বাঁকা। রাঢ়ের এ অঞ্চলের বুলি থেকেও কেমন একটু আলাদা। আলাদা হবার কারণও বোঝা গেল শেষ পর্যন্ত।

সদরে যাবার এইটে সোজা রাস্তা? একটু ভেংচি কাটা সুরে তার কথার জবাব দিয়ে এবার বললাম, 'সোজা রাস্তা তো বটেই, কিন্তু তবু কেউ যায় না কেন এ রাস্তায়?'

'কপালে লেখা থাকলে তো যাবে,' বলে প্রথমটা ফোঁস করে উঠেই বামনটা তারপর জোর করে যেন গলাটার ঝাঁঝ মুছে দিয়ে বললে, 'আর আসুক-না-আসুক, আমার কাজ আমি করি।'

যা আঁচ এর মধ্যেই করে ফেলেছি সেটাকে ঝালিয়ে নেবার জন্যে আমি আগের টিটকিরির সুরেই বললাম, 'তোমার কাজ তুমি করো। তা কই তোমার পান আর কোথায় তোমার তামাক? ওই শুকনো ক-টা শালপাতা আর ওই মেঝেয় গড়াগড়ি দেওয়া ভাঙা থোলো হুঁকোটা?'

'শুকনো শালপাতা আর ভাঙা থোলো হুকো!' বামনটা রেগে না উঠে তার বদলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললে, 'আমার হাতে কী এগুলো? আর ওখানে ভাঙা থামটার ধারে কী ওটা?'

তাজ্জব ব্যাপার! বামনটার হাতে এক গোছা টাটকা পান। যেন সবে জল থেকে তুলে সাজা হয়েছে এমনই জল পড়ছে সে গোছা থেকে। আর কাছেই ভাঙা থামটার ধারে ভাঙা থোলো হুঁকোর জায়গায় নলের উপর রূপোলি জরির প্যাঁচ দেওয়া

pathagar.net

গড়গড়া। বাহারি গড়গড়ার মাথায় বসান কলকেটা থেকে ভুর ভুর করে অম্বুরি তামাকের গন্ধ বাতাসকে মিঠে করে তুলছে।

যা বোঝবার সবই বুঝে নিয়েও চিমটি-কাটা সুরটা না ছেড়ে বললাম, 'তা এমন খাতির তোয়াজের ব্যবস্থা সত্ত্বেও কপালের জোর নেই বলে এ পথে তেমন কেউ যে আসে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তা কপালের জোরের কথা যা বলছ সেটা আবার কী?'

'কী তা তো চোখ থাকলেই দেখতে পেতে এতক্ষণে,' বামনটা খ্যাক খ্যাক করে হেসেই বলল।

ততক্ষণে আমি দেখতেও পেয়েছি যা দেখার—দূরে ভাঙা ইঁটের দেওয়ালটার গায়ে সময়ের ছোঁয়ায় ময়লা কালচে হয়ে আসা শ্বেত পাথরের ভাঙা দুটো ফলকে অস্পষ্ট হয়ে এলেও এখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল বোঝাবার হেঁয়ালি ছড়াটা এখনও পড়া যায়। লেখার হরফগুলো বঙ্গ ভাষারই, তবে আমাদের এখনকার থেকে বেশ আলাদা।

লেখাটা পড়ে কিন্তু চমকে উঠেছি ভেতরে ভেতরে। শুধু মন্দির প্রতিষ্ঠার সাল তারিখ বোঝাবার মতো খোদাই করা ফলক তো এ নয়।

এ তো রীতিমতো গুপ্তধনের ইশারা। আর সে ইশারার আজ পর্যন্ত মর্মভেদ যে হয়নি পান তামুক খাওয়াবার লোভ দেখান হাড়-জিরজিরে বামন মানুষটাই তার প্রমাণ।

ভাঙা থামের ভাগাভাগি করা দুটো ফলকের লেখা তখন একটু কষ্টকর হলেও পড়ে ফেলেছি। কিন্তু দু ভাগ জুড়ে যা পড়ছি তাও তো পুরো শ্লোকটা নয়।

একটা আরম্ভ যা পাচ্ছি তা এই—

'যোগ করে যা পাও
গুণে পা বাড়াও

পুবে গেলেই সোজা
সাঙ্গ হবে খোঁজা।'

প্রথম ভাঙা ফলকের লেখা এইখানেই শেষ। তার পরের লেখাটা পাচ্ছি দ্বিতীয় ফলকে। সেটা হল—

'সেথায় স্বপ্নধাম
পুরায় মনস্কাম।

একটি শুধু শর্ত
কুবের হতে চাইলে
ছাড়তে হবে মর্ত্য।'

pathagar.net

কিন্তু দু ভাগ মিলিয়েও এই অসম্পূর্ণ ছড়া গোড়াতে আরও ক-টা কথা না হলে যা পেয়েছি তার কোনও মানেই হয় না।

সে বাকি অংশটা পাব কোথায়? সেগুলো না পেলে তো সমস্ত ব্যাপারটাই ফক্কিকার।

খুব কষ্ট করে নয়, এদিক ওদিক একটু চোখ বোলাতেই যা চাইছিলাম তা পেয়ে গেলাম। ইশারা দেওয়া শ্লোকটার প্রথম ক-টা ছত্র পেলাম আর কোথাও না, পান-তামুক খাওয়াতে চাওয়া হাড়-জিরজিরে বামনটা যার ওপর বসে আছে মন্দিরের সেই ভাঙা চুড়োটার গায়ে। শ্বেতপাথরের ভাঙা ফলকের সেইটেই মাথার দিক।

তাতে পেলাম—

'বসু মেলেন পক্ষ।
দুই চন্দ্রে এবার
যমজ হেন সখ্য।'

সমস্ত শ্লোকটা! এবার তাহলে দাঁড়াল—

'বসু মেলেন পক্ষ।
দুই চন্দ্রে এবার
যমজ হেন সখ্য।

যোগ করে যা পাও
গুণে পা বাড়াও।

পুবে গেলেই সোজা
সাঙ্গ হবে খোঁজা।

সেথায় স্বপ্নধাম
পুরায় মনস্কাম।

একটি শুধু শর্ত
কুবের হতে চাইলে
ছাড়তে হবে মর্ত্য।'

এ শ্লোকে ইশারা যা পেলাম তা তো ভেদ করা খুব শক্ত নয় মনে হল, তা সত্ত্বেও এখনও কেউ তা করতে পারেনি কেন? পারলে ওই হাড়-জিরজিরে বামন যুগ যুগ ধরে এখানে হাপিত্যেশ করে বসে আছে কেন?

ঘুরিয়ে সেই কথাটাই জানতে চাইলাম। বললাম, 'তা, কপালের জোর এতকালে কারওই হয়নি দেখছি। এ রাস্তা কেউ মাড়ায়ই নি এমন একটি শাঁসাল টোপ সত্ত্বেও।'

'মাড়াবে না কেন?' বামনটা আবার ফোঁস করে উঠে বলেছে, 'শুধু কপালের জোর থাকলেই তো হয় না, তার সঙ্গে মাথায় কিছু ঘিলুও থাকা চাই।'

BanglaBook.org

'তার মানে?' ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বলেছি, 'ও ধাঁধার শ্লোকের আসল ইশারা যদি কেউ বুঝতে পারে। তা কতজন অমন বরাত জোরে এখানে এসেও হার মেনেছে আসল কাজের বেলা? কত কাল ধরে এখানে পথ চেয়ে বসে আছ?'

'যতদিনই থাকি না,' আবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছে বামনটা, 'কেউ যে পারেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'তা দেখতে পাচ্ছি যেন এবার,' এবার তাকে জ্বালাবার জন্য একটু হেসে বলেছি, 'তেমনই ভাবছি, কেউ আসুক-না-আসুক, কাজ হাসিল করতে পারুক-না-পারুক—তাতে তোমার কী?'

'আমার কী? আমার কী?' বামনটা খেঁকিয়ে উঠেছে, 'আমার হল ভাগ। যা পাবে তার সিকি ভাগ।'

'সিকি ভাগ!' আমি হেসে উঠেছি। 'মাত্র সিকি ভাগ কেন? পুরোই তুমি নাও-না। কিন্তু নেবে কোথায়? তোমার ওই মিথ্যে ছায়া দিয়ে ফোটান হাওয়ার ফাঁকির হাতে! নিয়ে করবেই বা কী? যক্ষি হয়ে আগলে রাখবে?'

'তাই রাখব, তাই রাখব। রাখব আমার নাড়ির সম্পর্কের কোনও কুলের কেউ যদি কখনও আসে তার জন্যে।' এবার গলগল করে বামনের পেটের সব কথা বেরিয়ে এল।

অনেক অনেক আগে, কত কাল তার হিসেব নেই। এ পথ দিয়ে সে মানে নরহরি—হ্যাঁ, তার নাম ছিল নরহরি হাজরা। তাদের গাঁ-গঞ্জের একটা দলের সঙ্গে জগন্নাথ ধাম যাচ্ছিল তীর্থ করতে। সিংহিদের এই গড় তখনই খাঁ খাঁ করছে—মানুষজন সব বেশ কিছুকাল সে জায়গা ছেড়ে গেছে বলে। জায়গাটার নাম ছিল তখন সিংহিদের দেউলগড়। নরহরির দলের লোকেরা কাছাকাছি এক জায়গায় রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করেছিল। দলের মধ্য থেকে একা নরহরিই যা একটু ঘুরে দেখতে গিয়ে এসে পড়েছিল এই দেউলগড়ে। তখনও সিংহিদের গড়ের এখনকার মতো অবস্থা হয়নি। দালান কোঠা দেউল কিছু তখনও খাড়া ছিল। সেই রকম এক দেউলের দেখা পাবার পর নরহরির আর তীর্থে যাওয়া হয়নি। দলের লোক তাকে সামান্য খোঁজাখুঁজি করে তীর্থের পথেই রওনা হয়ে গেছে। নরহরি ইচ্ছে করেই তাদের দেখা দেয়নি।

দেখা দেবে কী। তখন সে মন্দিরের দেওয়ালের গায়ের শ্বেত পাথরের এই লেখা পড়ে ফেলেছে।

মন্দিরটা তখন ভেঙে চুরে গেলেও একেবারে ধসে পড়েনি। পুরো লেখাটা সে এক সঙ্গেই আস্ত ফলকটার ওপর পড়তে পেরেছিল। কিন্তু পড়লে কী হবে। ও ধাঁধার ছড়া থেকে আসল কাজ উদ্ধারের সঠিক হদিস সে বার করতেই পারেনি। বছরের পর বছর কেটেছে, দেখতে দেখতে একটু একটু করে মন্দির ধসে পড়ছে। সিংহিদের দেউলগড় শুধু হানাগড় হয়ে উঠেছে। একদিন তারও দুনিয়ার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু পরমায়ু শেষ হয়ে গেলেও সে এ জায়গা ছাড়েনি। যক্ষের মতো আগলে বসে আছে এই

জায়গাটা! কে আসবে, কে এসে ভেদ করবে এখানকার গুপ্তধনের রহস্য? কে উদ্ধার করে আনবে এখানকার কুবেরের ঐশ্বর্য? বছরের পর বছর কেটেছে, যুগের পর যুগ। দশ বিশ বছরে কেউ কখনও আসেনি এমন নয়। যে এসেছে তাকে একেবারে মাথার মণি করে তার সব সুবিধে করে দিয়েছে নরহরি। বাজি মাত করুক সে। কুবেরের ঐশ্বর্য যা আছে এখানে লুকনো তার সিকি ভাগ নরহরি রাখবে শুধু তার বংশের কেউ যদি কোনও দিন আসে তার জন্য। যত কালই কাটুক, যত অচেনাই হোক, তাদের নিজেদের বংশের কেউ এলে নরহরি ঠিক সাড়া পাবে তার এই ছায়া-শরীরেই।

কিন্তু সাড়া পাবে কোথা থেকে। যে কেউ এসেছে তাকে সে মাথার মণির মতো তোয়াজ করছে। সবাই সমান নিরেট। গোড়ায় গোড়ায় একটু আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত সবাই যা পেয়েছে তা লবডঙ্কা! নরহরি তাই একটু একটু করে খেপে গিয়েছে এখন। না, যদি কেউ আসে তাকে খাতির তোয়াজের এখনও কোনও ত্রুটি নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কাজ না হাসিল করতে পারে তো তার আর ছাড়ানছোড়ন নেই। ফিরে যাওয়া তার আর হবে না।

নরহরির আত্মকথা শুনতে শুনতে ভয় যে একটু হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল নেহাত গবেট না হলেও সত্যি সত্যি ভয়ের কিছুই নেই।

ভয়ের কী যে আছে তা টের পেতে দেরি হল না। গুপ্তধনের রহস্যভেদটা যে জানে তার কাছে সোজাই মনে করেছিলাম। সোজা না মনে করবার কোনও কারণও ছিল না। সেকেলে পুঁথিপত্র দালান দেউল বাড়ি ঘরের শুরু, শেষ আর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তারিখ জানাবার যে ঘোরাল কায়দা ছিল তার রহস্য আমার জানা। তাই অনায়াসে ধাঁধার ছড়া থেকে গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যাব ধরে নিয়েছিলাম।

শুরুতে গোলমাল কিছু হয়নি। এসব শ্লোকে তারিখ বার করবার ব্যবস্থা 'অঙ্কস্য বামাগতি' এই নিয়ম ধরে হয়।

সেই নিয়ম অনুসারে আমার পাওয়া শ্লোকটা এইরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে—

শ্লোকের প্রথম চরণ হল—'বসু মেলেন পক্ষ'—বসু মানে আট। সেই আট সর্বপ্রথম বসিয়ে তারপর ধাঁধার 'বসু মেলেন পক্ষ'-এর পক্ষ বলতে যা বোঝায় সেই 'দুই-এ পক্ষে'র—দুই বসাতে হবে। তার বাঁয়ে বসাবার জন্য এবার নির্দেশ পাচ্ছি 'দুই চন্দ্রে যমজ হেন সখ্য' ছত্র থেকে। 'একে চন্দ্র' থেকে চন্দ্র হল এক আর দুই চন্দ্রে যমজ হেন সখ্য চন্দ্রের একই বার বার দু বার। অর্থাৎ সবসুদ্ধু আমরা পেলাম, ১১২৮ এই তারিখটি।

এর পরের হুকুম হল—'যোগ করে যা পাও, গুণে পা বাড়াও। পুকে গেলেই সোজা সাঙ্গ হবে খোঁজা। সেথায় স্বপ্নধাম পুরায় মনস্কাম।'

এ নির্দেশ ধরে চলবার কোনও হাঙ্গামাই নেই। 'যোগ করে যা পাও, গুণে পা বাড়াও' মেনে ১১২৮ যোগ করে ১২ পাচ্ছি। অর্থাৎ যেখানে দেওয়ালের ফলকের

pathagar.net

লেখা সেখানে থেকে বারো পা যেতে হবে। কোন দিকে যেতে হবে পরের দু ছত্রে বলা আছে— 'পূবে গেলেই সোজা সাঙ্গ হবে খোঁজা। সেথায় স্বপ্নধাম পুরায় মনস্কাম।' অর্থাৎ পুবে বারো পা গেলেই যা চাও তা পেয়ে যাবে।

কিন্তু কোথায়! শ্লোকটার ঠিক মতো ব্যাখ্যা বার করে ফলক সমেত যে দেওয়ালটা খাড়া ছিল তা থেকে বারো পা পুবে এগিয়ে গেলুম।

কিন্তু এ কী কাণ্ড! এখানে যে এদিক ওদিক বড় বড় সব গভীর গর্ত। গর্তগুলো যে আপনা থেকে হয়নি, মানুষই যে তা খুঁড়েছে, তাও বোঝা যায়। সেগুলোই আছে, কিন্তু গুপ্তধন কোথা! গুপ্তধন পাবার বৃথা আশায় যে গর্তগুলো খোঁড়া হয়েছে তা বুঝতে তখন আর বাকি নেই।

সেই সঙ্গে বুকের ভেতরটাও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

এখানে এসে সব চেষ্টা করার পরও গুপ্তধন বার করতে না পারলে নরহরি যে কী করবে তার আভাস সে তো দিয়েই দিয়েছে। এরপর কোনও চেষ্টা আর কি করা সম্ভব? যা সম্ভব সবই তো করেছি। শুধু আমিই নয়, আমার মতো আরও বহুজনই নিজেদের মরণ গহ্বর খুঁড়ে তার প্রমাণ রেখে গেছে।

আর কিছু তো সত্যিই করবার নেই।

নেই? হঠাৎ মাথার ভেতর একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। উপায় কি সত্যিই আর নেই?

না, না, আছে, আছে। নিশ্চিত ভাবেই আছে। শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে নরহরিকে দরকার মাফিক ধোঁকা দিতে হবে।

তা পারব কি? না পারবার কিছু নেই। নরহরিটার মাথাটা বেশ নিরেট। যুগ যুগ ধরে গুপ্তধনের ধ্যান করে আরও তা হয়ে গেছে।

তাকে বললাম, 'শোনো, নরহরি। এ বড় কঠিন ধাঁধা। ও ছড়ার মধ্যে যে অঙ্ক স্বয়ং শুভঙ্করও তা কতদিনে কষে বার করত তা বলতে পারি না। সুতরাং চটপট ভুল অঙ্ক কষে আমি আর এখানকার গর্ত বাড়াব না। আমি ধাঁধার ছড়াটা মুখস্থ করে নিয়ে দেশে যাচ্ছি। সেখানে দেশ-বিদেশের এখনকার শুভঙ্করদের দিয়ে অঙ্কটা কষিয়ে তার ফল জেনে এসে চক্ষের নিমেষে গুপ্তধন উদ্ধার করে ফেলব। তুমি দেখলে যে এখনও কোনও চেষ্টাই আমি করিনি। তা সত্ত্বেও আমায় যদি সাজা দাও তো দিতে পারো। কিন্তু তা হলে যুগ যুগ ধরে তোমায় এখানে এই গর্তগুলোই গুণে গুণে কাটাতে হবে। তোমার বংশের কেউ এলেও তাকে কিছুই পারবে না দিতে।'

নরহরি এরপর অঙ্ক কষিয়ে আনার বাক্যে আমায় যেতে দিতে আপত্তি করেনি।

যাবার সময় তাকে শুধু বলেছিলাম, 'যদি অনুমতি দাও, আমায় দিনরাত দায়টা মনে করিয়ে দেবার জন্য এখানকার একটা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

নরহরি আমার সঙ্গে দেবার মতো কিছু খুঁজতে এদিক ওদিক চেয়েছি। আমি হঠাৎ খুশি গলায় বলে উঠেছি, 'পেয়েছি, পেয়েছি। ঠিক মালটাই পেয়ে গেছি। তুমি যেটার

ওপর বসে পান-তামুক খাবার জন্য ডাক—মন্দিরের সেই ভাঙা চুড়োটা—ওতেই আমার চলবে। এখানকার গুপ্তধন আর তোমার কথা দুইই ওটাতে মনে করিয়ে দেবে।'

এই সামান্য অনুরোধ রাখতে নরহরি আপত্তি করেনি। মন্দিরের ভাঙা চুড়োটা কাপড়ে জড়িয়ে গোবিন্দর কাঁধে চাপিয়ে চলে এসেছি সেখান থেকে।

বর্ধমানে পৌঁছে আমার গাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে বেইমান নয়। তাকে যা বলেছিলাম তার দশগুণ বকশিশ দিয়ে বিদেয় করেছি। বকশিশে একেবারে আহ্লাদে আটখানা করে দিয়েছি গোবিন্দকেও।

কেমন করে এমন দরাজ দিল দাতাকর্ণ হলাম? সব ওই মন্দিরের চুড়োর দৌলতে। ধাঁধার ছড়ায় তা বলাই ছিল। সিংহিদের গুপ্তধনের সন্ধানে হার মানা মক্কেলদের খোঁড়া গর্তগুলো দেখতে দেখতেই—ইশারাটা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম এক ঝটকায়।

ছড়াটার শেষ ক-টা লাইন হল—

'একটি শুধু শর্ত
কুবের হতে চাইলে
ছাড়তে হবে মর্ত্য।'

তার মানে কী হতে পারে!

তার মানে মাটির নীচে কোথাও নয়। গুপ্তধন লুকনো আছে মর্ত্য বাদ দিয়ে শূন্যে কোথাও। শূন্যে তো ছিল ওই মন্দিরের চূড়োটাই—তারই ভেতর মজবুত গাঁথুনির মণিমুক্তো হিরে-জহরত মোহর আসরফির বাটা ছিল গাঁথা।

নরহরি হাজরার নামে গয়ায় খুব ঘটা করে একটা পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করতে অবশ্য ভুলিনি।"

pathagar.net

"ভূত যদি রসিক হয়"

"...তা হলে তাঁকে চেনা দায়।"

ওপরের শিরোনামার সঙ্গে নীচের এই মন্তব্যটি যে কার লেখা, আর কোথায় বা পেয়েছি, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

হ্যাঁ, আমাদের এই শহরের সবচেয়ে লম্বা পাড়ির বাসরুট-এর একটি প্রায় খালি হয়ে আসা বাস-এ একটি বেঞ্চিতে, সম্পূর্ণ বেওয়ারিশ অবস্থায় পাওয়া লাল শালু বাঁধা পুঁটলির ছেঁড়াখোঁড়া খেরো খাতাটি থেকেই সম্পূর্ণ বাক্যটা উদ্ধার করা।

উক্তিটা সেই মেজকর্তারই, মহাভারত প্রমাণ পুরো খেরো খাতাটি ঘেঁটে ওই নামটুকুর বেশি আর যা পরিচয় তাঁর জোগাড় করতে পেরেছি, তা নেহাত আনুমানিক ছাড়া আর কিছু নয়।

মেজকর্তা লিখেছেন, "ভূত যদি রসিক হয় তা হলে তাঁকে চেনা দায়।"

এইটুকু লিখে মেজকর্তা যেন আর কিছু লিখবেন কি না, সে বিষয়ে দোনামনা হয়েছেন মনে হয়।

ওপরের কথাগুলো খেরো খাতার একটি পাতার একেবারে মাথাতেই লেখা। কিন্তু সে লেখা একটানা যে চালিয়ে যাওয়া হয়নি, লেখাটির কালি আর চেহারাতেই তা সহজে ধরা যায়।

কথা দুটো একটু কালচে কালিতে বেশ একটু মোটা গোছের নিব-এ লেখা। সে লেখার পরে কালোর বদলে কিছুটা নীলচে কালিতে একটু সরু গোছের নিব-এর কলমে যা লেখা হয়েছে, ওপরের অক্ষরগুলির তুলনায় তা অনেক কম ফ্যাকাশে। তা ছাড়া আগের লেখা বাক্যটি, যতদূর মনে হয়, বহুকাল আগে যার খুব চল ছিল সেই রিলিফ নিব-এ লেখা! আর পরের ঈষৎ নীলচে কালির বাকি সমস্ত লেখা সেকালের রেড়-ইংক কি জি-মার্কা নিব-এর কলমে।

লেখার ধরন-ধারণ চেহারা নিয়ে এ গোয়েন্দাগিরিতে আর কিছু না হোক, লেখাটা প্রথম শুরু করবার পরই মেজকর্তা যে বহুদিন তাতে আর হাত দেননি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

pathagar.net

ব্যাপারটা এমন কিছু হয়তো নয়, তবু এটা নিয়ে ভেবে কিছুটা সময় খরচ করেছি। শেষ পর্যন্ত একটা উত্তরই পেয়েছি ভেবেচিন্তে বিবরণটায় এমন কিছু হয়তো আছে, যার জন্যে লেখা আরম্ভ করেও মেজকর্তাকে দ্বিধা ভরে কলম থামিয়ে আর এগোবেন কি না ভাবতে হয়েছে।

একটা লাইন মাত্র লিখে যার জন্যে মেজকর্তাকে বেশ কিছু দিন হাত গুটিয়ে থাকতে হয়েছে, সে কারণটা কী হতে পারে?

কারণটা যাই হোক, সমস্ত লেখাটা না পড়ে তা আর বোঝা যাবে কী করে? সুতরাং মেজকর্তার বিবরণটাই তাঁর ভাষায় লিখে জানাচ্ছি।

প্রথম লাইনের পর একটু ফাঁক দিয়ে মেজকর্তা সরাসরি বিবরণে নেমে গেছেন।

* * *

"না, মুকুন্দরাম হয়তো খুব বাড়িয়ে বলেনি। জায়গাটার বর্ণনা অন্তত দিয়েছে চমৎকার। সমস্ত জায়গাটায় কেমন যেন একটা গন্ধ আছে। কিছুটা ভেতরের দিকে যাবার পরই তা নাকি পাওয়া যায়। বুঝিয়ে দেবার মতো বিশেষণ কি উপমা যার খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই গন্ধ!

মজা-হাজা, এঁদো-পচা, পানা ভরা সব ডোবা, পুকুর, দিঘি, আর ভেঙে-পড়া ধসে-পড়া, আধা-জঙ্গলে ঢাকা সব এধারে ওধারে নোনা ধরে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের স্তূপের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বিশাল বিশাল অশ্বত্থ, বট, শিরিষ গোছের সব গাছের ডালপালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ে চারিদিকের মাটি ছেয়ে জমে ওঠা পাতার রাশির সব মেলানো কেমন যেন একটা ভিজে ভিজে ছোঁয়া লাগান গন্ধ সেটা নয়! তার সঙ্গে অস্বস্তি জাগান আর একটা কী যেন মিশে একেবারে আলাদা কিছু!

মুকুন্দরাম আর একটা কথাও ঠিক বলেছিল। বলেছিল, 'ঠিকানা খুবই ভাল পেয়েছি কর্তা। শুধু পৌঁছবারই বড় ঝামেলা।'

'ঝামেলা মানে?' একটু ধমক দিয়েই বলেছিলাম, 'তেনাদের ঠিকানায় বিনা ঝামেলায় পৌঁছতে চেয়েছি আমি?'

'আজ্ঞে না।' থতমত খেয়ে বলেছে মুকুন্দরাম, 'আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছিলাম — মানে জায়গাটা খুঁজে-পেতে বার করার বেশ একটু হ্যাঙ্গামা আছে। চিনিয়ে দেবার মতো কাউকে পাওয়া যায় না কি না!'

এবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, 'চিনিয়ে দেবার মতো লোক না-ই পাওয়া যাক, জায়গাটার নাম শুনলে, তার হদিস তো কেউ-না-কেউ দেবে?'

'আজ্ঞে সেই তো হয়েছে কুশকিল!' মুকুন্দরাম অপরাধীর মতো বলেছে, 'গুপীগঞ্জের হাট পর্যন্ত ঘোড়ার ডাকের সঙ্গে ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতেই যেতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে আসল ঠিকানায় যাবার কথাটিও উচ্চারণ করতে পারবেন না।'

pathagar.net

pathagar.net

'কেন?' এবার বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'নামটা গালাগাল নাকি?'

'আজ্ঞে না, তা নয়।' মুকুন্দরাম তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছে, 'নামটা বললে কেউ যে চমকে তাকাবে, কি বেয়াড়া কিছু বলবে, তা নয়। তার বদলে যেন শুনতেই পাবে না। তারপর না শোনার ভান করে সরে যাবে সেখান থেকে।'

ধৈর্য হারিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলতে হয়নি। মুকুন্দরাম নিজেই তাড়াতাড়ি আবার বলেছিল, 'নামটা শুনে অমন বোবা-কালা যে সেজে যায় তার কারণ, নামটাতেই ওদের ভয়। ও অঞ্চলের সকলের ধারণা, ওখানকার কথা পাঁচ কান করলে তেনাঁরা বেজার হন। তেনাদের কোপে পড়বার ভয়ে ওরা তাই নিজেদের জানা-শোনাদের মধ্যে ছাড়া ওখানকার নামটি পর্যন্ত করে না, শুনতেও চায় না! আর কারও মুখে—'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে।' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে এবার বলেছি, 'যা বললে তাতে তো বুঝছি আসল নামটা যে কী, তা তুমিও জানো না।'

'আজ্ঞে না, আমি ঠিকই জানি।' মুকুন্দরামের মুখে বিনীত গর্বের হাসিটা দেখবার মতো। নিজের বাহাদুরিটা একটু সবিস্তারে তারপর বলতে শুরু করেছে, 'ওখানে এক বাড়ির সঙ্গে দূর কুটুম্বিতার ছুতো ধরে বেশ ক-বার যাওয়া-আসা করে, ভাব জমিয়ে ফেলেছি। তারপর—'

'তারপর নামটা জেনে নিয়ে কেল্লা ফতে করেছ!' মুকুন্দরামের বাহাদুরির বৃত্তান্ত দু-চার কথায় শেষ হবে না বুঝে তাকে একটু নরম গলাতেই এবার থামিয়ে দিয়ে বলেছি, 'তা নামটা কী? আর, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেও কেমন করে সেখানে পৌঁছনো যায়, এবার বলো দেখি?'

'আজ্ঞে, নামের সঙ্গে জায়গাটার কোন মিলই পাবেন না।' মুকুন্দরামের গলায় ক্ষোভের সুর তখনও একটু পাওয়া গেছে। 'নামটা হলো সুখ সাগর।'

'সুখ সাগর!' একটু হেসে বলেছি, 'মিল না থাক, গরমিলের দিক দিয়ে নামটা হয়তো ঠিক। নাম সুখ সাগর, কিন্তু সেখানে সুখ তো নেই, সাগরও নিশ্চয়ই নয়।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' মুকুন্দরাম সায় দিয়ে বলেছে, 'সাগরের বদলে যা আছে তা মজা-হাজা ক-টা জলা আর দিঘি, দামে আর পানায় যা একরকম বুজেই গেছে। থাকার মধ্যে আছে এককালের পেল্লায় সব পোড়ো বাড়ি, যেন হা-হা করা হাড়পাঁজর।'

মুকুন্দরাম তার বর্ণনায়, উৎসাহে আগেকার ক্ষোভটা তখন প্রায় ভুলেই গেছে। তবু বাধ্য হয়ে আবার তাকে সাজিয়ে বলতে হয়েছে, 'আচ্ছা, ওসব যা বলছ, তা নিজের চোখেই দেখব। কিন্তু তা দেখবার জন্যে কারও কাছে কোনও হদিস না পেয়েও পৌঁছব কী করে, সেইটা আগে বাতলাও দেখি।'

'আজ্ঞে—' একটু আমতা আমতা করে দু বার মাথা চুলকে মুকুন্দরাম এবার বলেছে, 'কিছু যদি মনে না করেন তো আমি সঙ্গে করে আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে—'

pathagar.net

'তুমি নিয়ে যাবে!' ধমকে মুকুন্দরামকে বলার মাঝখানেই থামিয়ে বলেছি, 'আমি যে কাজে যাচ্ছি, তাতে দোসর কেউ থাকলে কাজ হয়?'

মুকুন্দরামকে তারপর আর বেশি বকাবকি করতে হয়নি। সে তার বেয়াদবির জন্যে মাপ চেয়ে, জায়গাটায় পৌঁছবার যথাসম্ভব হদিস জানিয়ে দিয়েছে।

হদিস অবশ্য বেশ অদ্ভুত এবং ভাসা ভাসা। জায়গাটার আসল নাম বলে যা জানা আছে, তা কাউকে বলবার নয়। বললে কোনও কাজই হবে না। যে শুনবে, সে না শোনার ভান করে সরে যাবে।

যে দিকে যাবার তার বদলে নাম করতে হবে তার উল্টো দিকের এক ঠিকানার।

বলবেনই বা কাকে? বলার জন্যে আছে শুধু এই ভাড়াটে ক-জন গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা। তারা দূর-দূরান্তর থেকে ব্যাপারীদের মাল নিয়ে হাটে আসে। আর হাট শেষ হলে, অন্য মাল নিয়ে ওই পারে—সেই দামোদরের নদ পেরিয়ে ভিন জেলার বড় গঞ্জে গিয়ে ওঠে। তাদের একটু সাধাসাধি করে বলতে হবে, যাবার পথে মাঝামাঝি এক জায়গায় যেন নামিয়ে দেয়।

এমন অনুরোধে তারা বেজার হবে না। আপত্তিও করবে না কিছু। শুধু হয়তো জানতে চাইবে, 'তা নামবেন কোথায়, কর্তা? এ পথের দু ধারে আগাগোড়া তো শুধু বন-বাদাড়, জঙ্গল।'

তখন বলতে হবে যে, নামবেন জোড়াগড় যাবার রাস্তায়।

জোড়াগড় যাবার রাস্তায় নামবেন শুনে তারা চমকে-টমকে উঠবে না। শুধু একটু সহানুভূতি দেখিয়েই বলবে, 'সে তো অনেক হাঁটতে হবে কর্তা। আর তাছাড়া রাস্তারও কি ঠিক ঠিক চেনার মতো হাল আছে? তার চেয়ে রসুলপুরের দিক দিয়ে যদি—'

গাড়োয়ানেরা আরও অনেকরকম খুঁত ধরে জোড়াগড় যাওয়ার বিষয়ে আরও অনেক সলা-পরামর্শ দেবে। কিন্তু গাড়িতে জায়গা দিতে আপত্তি করবে না।

কাক ভোরে রওনা হয়ে বিকেল নাগাদ জঙ্গলের মাঝখানে রাস্তার এক জায়গায় তারা সওয়ারিকে নামিয়ে দিয়ে বলবে, 'এই আপনার নামবার জায়গা, কর্তা। ডানদিকের এই ঘোর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আপনাকে জোড়াগড়ে যেতে হবে। নিজে কখনও যাইনি। তবে দশ বছর ধরে এ পথে আসতে-যেতে অনেক জনের কাছে শুনেছি, জোড়াগড়ে যেতে হলে এইখানে নামতে হয়। ওই যে দূরে ছোট একটা টিলা দেখছেন, ওইটেই তার চেন্নৎ। এখন ইচ্ছে করলে নামতে পারেন। আর নইলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন সেই দামোদর পর্যন্ত। আজ রাত্রেই এপারের নলগোলায়, কিংবা কাল ওপারের বীরগঞ্জে নামিয়ে দেব।'

এ সব সুপরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তখন কিন্তু নেমে যেতে হবে। গাড়োয়ানদের কাউকে বকশিশ দেবার নামটি কিন্তু করা চলবে না। তারা তাতে অপমান বোধ করবে। বলবে, 'আমরা কি সওয়ারি নিয়ে ভাড়া খাটবার গাড়োয়ান! আমাদের নিজেদের গাড়ি। আড়তদার কি ব্যাপারীর হুকুমেও নয়, নিজেদের খুশি মতো মাল

pathagar.net

বোঝাই করি, নিজেদের পছন্দ মতো ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্যে। তাতে যা হক্কের পাওনা, তার বেশি নেব কেন?'

'তুমি বড় কথা ফেনাও, মুকুন্দরাম।' মুকুন্দরামের কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছিল না বলে এতক্ষণ চুপ করে থাকলেও এবার তাকে ধমকে বলতে হয়েছে, 'এত ধানাই-পানাই করেও এখনও তো আসল কথায় পৌঁছলে না। গাড়োয়ান কী ভাববে আর কী বলবে এ সব ছেড়ে আসল খবরটা এবার দাও দেখি। জোড়াগড়ের নাম করে জঙ্গলের মাঝে রাস্তায় নেমে তারপর সুখ সাগরে পৌঁছব কী করে?'

মুকুন্দরাম এবার আর কথা ফেনায়নি। সোজাসুজি হদিস বাতলে দিয়েছে।

গোরুর গাড়ি থেকে জঙ্গলের মাঝখানের পথে নামবার পর একটু অপেক্ষা করতে হবে, গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করে কিছু দূরে জঙ্গলের বাঁকে চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত। তারপর ডাইনে টিলার দিকে নয়, যে পথে গাড়ি এসেছে, সেই পথেই পিছিয়ে যেতে হবে পো খানেক রাস্তা। অতটা গেলেই বাদুড়-ঝোলা গাছটা চোখে পড়বে। বিরাট ডালপালা ছড়ান গাছ। কী গাছ, তা বোঝার উপায় নেই। ডালপালা সমেত সারা গাছটায় গাদা গাদা বাদুড় ঝুলে আছে। সেই গাছটাই হলো নিশানা। তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখতে দেখতে সুখ সাগর পৌঁছতে দেরি হবে না।

মুকুন্দরাম যা বলেছিল, তাই করেছি। জোড়াগড়ে যাবার ছুতোয় গাড়োয়ানের কথায় যেখানে নেমেছি, গাড়িগুলো দূরে পথের বাঁকে চোখের আড়ালে না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে, তারপর পেছন দিকে চলতে শুরু করেছি। বাদুড়-ঝোলা গাছটা এবার খুঁজে বার করতে হবে। মুকুন্দরাম যা বর্ণনা দিয়েছে, তাতে গাছটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবার কথা নয়। ডালপালা ছড়ান প্রকাণ্ড একটা গাছ। ফল-ফুল-পাতা নয়, সারা গায়ে তার ছোটো বড় ও কালো কালো বাদুড়ের পুঁটলি ঝুলছে।

গাছটার কথা ভাবতেই ভেতরে ভেতরে কেমন একটু শিউরে যে উঠেছি, তা অস্বীকার করব না। দু ধারের ঘোর জঙ্গলের মাঝে একেবারে জনমনিষ্যিহীন রাস্তাটাও তার একটা কারণ নিশ্চয়ই। সন্ধ্যে হতে তখনও দেরি আছে, কিন্তু এরই মধ্যে কেমন একটা গা-ছমছমে ভাব যেন সমস্ত জায়গাটার ওপর জমে উঠেছে।

মুকুন্দরাম কি এইটাকেই 'যেন ওপারের গন্ধ পাওয়া' বলে বর্ণনা করেছিল? কিন্তু সে তো সেই সুখ সাগর পৌঁছবার পর পাওয়ার কথা! এখন থেকেই সে রকম কোনও অস্বস্তি হবে কেন?

রাস্তার ধারের জঙ্গলে বাদুড় ঝোলা গাছটা খোঁজবার জন্যে সজাগ চোখ রেখে যেতে যেতে মুকুন্দরামের বিষয়েই একটু না ভেবে পারিনি। আমি যা খুঁজে বেড়াই, তার সুলুক সন্ধান দেবার জন্যে অনেক দালালই আমার হয়ে কাজ করে। মুকুন্দরাম ঠিক তাদের দলে পড়ে না। দালাল হয়ে সে আমার কাছে আসেনি। দালাল হিসাবে কাজও করে না আমার। নেহাত আচমকাই দেখা হয়ে গেছে।

pathagar.net

কাজকর্ম তেমন ছিল না বলে মস্ত এক দিঘির এক পাড় জমা নিয়ে চার-টার ফেলে মাছ ধরতে বসেছিলাম। কিছুটা হাজা-মজা হলেও নামকরা মাছ শিকারের দিঘি। কিছু-না-হোক আধমনি দু-একটা রুই-কাতলা সেখানে নাকি ফাতনা ডোবাবেই। ফাতনা আমারও ডুবেছিল, কিন্তু কে যে ডুবিয়েছে, তা জানার ভাগ্য হয়নি। সকাল থেকে খাঁ-খাঁ রোদের দুপুর পেরিয়ে বিকেল পর্যন্ত তিন তিন বার ফাতনা ডোবানো অদেখা মাছের কাছে কান-মলা খেয়ে যখন বেগড়ানো মেজাজে ছিপটাই দুমড়ে ভাঙতে যাচ্ছি তখন পেছনে পাড়ের ধারে আধময়লা আটহাতি ধুতি আর ছেঁড়া ফতুয়া পরা ছোটোখাটো রোগাপট্‌কা আধবুড়ো একটি গাঁইয়া চেহারার মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। লোকটার পাড়ের ওপর উবু হয়ে বসে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, আমার অজানতে অনেকক্ষণ ধরেই সে আমার মাছ ধরার মিথ্যে হয়রানিটা লক্ষ করছে। নিজের বে-ইজ্জতের এ রকম একজন সাক্ষীকে দেখে মনটা যে খুশি হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। লোকটির একটা কথায় মেজাজটা আরও তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে ছিপটা নিয়ে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে মেজাজটা সামলে, হুইল ঘুরিয়ে সুতো গুটোতে দেখে লোকটি বলেছিল, 'উঠে পড়ে ভালই করেছেন, কর্তা। আজকের দিনটায় কিছু হবার নয়।'

গায়ে-পড়া এমন টিপ্পনির একটা চাবুকের মতো জবাব দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম, তারপর একটু রুক্ষ গলাতেই বলেছিলাম, 'আজ হবার নয় মানে?'

'আজ্ঞে—' লোকটি একটু ভয়ে ভয়ে যেন অপরাধীর মতো বলেছিল, 'আজ সেই ষাঁড়টার দিন কি না।'

'কার দিন?' গরম হওয়ার বদলে বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'আজ্ঞে, সেই ষাঁড়া পিরেতটার।' লোকটি আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে বলেছিল, 'সব জোড়া মাসের পেরথম মঙ্গলবার সারা দিঘিটায় সে ভর করে থাকে। একটা পুঁটি কি কুচো চিংড়িও এ দিঘি থেকে কারও এদিন তোলার সাধ্যি নেই। আজ সেই পেরথম মঙ্গলবার আপনি এখানে ছিপ ফেলেছেন কি না'

'থামো, থামো।' কিছুই বুঝতে না পারায় অধৈর্যে লোকটিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বলেছিলাম, 'কী সব আবোল তাবোল বলছ! তোমার ষাঁড়া পিরেত আবার কী বস্তু?'

লোকটির কাছে ব্যাপারটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবার শুনেছিলাম। এ দিঘি যাঁরা কাটিয়েছিলেন, তাঁরা এ অঞ্চলের রাজাই ছিলেন একরকম। সে রাজবংশের ভাগ্য যখন পড়ে এসেছে, তখন শ দুই-তিন বছর আগে সে রাজবংশের শেষ এক রাজা এ দিঘিতে মাছ ধরার নামে এক মহা অধর্ম করেছিলেন। যুদ্ধের ন্যায়নীতি না মানা, আর মানীর মান না রাখার অধর্ম।

রাজবংশের সুদিন তখন ফুরিয়ে এলেও এ দিঘি তখন টুইটুম্বুর জলে জমজমাট। মাছের ভারে ছিঁড়ে যাবার ভয়ে জেলেরা একেবারে সেরা সুতোর নতুন জাল ছাড়া এ

pathagar.net

জলে কিছু নামাতে চায় না। দিঘিতে মাছ যেমন এন্তার, তেমনই সে সব মাছের জেল্লা আর তেজ। এদের মধ্যে সবার সেরা দুটি ষাঁড়া রুই। লোকে যাদের নাম দিয়ে ছিল নন্দি-ভৃঙ্গি। নন্দি-ভৃঙ্গি মাছ নয়, গঙ্গাদেবীর বাহন মকর রাজেরই যেন দুই দামাল জ্ঞাতিকুটুম। কোনও জালে তাদের ধরা যায় না, যত বড় পাকা শিকারির হাতের যত মজবুত ছিপই হোক, তার টোপ-বঁড়শি-ফাতনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। দিঘির জলে যেন তাদের আর ধরে না। গাঙ কি সাগর হলে বুঝি তারা পাখনা নেড়ে সত্যিকার সুখ পায়। তবু চারা পোনা হয়ে যার জলে প্রথম কানকো কাঁপিয়েছে, সে দিঘির ওপর মায়াও তো আছে কিছু। জোড় ভেঙে ভৃঙ্গি কিন্তু একদিন সে মায়া কাটিয়ে যায়, অতি বৃষ্টির বান এসেছিল সে বছর—মাঠ-ঘাট, পুকুর-দিঘি সব ভাসিয়ে। সে বানের জলে গা ভাসিয়ে ভৃঙ্গি কোথায় যে গেছে, কে জানে! নন্দি কিন্তু দিঘি ছাড়েনি। সারা তল্লাটের গল্পকথা হয়ে সে ওই দিঘিতেই মনের সুখে চরে বেড়িয়েছে। কিন্তু গোল বাধাল পড়তি রাজবংশের বেয়াড়া এক রাজা। তার খেয়াল হল কেউ যাকে ধরতে পারেনি সেই নন্দিকেই সে ডাঙায় তুলে খাবি খাইয়ে মোক্ষম বাহাদুরি দেখাবে।

কিন্তু রাজার কেরামতি ওই মুখ-সাপটি অবধিই। নন্দিকে ডাঙায় তুলে খাবি খাওয়াবে কি, নন্দিই তাকে নিয়ে যেন তামাশা করে লোক হাসায়। কখনও ফাতনা না নাড়িয়ে তার টোপ খেয়ে যায় চুপিচুপি, কখনও বড়শিতে রামটান দিয়ে হুইলের সুতোই ফুরিয়ে দিয়েছে সারা দিঘিময় দাম আর বড় বড় পানার ঝাড়ে গিঁট লাগিয়ে লাগিয়ে চরকিপাকে ঘুরে ঘুরে!

বার বার হার মেনে মেনে তল্লাট সুদ্ধু লোকের চাপা হাসাহাসিতে শেষকালে খেপে উঠেছে পড়তি বংশের বেয়াড়া রাজা। যা কখনও কেউ করে না, সেই অধর্মই সে করেছে এবার। কোনও মতে নন্দিকে বাগ বানাতে না পেরে সে শেষপর্যন্ত বিষ ঢেলেছে দিঘির জলের এক ধার থেকে আর এক ধারে। আর এক পাড় থেকে আর এক পাড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাওয়া মাছের ঝাঁকের মধ্যে খাবি খেতে খেতে ভেসে ওঠা নন্দিকে দেখতে পেয়ে কলা গাছের ভাসান ভেলা থেকে তাকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

নন্দি গেছে, গেছে সে রাজবংশও। একটু-আধটু মজে এলেও, বিষ কাটিয়ে এ দিঘি আবার মাছের চেনা ঘর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বছরের ফি জোড়া মাসের পেরথম মঙ্গলবার এখান থেকে একটা কুচো চিংড়ি তুলে নিয়ে যায়, এমন সাধ্যি নেই কারও। কয়েকশো বছর আগে এই দিনটিতেই জলে বিষ ঢেলে নন্দির মতো মাছের রাজাকে অধর্ম করে খুঁচিয়ে মারা হয়েছিল কি না! সেই থেকে ষাঁড়া পিরেত হয়ে এই দিনটিতে সে সারা দিঘি পাহারা দেয়!

যে লোকটি এ কাহিনি শুনিয়েছিল তারই নাম মুকুন্দরাম। লোকটি কথা বলে একটু বেশি, কিন্তু বলে বড় ভাল।

pathagar.net

মুকুন্দরামের পুঁজিতে আরও এমন খবরাখবর থাকলে, তাকে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে দেখা করতে বলেছিলাম। সে তা করেনি। তবে তার সঙ্গে এখানে-সেখানে দেখা হয়ে গেছে মাঝে মাঝে। এমনই একবার দেখার সময় সে সুখ সাগরের খবর দিয়েছিল আমাকে।

কিন্তু! মনের মধ্যে একটা কিন্তু-র খটকা খুব বড় হয়ে উঠেছে হঠাৎ। মুকুন্দরাম বলেছিল পো-খানেক পথ পিছিয়ে গেলেই বাদুড় জোলা গাছের নিশানাটা দেখা যাবে। কিন্তু কোথায় বাদুড় ঝোলা গাছটা? এক পোর জায়গায় আধ ক্রোশ পথই তো পার হয়ে এলাম, দু দিকে সজাগ চোখ রেখে খুঁজতে খুঁজতে। বাদুড় ঝোলা গাছের কোনও চিহ্ন তো নেই! সে গাছ যদি না পাই, তা হলে?

জোড়াগড়ে যাবার নাম করে যখন রাস্তার মাঝে নেমেছিলাম, তখন বিকেল। এরই মধ্যে দু ধারের জঙ্গলের বড় বড় গাছের মাথায় সূর্য যে অনেকখানি নেমে গেছে! রাস্তা উত্তর দক্ষিণের বলে এর মধ্যেই বেশ একটু আবছা অন্ধকার। খানিকবাদেই তো পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে। তার মধ্যে বাদুড় ঝোলা গাছটাকে কি আর দেখে চিনে নিতে পারব?

গাছটা সত্যিই কি আছে? হঠাৎ এই সন্দেহটাই গভীর হয়ে উঠেছে। যার কথা শুনে চোখ-কান বুজে অজানা বন-জঙ্গলের মাঝে এমন একটা বেয়াড়া জায়গায় নেমেছি, সেই মুকুন্দরামের ওপর এতখানি ভরসা রাখার কোনও কারণ সত্যি আছে কি?

মুকুন্দরাম আমার মাইনে করা দালাল নয়। এ পর্যন্ত তার কোনও খবরাখবর যাচাই করে দেখার সুবিধেও হয়নি কখনও। তার অমন জাঁকিয়ে বলা সুখ সাগরের বর্ণনা কি সব তা হলে মিথ্যে ধাপ্পাবাজি! আমি ওপারের তাঁদের তল্লাশ করে বেড়াই বলে, তাঁদেরই একজনের আমাকে একটু জব্দ করার রসিকতা!

না, না, তা হতে পারে না! বাদুড় ঝোলা গাছটা নিশ্চয়ই আছে, এই জঙ্গলের পথের এক ধারে! অন্ধকার হয়ে আসবার আগে আমাকে সেটা খুঁজে বার করতেই হবে।

আমি আগের চেয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করি। আধ ক্রোশের পর এক ক্রোশের ওপর পথ পার হয়ে যাই। কিন্তু কোথাও কোনও বাদুড় ঝোলা গাছের চিহ্ন তো নেই! চিহ্ন থাকলেও এর পর তা দেখে চিনে নেওয়া তো সম্ভব হবে না। সূর্য কিছুক্ষণ আগে ডুবেছে, তারপর পশ্চিম আকাশের লালচে আভাটা ক্রমশ যাচ্ছে মিলিয়ে। এরপর তো ঘুটঘুটি অন্ধকার। সে অন্ধকারে সারা রাত কি তেনাদের, নয় জন্তু জানোয়ারদের ভয়ে কোনও একটা গাছের ডালে কাটাতে হবে।

সেরকম গাছের খোঁজও তো এই বেলা, একটু আলো থাকতে থাকতে না করলে নয়!

তা করতে কিন্তু হয়নি।

দূরে গাড়ির গোরুর গলার ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজ শোনা যায় প্রথমে।

pathagar.net

আলো-টালো অবশ্য তারপর দেখা যায় না। এ জঙ্গলের জন-মনিষ্যিহীন রাস্তায় তেল পুড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে গাড়ি চালাবার আহাম্মুকি কারও নেই।

দু-চাকার ছোটোখাটো গাড়িটা কিন্তু আমার কাছে এসেই থামে। একটু আলো ভেতর থেকে এবার অবশ্য দেখা যায়। গাড়োয়ান যাতে তামাক খাচ্ছে, সেই থোলো হুঁকোর কলকের একটু আলো।

গাড়োয়ানের গলাটা শোনা যায়, 'কী কর্তা, উঠবেন নাকি গাড়িতে?'

'হ্যাঁ, উঠব! উঠব.বই কী!' দু বার আর গড়োয়ানকে ওঠবার কথা বলতে হয় না। পেছন দিয়ে ছই-এর তলায় তার আগেই উঠে বসি।

গাড়োয়ান হুঁকোয় টান দিয়ে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করে। আমি কোথাকার কে, এই জঙ্গলের মাঝে এই ভর সন্ধ্যেয় নেমে কী করছিলাম, কোথায় যাব, কিছুই সে জিজ্ঞেস করে না।

আমিই নিজেকে সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা এই পথে তো আসো যাও, বাদুড়-ঝোলা একটা গাছ এখানে কোথাও দেখেছ?'

'বাদুড়-ঝোলা গাছ?' লোকটা একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলেছে, 'হ্যাঁ, আছে কর্তা, তবে রোজ তো নয়, মাঝে মাঝে তা দেখা যায়।'

মাঝে মাঝে দেখা যায়! শুনে অবাক হয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম, তা কিন্তু আর বলিনি। গাড়োয়ানের মুখটা তার কলকের জ্বলন্ত টিকের আভায় সামান্য একটু মাত্র দেখতে পেলেও, তার গলাটা আমি তখন বেশ চিনতে পেরেছি। সে গলা মুকুন্দরামের।

আমি একটু হুঁ-হাঁ দিলেই সে এক্ষুনি মাঝে-মাঝে-খুশি-মতো দেখা দেওয়া বাদুড়-ঝোলা গাছের জমাটি গল্প শুরু করবে। সে গল্প শুনে তাকে বাধিত করতে আমি চাই না!"

* * *

মেজকর্তা এইখানেই তাঁর কলম থামিয়েছেন। এ বিবরণের প্রথম লাইন লিখবার পর কেন যে অনেক দিন তিনি আর কলম ধরেননি, এবার যেন একটু বুঝতে পেরেছি। যাঁদের তিনি শিকার করে ফেরেন, তাঁদেরই একজনের রসিকতার শিকার হওয়ার বৃত্তান্তটা শেষ পর্যন্ত দেবেন কি না, তাই তিনি কিছু কাল ঠিক করতে পারেননি!

pathagar.net

অন্যান্য ভূতের গল্প

pathagar.net

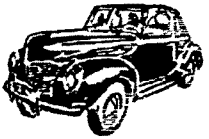

কলকাতার গলিতে

বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে দুপুর-রাতে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিন ক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়া পোড়ান কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে; কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে দু পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসলাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নাই বললেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল তা জীবনে ভোলবার নয়।

বিশ্বনাথ বলে, 'না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরনো নিরাপদ নয়।'

আমরা হেসে উঠলে বলে, 'না হে না, চৌরঙ্গি, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-র কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গি নয়। শোন তাহলে—'

'সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরির জন্যে বই কিনতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একদিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাতের ট্রেনেই বাড়ি চলে আসব; কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়োস্কোপ থিয়েটার না দেখে কেমন করে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেললাম। সঙ্গে বিছানাপত্র বা তোরঙ্গ-বাক্সের ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটিমাত্র সুটকেস, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হত।

কিন্তু হঠাৎ কী খেয়াল হল, একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। ইস্কুলে আমার সঙ্গেই পড়াশুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশিদিন অবশ্য কলেজে থাকেনি। অত্যন্ত খেয়ালি ছেলে—কোনও কাজে বেশিদিন লেগে থাকবার মতো ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ি থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বড় হয়েও

তার সে স্বভাব যায়নি। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন হয়তো শুনলাম, অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়তো দু মাস তার দেখা নেই। আমরা কোনরকমে প্রক্সি দিয়ে হয়তো সেবার তার কলেজের খাতায় কামাই-এর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম, কিন্তু এমন করেই বা কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে এগ্‌জামিনেশনের সময় দেখা গেল, অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কম দিন এসেছে যে, তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে, এত মিশুকে ছিল যে, আমরা সবাই তাকে ভালবাসতাম, কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্তিই হল। বললে—"তবে আর কী? বর্মাটা একবার ঘুরে আসি ভাই!" তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই! আমাদের থেকে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড়, এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকত। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে-দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশ আর মিটতে চাইত না। যে-সব দেশ সে এখনও দেখেনি, তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে, আমাদেরও কখনও কখনও মোহ ধরে যেত, কেমন যেন মনে হত, এই ছোট্টো শহরের ছোট্টো জানা ক-টি রাস্তায় দু বেলা যাওয়া-আসায় জীবনের কোন সার্থকতাই নেই—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কূল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বুক ভরে বড় করে নিঃশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

আমাদের এই ক্ষণিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত, কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশেরই একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে, অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে সে কলকাতার এই ঠিকানায় আপাতত আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়তো যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হল।

বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু গলিটার নাম মনে ছিল। ভাবলাম, কলেজ স্ট্রিট থেকে বেশি দূর হবে না। ট্রেনেরও এখন দেরি আছে। একবার দেখা করেই যাই, যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর—একটা গলি-রাস্তায় ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে, তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশি নয়। বড়জোর আটটা হবে। কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূর হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক আর যাই হোক, কলকাতার পথ তো বটে। অথচ এই আটটা রাতে সেখানে একটি জন-প্রাণীও নেই।

ভেবেছিলাম, খানিক দূর গিয়ে আবার কাউকে পথের কথা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু লোক কোথায়? তাছাড়া গলিটাও যেন ফুরোতে চায় না।

pathagar.net

pathagar.net

একবার সন্দেহ হল, হয়তো ভুল-পথে এসেছি, কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে, আমায় ভুল-পথ দেখিয়ে তার লাভ কী? নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কী এমন লাখ-পঞ্চাশ টাকা আছে যে, চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোশাক দেখেও বড়লোক বলে ভুল করবার কোনও সম্ভাবনা নেই! তবে?

আরও খানিকটা এমনই করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনই নির্জন! বাতিগুলোও এ-পথে মিটমিট করে জ্বলে সেই নির্জনতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একে গ্যাসপোস্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে, তার ওপর কী কারণে জানি না, আলো তাদের এত ক্ষীণ যে, রাস্তায় আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে, এইটুকুও বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা যে আছে, কে তা জানত! দু পাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরি। কোনরকমে হাড়বেরনো ইট-কাঠের জীর্ণ দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোনও বাড়িতে একটা আলো, না জন-মনিষ্যির একটা শব্দ। সে রাস্তার বাড়িগুলো সারের পর সার পোড়োবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে।

ক্রমশ মনে হল, কেমন যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস যেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস সেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনই ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটার ভেতর ঠিক সেইরকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল, কিছু দূরে গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে। কিন্তু জন-মানবহীন জীর্ণ বাড়ির সারের ভেতর ডাইনে কি বাঁয়ে কোথাও কোনও পথ নেই।

সামনের পথও খানিকদূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে-পথে ঢুকেছি, গলিটার ওই একটিমাত্রই তাহলে বেরোবার রাস্তা। আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল-পথ দেখালে কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরও অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসবাতিগুলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল, তারই ক-টা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হল, এ-গলি থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই কস্মিন্ কালে, কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গা-টা কেমন যেন ছম্ ছম্ করছিল।

সবে তো প্রথম রাত! কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখন লোকজনে, গাড়ি-ঘোড়ায়, মানুষের শব্দে গম্ গম্ করছে। অথচ এই পথটা কেমন করে এমন নির্জন-নিস্তব্ধ হয়ে গেল!

মনে হল, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়েনি, কেউ যেন তা জানে না। আমি যেন প্রথম সে শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙলাম।

খট্ খট্ খট্—আমার নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও নেই। সে

pathagar.net

শব্দ অদ্ভুতভাবে নির্জন অন্ধকারে বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই রাস্তার ক-টা বাতি দপ দপ করে নিভে গেল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। নাঃ, এ-গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি, ততই মঙ্গল! কাজ নেই অবিনাশের খোঁজ করে। পরে একদিন আবার এলেই হবে।

খানিকদূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। এদিকেও যে গলির পথ বন্ধ! কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি এ-বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। এ-গলি দিয়ে এগোবার সময়ে আশে-পাশে কোনও পথই তো দেখতে পাইনি। তাহলে গলির দুমুখ বন্ধ হয় কেমন করে?

ভাবলাম, হয়তো আরও একটা পথ ছিল। যাওয়ার সময় আমার দৃষ্টি কোনরকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময়ে ভুল করে সেইটেতেই হয়তো ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ। কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন করে? আমি তো অন্যমনস্ক হয়েছিলাম না। আগাগোড়াই তো সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়িতেও যদি একটা আলো দেখা যেত, তাহলে না হয় ডেকেই জিজ্ঞেস করতাম।

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরতে আমায় হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজানতে কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরও লম্বা করে দিয়েছে।

এবারেও যখন দেখলাম, গলির মুখটা বন্ধ, তখন সত্যিই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—ফাঁকা আকাশ, ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি; শহরে এলে অম্‌নিই আমাদের হাঁফ ধরে; তার ওপর এই ভ্যাপ্‌সা-গন্ধ-ভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক থেকে সে যেন জেলখানার মতো আমাকে বন্দি করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাব, তারও জো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যতই এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কথা ভাবছিলাম, মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কী করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুটকেসটা বইয়ের ভারে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনই করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই তো বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। দূরে একটা মিট্‌মিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না! তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম—আরে! এই তো আমাদের অবিনাশ! এতক্ষণের ভয়-ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চমকে ফিরে তাকাল।

pathagar.net

বললাম—"কী আশ্চর্য! তোর খোঁজ করতেই প্রায় একঘণ্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে। বাব্বাঃ! কী অদ্ভুত গলিতে থাকিস্ তুই। ঢুকে আর বেরনো যায় না!"

অবিনাশ একটু হেসে বললে, "এসেছিস তা হলে ঠিক?"

বললাম, "এসেছি আর কই! তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ি কি খুঁজে বার করতে পারতাম!"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বললে, "আমায় তাহলে তোর মনে আছে ভাই!"

"মনে থাকবে না কেন রে?"

"না ভাই, মনে থাকে না! অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে, তার ভেতরেই আমরা বেঁচে থাকি!"

আমি হেসে বললাম, "ছিলি তো ভূপর্যটক, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে? যাক, এখন তোর বাড়ি চল দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।"

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বললে, "আমার বাড়ি! আচ্ছা চল। আমার চিঠি পেয়েছিলি?"

"হ্যাঁ, সে তো তিনমাস আগে।"

"তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আবার? তা হলে ফিরলি কবে?"

অন্যমনস্কভাবে অবিনাশ বললে, "এই আজ।"

"এই আজ? এবারে গেছিলি কোথায়?"

"বলছি, চল।"

সেই নির্জন গলি দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি, কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল, "এবারে ভাই, গেছলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরনো। নোনা-জল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরনো। চিমনিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয়, বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন যেন একটা ভবঘুরে রুক্ষ রুক্ষ ভাব। সেইটেই তার সৌন্দর্য। তার ওপর যখন শুনলাম যে, এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাসে তার জঙ্গলের মশলা গাছের গন্ধ! তার ওপর গভীর বনের মাঝে তার বোরোবুদুর!

একেবারে মেতে উঠলাম, যেমন করে হোক যেতেই হবে এই জাহাজে। জাহাজের

pathagar.net

ভাড়া দেওয়ার মতো পয়সা নেই! অনেক কষ্টে জাহাজের হেড্‌খালাসিকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে, তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে তেরপল-ঢাকা ছোটো ছোটো বোট টাঙানো থাকে। ঠিক হল, তারই একটার ভেতর আমি থাকব। কেউ তা হলে টের পাবে না। হেড্‌খালাসি কোনও এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমায় খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভেতরে গিয়ে হেড্‌খালাসির নির্দেশমতো লুকিয়ে রইলাম। ভোর হওয়ার আগে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

তারপর ক-দিন কী অদ্ভুতভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি— তেরপল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি, আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর রাতে যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে ক-জন ইঞ্জিনিয়ার ও ফায়ারম্যান এবং ওপরে হাল-ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া যখন আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিং ধরে দাঁড়াই।

এমনই করে ক-দিন বাদে জাভায় এসে পৌঁছলাম। আগে ঠিক ছিল—সবাই নেমে গেলে কোনও এক সময়ে হেড্‌খালাসি এসে আমার নামবার ব্যবস্থা করে দেবে, কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়বার আগের রাতে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে, তা হওয়ার উপায় নেই। এখানে মাল-নামানো হয়ে গেলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই-ডকে রঙ করবার জন্যে পাঠানো হবে, ঠিক হয়েছে। সুতরাং সেভাবে নামা যাবে না।

তা হলে উপায়? হাড্‌খালাসি বললে যে, উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়বার সময় যে-যার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি তা হলেই হয়। তাতেই রাজি হলাম।

জাহাজ জেটিতে লাগাবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাকনি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠেই বাঁধা ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উল্টোদিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ! কেউ দেখতেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাড্‌লের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল। কী ভীষণ তার টান! প্রাণপণেও আমি সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘুরন্ত ভয়ংকর প্যাড্‌লের দিকে তলিয়ে গেলাম।"

আমি শিউরে উঠে বললাম, "তারপর?"

"তারপর সেই প্যাড্‌লের ঘা! কী ভয়ংকর লেগেছে, দেখবি?"

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনও জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামাটা তুলে দেখালে।

এ কী! জামার নীচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, শূন্য।

ভাল করে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই, ওধারের গ্যাসপোস্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপরের দিকে চাইলাম। সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য, শূন্য—সব শূন্য!

pathagar.net

অস্ফুট চিৎকার করে সুটকেস হাতে আমি দৌড়তে শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় যাব? যেদিকে যাই, নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চিৎকার করে একটা পোড়োবাড়ির দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরের দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত সে আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝন্ ঝন্ করে উঠল; কিন্তু কারও সাড়া নেই। অন্ধকার গলি—মনে হল—আমার চারিধারে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

*　　*　　*

জ্ঞান যখন হল তখন দেখি, কে একজন আমায় বলছে—"উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা ইস্টিশন হ্যায়।"

শেয়ালদা স্টেশন! অবাক্ হয়ে দেখি, আমি আমার সুটকেস সমেত একটা রিকশায় বসে আছি। সামনে শেয়ালদা স্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কখন, কেমন করে যে আমি রিকশায় উঠেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অবিনাশ দু মাস আগে জাভার বন্দরে অমনই করেই মারা গেছল।'

pathagar.net

হাতির দাঁতের কাজ

এ-কাহিনির যেমন খুশি মানে অবশ্য করা যেতে পারে। প্রতিদিনের সাধারণ বাস্তব ঘটনার সীমা যেখানে শেষ হয়ে আজগুবির কিনারায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে এ-কাহিনির জন্ম। নিজেদের মনের পাল্লা যেদিকে যেমন ঝুঁকবে, সেই হিসেবেই এ-গল্পের রূপ বদলে যেতে পারে।

শুধু ঘটনাগুলো আমি তাই নিরপেক্ষভাবে এখানে বলে যাব।

ব্যাপারটার আরম্ভ যেভাবে হয়েছিল, তা স্মরণ করলে এখনও আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি। সেই অন্ধকার বাদলার রাত! থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আকাশের অসহ্য গুমোট আর কাটতে চাইছে না। মোগলসরাই স্টেশনের থার্ডক্লাসের ওয়েটিংরুম ঠিক নয়, টিনের চাল দেওয়া বিশাল শেডের তলায় একেবার একলা রাত দুটোর একটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, আর আকাশের মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারিধারে ইঞ্জিনের সান্টিং, মালগাড়ির পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা ও বিশাল জংশন স্টেশনের অসংখ্য অস্বাভাবিক অদ্ভুত আওয়াজ শুনছি। বিশাল টিনের শেডের মাঝখানে মিটমিট করে যে একটিমাত্র তেলের আলো জ্বলছে, তাতে সামনের অন্ধকার একটু তরল হয়েছে মাত্র, শেডের কোণে কোণে সে আলো একেবারেই পৌঁছয়নি।

শেডটি শুধু যাত্রীদের অপেক্ষা করবার নয়, মাল রাখবারও জায়গা। একধারে টিনের চাল পর্যন্ত বড় বড় কীসের বস্তা স্তূপাকার করে সাজানো। আমি যেখানটায় ওজন করবার যন্ত্রটার ওপর বসেছিলাম, সেখানে পরের পর সাজানো পিপের পাহাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আর একপাশে কেরোসিন কাঠের এক গাদা বাকস ভাল ভাবে ঠাহর করে দেখলে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে বাইরের উজ্জ্বল বিদ্যুৎ চমকে সমস্ত শেড আলোকিত না হয়ে উঠলে অবশ্য এ সমস্ত আমি লক্ষ করতাম কি না সন্দেহ! বিদ্যুতের আলো মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার সমস্ত শেড আরও অন্ধকার হয়ে উঠছে যেন! কেমন একটা অস্বস্তিকর অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে, ঘোরাল অন্ধকারের জায়গাটা লাগছে রহস্যময়।

pathagar.net

শখ করে অবশ্য এ-জায়গায় আসিনি। স্টেশনের কোনও ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেয়েই বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। সেকেন্ডক্লাস ওয়েটিংরুমের সব ক-টা আসনই ভর্তি, ইন্টারক্লাসের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে কে একজন যাত্রী হঠাৎ ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভয়ানক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা। মাত্র ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলেই গাড়ি পাওয়া যাবে জেনে শেষে এইখানেই আশ্রয় নিয়েছি।

কিন্তু শেডের তলায় আর কোনও যাত্রী না দেখে প্রথমটা একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কি আজকাল আর ট্রেনে চাপে না! তবে রাত এখন অনেক, যাত্রী যা দু-একজন আছে, বৃষ্টি সত্ত্বেও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই হয়তো কোনরকমে আশ্রয় নিয়েছে, এমনও হতে পারে।

নির্জন শেডের ছমছমে অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, আমারও প্ল্যাটফর্মে কোনরকম একটা আশ্রয় খোঁজাই ভাল ছিল। হাত-ঘড়িটার উজ্জ্বল ডায়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম, সবে একটা বেজেছে। আরও একঘণ্টা এই শেডের তলায় কাটাতে হবে জেনে মনটা বিশেষ প্রসন্ন হয়ে উঠল না।

ভয়কাতুরে আমি মোটেই নই, এত বড় জংশন স্টেশনের যাত্রীনিবাসে বসে ভয় পাওয়ার কোনও কথাও নয়, তবু আবছা অন্ধকারে চারিধারে স্তূপাকার মালের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে অস্বাভাবিক নির্জনতার জন্যেই বোধহয়, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

বাইরের সান্টিং প্রভৃতির শব্দ ও মেঘের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের এককোণ থেকে কেঠোপোকার কাঠ কুরে কুরে ফুটো করবার একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার একটা শব্দে চমকে উঠে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর বস্তাগুলোর ওপর থেকে দ্রুতবেগে নেমে অন্ধকারের কোণে চলে গেল। কিন্তু সে-সব অস্বস্তির কারণ হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

পনের মিনিট আরও এইভাবে কেটে যাওয়ার পর কিন্তু সত্যিই অস্বস্তিটা যেন অত্যন্ত বেড়ে গেছে, মনে হল। বড় রেল-স্টেশনের শব্দের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, হঠাৎ মাঝে মাঝে সব একেবারে থেমে যায়, তারপর আবার শুরু হয় অতর্কিতে। এখন যেন শব্দের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেইরকম একটা ফাঁক পড়েছে, আকাশে মেঘের ডাক নেই, কেঠোপোকাটাও যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়েছে। অসাধারণ একটা নিস্তব্ধতা।

সে নিস্তব্ধতা আমার পেছন দিকে খুব কাছাকাছি আচমকা একটা প্রচণ্ড ফোঁসফোঁসানির শব্দে ভেঙে গেল। এটা যে নিকটের কোনও লাইনে ইঞ্জিনের স্টিম ছাড়ার আওয়াজ, তা বুঝেও চমকে ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না এবং সেই মুহূর্তে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বিচার করে দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার এমন কোনও হেতুই অবশ্য ছিল না, কিন্তু যে ঘরে এতক্ষণ নিজেকে একা বলে জেনে এসেছি, সেখানে আচম্বিতে ঠিক

pathagar.net

pathagar.net

নিজের পেছনেই অপরিচিত শাদা একটি মূর্তিকে বসে থাকতে দেখলে প্রথমটা একটু বিচলিত হয়ে ওঠাই অস্বাভাবিক বোধহয় নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, লোকটা আমার ঠিক পেছনে ওজন করবার যন্ত্রের ওপরে এসে বসলেও কখন যে সে ঢুকেছে, টেরও পাইনি। এখনও লোকটা ঠিক পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল, এতটুকু সাড়া-শব্দও নেই।

আবছা আলোয় অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে নজর করে দেখলাম। দুটো হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে সে বসে আছে, পাশে একটা ছোট বোঁচকা। পোশাক ও মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে তাকে সাধারণ দরিদ্র একজন চীনেম্যান বলেই সহজে বোঝা যায়।

বুঝে একটু বোকাই হলাম। এরকম নির্জন জায়গায় একজন সঙ্গী পেলে খুশি হওয়ারই কথা। দুটো আলাপ করে বাঁচা যায়, কিন্তু চীনেম্যানের সঙ্গে কী আলাপ করব? বাধ্য হয়ে তাই আবার মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। চীনেম্যানও আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার বলেই মনে হল। শেডের তলায় আর কেউ আছে বলে তার যেন খেয়ালই নেই।

মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটবার পর আর একবার কৌতূহল ভরে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছি, এমন সময় বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মাত্র এক সেকেন্ডের সেই উজ্জ্বল আলোই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চীনেম্যান মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তার তেরছা আধবোঁজা চোখ তুলে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু আমি তখন যা দেখবার, তা দেখতে পেয়েছি। লোকটার গালের বাঁ ধারে একটা লম্বা কাটা দাগ বাঁ ভুরুর কোণ থেকে কানের ধার পর্যন্ত টাটকা ও জমাট রক্তে মিশে দগদগে হয়ে আছে।

হঠাৎ ভয়ংকরভাবে চমকে ওঠায় আমার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ নিজের অজানতেই বেরিয়ে গেছল, কিন্তু চীনেম্যানের তাতে ভ্রূক্ষেপও দেখা গেল না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে আগেকার মতো নিঃশব্দে নিশ্চল নিস্পন্দভাবেই সে বসে রইল। মুখের অত বড় কাটাটাও যেন তার কাছে কিছুই নয়।

এবার রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠলাম। এরকম অদ্ভুত সঙ্গীর সঙ্গে এই নির্জন জায়গায় বসে থাকবার মতো মনের জোর তখন সত্যিই হারিয়েছি।

বাইরে বৃষ্টি আবার জোরে পড়তে শুরু করেছে, তা সত্ত্বেও উঠে প্ল্যাটফর্মেই চলে যাব ঠিক করলাম। সঙ্গের ছোটো সুটকেসটা তুলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় বাইরে অনেক লোকের গোলমাল শোনা গেল। গোলমালটা এই দিকেই আসছে। দেখতে দেখতে কয়েকটা টর্চের আলো শেডের ভেতর এসে পড়ল, তার পরেই কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ ও একজন কর্মচারীর আবির্ভাব।

টর্চের উজ্জ্বল আলো আমার দিকে ফেলে হিন্দুস্থানি দারোগা সাহেব একটু যেন বিস্মিতভাবেই এগিয়ে এলেন।

'আপনি—আপনি কতক্ষণ আছেন এখানে?'

অবাক হয়ে বললাম, 'তা প্রায় দেড়ঘণ্টা!'

pathagar.net

'দেড়ঘণ্টা! আপনি কি একলাই আছেন?'

'একলা? না—'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই দারোগা সাহেব উৎসুকভাবে বললেন, 'আর কে ছিল এখানে? চীনেম্যান, একজন চীনেম্যানকে দেখেছেন?'

পেছনে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওই তো!' কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! কোথায় সে চীনেম্যান!

দারোগাবাবু আমার মুখের ভাব লক্ষ করে কৌতূহল ভরে বললেন, 'আপনার পেছনেই ছিল নাকি?'

'এই তো কয়েক সেকেন্ড আগেই দেখেছি। মুখের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ!' আমার শুকনো গলা দিয়ে কথাগুলো যেন বেরতেই চাইছে না।

পুলিশেরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছিল। দারোগাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক দেখেছেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড আগে কী বলছেন? সে বেরিয়ে যায়নি এখান থেকে?'

'আমার জ্ঞানত তো নয়!'

শেডের মধ্যে স্তূপাকার মালের পেছনে কোনও জায়গায় চীনেম্যান লুকিয়ে থাকতে পারে মনে করে পুলিশ তারপর তন্নতন্ন করে খোঁজার আর কিছু বাকি রাখলে না, কিন্তু কোনও চিহ্নই তার পাওয়া গেল না। কেমন করে যে সে এক সেকেন্ডের মধ্যেই এমন অন্তর্হিত হয়েছে, কে জানে!

হয়রান হয়ে পুলিশ শেষ পর্যন্ত খোঁজা বন্ধ করে শেড ছেড়ে চলে গেল। আগাগোড়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

পুলিশের লোক চলে যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হল এ-শেডের ভেতর একলা থাকা মোটেই আর নিরাপদ নয়। লোকটার কোনও পরিচয় অবশ্য দারোগার কাছে পাইনি, কিন্তু মুখে অত বড় ক্ষত নিয়ে নেহাত কোন সাধুপুরুষ যে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না, এটুকু বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া তার এই শেড থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ব্যাপারটার কোনও ব্যাখ্যাই যে পাওয়া যায় না।

কথাটা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল একবার। না, আর এখানে একমুহূর্তও নয়। সুটকেসটা নীচে নামিয়ে রেখেছিলাম। সেটা তুলতে গিয়ে মেঝের ওপর কী একটা জিনিস পড়ে রয়েছে মনে হল। জিনিসটা তুলে আলোর নীচে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বেশ অবাক হলাম!

হাতির দাঁতের খোদাই অপরূপ একটি খুদে মূর্তি! এসব জিনিসের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমার আছে, তাতেই বুঝলাম, কোনও উঁচুদরের চীনে কারিকর ছাড়া এমন জিনিস কেউ গড়তে পারে না। মাত্র একবিঘৎ পরিমাণ মূর্তিটির সমস্ত অঙ্গ, মায় চোখের ভুরু পর্যন্ত অপরূপ কৌশলে খোদাই করা। হাতির দাঁতে তৈরি সাধারণ চীনে-মূর্তির মতো কাল্পনিক দৈত্য-দানবের রূপ এটিতে নেই। সাধারণ একজন চীনে মজুরশ্রেণীর

pathagar.net

লোক পিঠে ঝোলা বেঁধে একটু নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত শুধু সেই খুদে মূর্তির চোখের চাহনি, আর মুখের সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেখা ফোটানর কায়দা।

মূর্তিটা যে চীনেম্যানই তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন করি কী? যেখানের জিনিস, সেইখানেই রেখে যাব, না জমা দেব পুলিশের জিম্মায়!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোভই জয়ী হল। এমন অপরূপ শিল্পকৌশলের নিদর্শন চুরি করতেও বুঝি সত্যিকার সমঝদারের বাধে না। আমি তো ঠিক চুরিও করছি না।

মূর্তিটা সুটকেসের ভেতর ভরে আমি শেড থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সে মূর্তি আমি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিনি। পথেই সে মূর্তি আমার হাত থেকে খোয়া গেছে। কেমনভাবে আমি তা হারালাম, সেই কথা এবার বলি।

রাত্তির দুটোর ট্রেন আধঘণ্টা লেট করে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন বৃষ্টি মুষলধারে পড়তে আরম্ভ করেছে। সেই বৃষ্টির ভেতর ভাল কামরা খোঁজ করবার উৎসাহ আর ছিল না। সামনে যে কামরা পেলাম, তাইতেই উঠে কিন্তু খুশি হয়ে গেলাম। কামরাটি একেবারে খালি। একটা বাঙ্ক দখল করে শুয়ে পড়লে এরপরে যত লোকই উঠুক না কেন, বাকি রাতটা ঘুমের ব্যাঘাত আর হবে না।

ঘুমোবার আয়োজন করবার আগে কিন্তু আর একবার মূর্তিটি বের করে দেখার কৌতূহল জয় করতে পারলাম না। ট্রেনের জোরাল আলোয় তার কারুকার্য আরও ভাল করে দেখবার সুবিধে হবে বলে সুটকেসটা খুলে ফেললাম। কিন্তু কোথায় মূর্তি! সব জিনিসের ওপরে যে সেটিকে রেখেছিলাম, সে কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। সুটকেসটি যে রকম জিনিসে ঠাসা, তাতে নাড়াচাড়ায় ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

তবুও সন্দেহভঞ্জনের জন্যে ওপরের কাপড়চোপড়গুলো এক এক করে তুলে ফেললাম। দেখলাম, সে মূর্তিটা আছে ঠিক, কিন্তু এভাবে সিল্কের রুমালটায় জড়িয়ে সেটাকে রেখেছিলাম বলে কোনও মতেই স্মরণ করতে পারলাম না। অবশ্য তখন মাথার অবস্থা আমার খুব ভাল ছিল না। হয়তো বিমূঢ়তার মধ্যে এইভাবেই রেখে থাকব মনে করে সিল্কের রুমাল খুলে সেটা বের করলাম।

ট্রেনের জোরাল আলোয় তার অপূর্ব কারুকার্য সত্যিই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু একটা খুঁতও সেই সঙ্গে দেখতে পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেডের ম্লান আলোয় এ খুঁতটুকু ধরা পড়েনি। চীনেম্যানের হাত থেকে অসাবধানে মেঝেয় পড়বার সময়ই বোধহয় মূর্তিটির মুখের বাঁ ধারে একটু চিড় খেয়ে গেছে। সামান্য একটু সূক্ষ্ম দাগ মাত্র, কিন্তু এমন মূল্যবান জিনিসের এইটুকু খুঁত থাকলেও মন ক্ষুণ্ণ হয়।

সযত্নে মূর্তিটিকে আবার সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সুটকেসের ভেতর তুলে রাখলাম। তারপর সুটকেসটি মাথার কাছে রেখে পুলিশের ফেরারি আসামি সাধারণ একজন

চীনেম্যানের হাতে এমন দামি জিনিস কেমন করে এসে পড়েছিল, ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

ঘুমের ভেতর অস্পষ্টভাবে সেই চীনেম্যানকেই যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় সে যেন কী বলে আমায় শাসাচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথাটা ধরে সজোরে সে ঝাঁকুনি দিলে। ঘুমটা সহসা ভেঙে গেল।

সভয়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, চীনেম্যান নয়, একজন ভদ্রলোক আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাচ্ছেন।

বিমূঢ়ভাবে উঠে পড়লাম। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থেমেছে, বাইরে কুলি ও যাত্রীদের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের কথা আমার কানে গেল।

'কী রকম ঘুমোচ্ছেন মশাই! ট্রেনে এমন অসাবধানে ঘুমোয়?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না?'

দেখতে আমি মুহূর্তেই পেলাম। আমার সুটকেস খোলা, কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র তছনছ হয়ে কিছু বাঙ্কের ওপর, কিছু কামরার মেঝেয় পড়ে আছে!

'টাকাকড়ি ছিল নিশ্চয়—দেখুন, কী গেছে!'

টাকাকড়ি নয়, কী যে গেছে, আমি সুটকেসের ওই অবস্থা দেখবামাত্র বুঝেছি। তবু দুরাশা ভরে সমস্ত কামরায় ছড়ান জিনিসপত্র ও সুটকেস আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। না, সে মূর্তিটা ছাড়া আর সব জিনিসই ঠিক আছে।

ভদ্রলোক আমার মুখ দেখে সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'খুব দামি কিছু ছিল বুঝি! স্টেশন-মাস্টারকে খবর দিন এক্ষুনি!'

তারপর একটু থেমে কী ভেবে বললেন, 'ঠিক হয়েছে, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামবার আগেই একজন চীনেম্যান এই গাড়িটা থেকেই নেমে গেল বলে মনে পড়ছে এবার!'

'চীনেম্যান!'

'হ্যাঁ, পিঠে একটা বোঁচকাসমেত। তখন অত খেয়াল করিনি। তারপর কামরায় ঢুকেই দেখলাম, আপনার সুটকেসের এই দশা! ইশ! তখন যদি আমারই বুদ্ধি হত। যাই হোক, পুলিশে খবর দিন এই বেলা স্টেশন-মাস্টারকে বলে!'

কিন্তু আমি সিল্কের রুমালটা হাতে নিয়ে বিমূঢ় হয়ে বসেই রইলাম।

রুমালটার একধারে সামান্য একটুখানি রক্তের দাগ।

pathagar.net

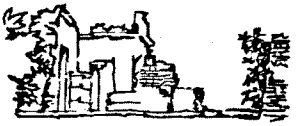

মাহুরি-কুঠিতে এক রাত

ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাপারটা যতই ভেবে দেখছিলাম, ততই আরও অদ্ভুত লাগছিল! বাস্তব ঘটনা অবশ্য অনেক সময়ই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর হয় জানি, তবু যেন এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

দু দিন আগেই বিমলের সঙ্গে আমার মেসের ঘরে প্রায় একটা পর্যন্ত জেগে তুমুল তর্ক করেছি। শেষ পর্যন্ত এ বয়সের তর্কাতর্কির যা পরিণাম হয়, তাও আমাদের বচসায় হয়েছে। দুজনেরই জেদ ও রাগ বেড়ে গেছে এবং পরস্পরকে যা-তা বলে যুক্তির অভাব পূরণ করেছি।

আমি বলেছি, 'যেমন বুনোদের দেশে জঙ্গলের মাঝে থাকিস, তেমনই জংলি বুদ্ধিও হয়েছে।'

বিমল বলেছে, 'শহরের মাঝখানে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় বসে বারফট্টাই মারতে সবাই পারে। এক রাত ভেরেন্ডির জঙ্গলের ধারে মাহুরি-কুঠিতে কাটাতে পারলে বুঝতাম।'

হেসে উঠে বলেছিলাম, 'কাটাবার কী দরকার! তোর ভূত শহর আর ইলেকট্রিক লাইটকেই বা ডরায় কেন? বেছে বেছে যত পোড়োবাড়ি আর জঙ্গলে না থেকে সে-ই তো এখানে এলেই পারে!'

বিমল চটে উঠে জবাব দিয়েছে, 'তার দায় পড়েছে! ভূত আছে, এ কথা তোর কাছে প্রমাণ করার জন্যে তার তো মাথাব্যথা নেই!'

বিমলকে আরও রাগিয়ে দিয়ে বলেছি, 'তার না হোক, তোর তো আছে। তুই নিজে কোনওদিন, মাহুরি না মুহুরি, কুঠিতে তাকে দেখেছিস!'

বিমল বলেছে, 'রাত অবিশ্যি কখনও কাটাইনি, তবে বাইরে থেকে যা দেখেছি, তা-ই যথেষ্ট!'

আমি এ কথার উত্তরে এমনভাবে বিদ্রূপের স্বরে 'ওঃ!' বলেছি যে, বিমল মর্মাহত হয়ে চুপ করে গেছে।

pathagar.net

খানিক বাদে গম্ভীরমুখে শুধু বলেছে, 'সাহস থাকে তো একবার সেখানে যাস।'

আমি ব্যঙ্গ করে বলেছি, 'গেলে অন্তত মাহুরি-কুঠির বাইরে থাকব না।'

পরের দিন সকালে অবশ্য আমাদের এই তর্ক নিয়ে মনকষাকষির কোনও চিহ্ন আর ছিল না। বিমল সকালের ট্রেনেই তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। আমি স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। আগের রাতের তর্কের কথা দু-জনে ভুলেও একবার উত্থাপন করিনি।

কিন্তু কে জানত, সে তর্কের জের অমন করে মেটবার নয়! দু দিন বাদেই আমাকে সত্যিসত্যিই ভেরেন্ডির জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হবে, তা-ই বা কে ভেবেছিল!

বিমল চলে যাওয়ার পর একটা রাত পার হতেই দুপুরবেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। 'বিমল মরণাপন্ন, এখুনি আমার যাওয়া দরকার'—টেলিগ্রামের মর্ম এই।

যাওয়া যে দরকার, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যাওয়া সোজা নয়। ছোটোনাগপুরের একটা নগণ্য স্টেশনে নেমে মাইল দশ-বারো গেলে ভেরেন্ডির জঙ্গল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরনো তামার খনিকে নতুন করে আবিষ্কার করে আজ দু বছর বিমল সেখানে কাজ করছে। সেই নির্বান্ধব পুরীতে যে-সমস্ত কুলি-মজুর নিয়ে সে দিন কাটায়, সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা যে কোনও সাহায্যই করতে পারবে না, এটা ভাল করেই বুঝতে পারছিলাম।

টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই বিকেলে রওনা হয়ে পড়েছি। ভেরেন্ডির জঙ্গলে বিমলের নিমন্ত্রণ এভাবে রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে ভেবে সত্যিই অদ্ভুত লাগছিল। আর বিরক্তি লাগছিল যেতে এমন দেরি হওয়ায়। যে স্টেশনে নেমে ভেরেন্ডির জঙ্গলে যেতে হয়, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর সব গাড়ির কাছেই তা অস্পৃশ্য। তাই বাধ্য হয়ে প্যাসেঞ্জারেই চাপলেও তার শামুকের মতো গতি ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে কী যে বিপদ সেখানে হচ্ছে, কে জানে! বিমল অত্যন্ত শক্তধাতের ছেলে। সহজে সে কাতর কিছুতেই হয় না। সেই সুদূর জঙ্গলে একলা আজ সে দু বছর যেভাবে বাস করে আসছে, তা থেকে তার কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অত্যন্ত বিপদে না পড়লে সে যে আমায় তার করত না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ রকম গদাই লস্করি চালের গাড়িতে আমি সেখানে পৌঁছবই বা কখন, আর তাকে সাহায্যই বা করব কী!

বিকেলবেলা যে গাড়ি রওনা হয়েছিল, সমস্ত রাত গুটি গুটি করে চলে ভোর প্রায় চারটার সময় টিনের চাল দেওয়া নিতান্ত আখ্‌খুটে চেহারার একটি স্টেশনে সে গাড়ি আমায় নামিয়ে দিলে। প্ল্যাটফর্ম বলতে কাঁকর-ফেলা খানিকটা জায়গা, ট্রেনের সব ক-টা পাদানি বেয়ে সেখানে নামতে হয়।

স্টেশন নয়, মনে হল যেন জনহীন কোন প্রান্তরে নেমেছি। শীতের রাত্রে ভোর চারটের সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তার ওপর গাঢ় কুয়াশায় স্টেশনের একটি মিটমিটে

pathagar.net

তেলের বাতি প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানব কেউ আছে বলে মনে হল না। মিনিট-খানেক থেমে গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই তার নির্জনতা আরও যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। ট্রেনের আলোয় ও আওয়াজে নিজের নিঃসঙ্গতা এতক্ষণ এমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এ স্টেশন থেকে বেরোতে তো হবে। ভেরেন্ডির জঙ্গলের রাস্তা এখান থেকে দশ-বারো মাইল দূর, এইটুকু মাত্র জানি—কোন্ দিকে যে যেতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। জিজ্ঞাসাই বা করি কাকে! টিকিট চাইতেও তো কেউ আসে না!

স্টেশনের অস্পষ্ট বাতিটার দিকে এবার এগিয়ে গেলাম। স্টেশনের ঘরে কোনও-না- কোনও লোক নিশ্চয়ই আছে।

'ঠারিয়ে!'

সত্যিই একেবারে আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানুষ নয়, যেন বাঘের গলার আওয়াজ! পেছন ফিরে কুয়াশায় ঘোলাটে একটা নীল আলো ছাড়া কিন্তু কিছুই প্রথমটা দেখতে পেলাম না। নীল আলোটা আরও একটু কাছে এগিয়ে আসার পর বিশাল একটা বস্তার মতো জিনিস অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। জিনিসটা বস্তা নয়, মানুষের মাথা। প্রকাণ্ড কম্ফর্টার ও তার ওপর কম্বল জড়িয়ে অতবড় হয়েছে! সেই কম্বল ও কম্ফর্টারের সামান্য একটু ফাঁকের মধ্যে এবার প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ ও দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল। শরীরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে অস্পষ্ট।

সত্যিই, প্রথমটা কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম। সেই কম্বল জড়ান মুখ থেকে গম্ভীর বাজখাঁই গলায় 'টিকস্' শুনেও যেন প্রথমে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারিনি।

আবার আওয়াজ এল, 'টিকস্ কাঁহা?'

এবার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পকেট থেকে টিকিট বার করলাম এবং পরমুহূর্তে ভাল্লুকের মতো একটা মোটা লোমওয়ালা হাত হঠাৎ অন্ধকার থেকে যেন বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলে মনে হল।

সাহস করে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভেরেন্ডির জঙ্গলের রাস্তাটা কোনদিকে, বলতে পারেন?'

নীল আলোটা দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে। সেটা থামল এবং কুয়াশার ভেতর থেকে শোনা গেল সবিস্ময় প্রশ্ন—'কাঁহা?'

'ভেরেন্ডির জঙ্গল, যেখানে তামার খনি আছে!'

নীল আলোটা আমার কাছে সরে এল। কম্ফর্টার ও কম্বলের বস্তার তলা থেকে দুটি চোখ আমায় তীক্ষ্ণ-সবিস্ময়-দৃষ্টিতে লক্ষ করছে, বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপারটা কী!

হঠাৎ 'উধর মৎ যানা' শুনে চমক উঠলাম এবং কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই বিমূঢ় হয়ে দেখলাম, লোকটা চলে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে নীল আলোটাই হঠাৎ বোধহয় নিভে গেল, অন্ধকারে অন্তত আর কিছু দেখা গেল না।

কিন্তু আমার এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। স্টেশনের সেই

pathagar.net

pathagar.net

আলোটি লক্ষ করে আবার এগিয়ে গেলাম। সেই আলোর কাছেই বাইরে বেরোবার গেটটা পেয়ে তবু আশ্বস্ত হওয়া গেল। পাশেই স্টেশনের একটি মাত্র ঘর। ভেতর থেকে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা আওয়াজ আসছে। গেট দিয়ে বেরোতে বেরোতে কৌতূহল ভরে একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সত্যি বিস্মিত হলাম। একটা কুলি বা চাপরাশিরও সেখানে দেখা নেই।

বাইরেও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার, শুধু একটা অস্পষ্ট পায়ে-চলা-পথের ধূসর ধোঁয়াটে রেখা কোনরকমে চেনা যাচ্ছে। আপাতত আর কোন পথ না দেখতে পেয়ে সেইটিকে অনুসরণ করাই যুক্তিসংগত মনে হল। খানিকবাদেই অন্ধকার কেটে গেলে আর ভাবনার কিছুই থাকবে না। তখন কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই চলবে।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা কিছুই হল না। এরকম নির্জন পথ কোথাও আছে বলে জানতাম না। চারিধারে বিশাল ঘনজঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ দূরের কথা, এই ভোরের বেলা একটা পাখির আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না। সৌভাগ্যের কথা জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলার দু-একটা রেখা ছাড়া এ-পথ কোথাও দু-ভাগ হয়ে যায়নি।

ঘণ্টা-চারেক চলার পর পথ ক্রমশ ওপরে উঠেছে, বুঝতে পারলাম। জঙ্গলও সেখানে আরও নিবিড়। একটা চড়াই পার হয়েই দূরে একটা পাথুরে ঢিবির ধারে ছোটো একটা বস্তির মতো দেখতে পাওয়া গেল। সে বস্তির পেছনে একটা বিশাল ভাঙা পোড়ো-বাড়ি পাথুরে ঢিবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের ওপরে মাথা তুলেছে।

কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চিহ্ন পেয়ে বুঝলাম। সেইটেই খনি। কিন্তু এখানেও যে জনমানব নেই! খোলার চালের ঘরগুলির অধিকাংশই সকালবেলাও বন্ধ। টালিতে ছাওয়া বাংলো-প্যাটার্নের একটি বাড়ি তার মধ্যে দেখতে পেয়ে সেইটেই বিমলের থাকবার জায়গা হবে মনে করে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় মৃদু একটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সামনেই বসবার ঘর, কয়েকটা বেতের চেয়ার ও একটা টেবিল পাতা। পেছনদিকে ভেতরের দিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে। এঘরেও কেউ নেই।

পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পেছনে পদশব্দ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। চমকে উঠবার কথা বটে। প্রায় ছ ফুট লম্বা অত্যন্ত রোগা ও সরু যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে, বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া অমন চেহারা কোথাও চোখে পড়েনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিমলবাবু কোথায় আছেন, বলতে পার?'

'কৌন্ বাবু?'

'বিমলবাবু। আমি তাঁর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কেমন আছেন এখন?'

'নিঞ্জিনিয়ার বাবুকো মাঙ্গতা!' বলে লোকটা হাতের ও মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গি করলে।

pathagar.net

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, 'নিঞ্জিনিয়ার বাবুই হল কিন্তু তিনি কোথায়?'

লোকটা আমার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে যা বললে, তার মর্ম বুঝতে আমার মিনিট দুয়েক লাগল এবং তারপর স্তম্ভিত হয়ে আমি ঘরের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম।

ধীরে ধীরে তারপর সমস্ত ব্যাপারই শুনলাম। আমি টেলিগ্রাম পেয়ে যখন ট্রেনে রওনা হয়ে পড়েছি, তখন বিমল এ জগৎ থেকেই রওনা হয়ে গেছে। সব চেয়ে আঘাত পেলাম যেভাবে সে মারা গিয়েছে, তার বিবরণ শুনে। এক হিসেবে আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারণ কোনও অসুখে বিমল মারা যায়নি, তার মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক!

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বিমল বোধহয় আমার বিদ্রূপ স্মরণ করেই জেদের বশে মাহুরি-কুঠিতে সমস্ত রাত একলা কাটায়। তার সঙ্গে যারা কাজ করে, তারা সকলেই মানা করেছিল, কিন্তু সে শোনেনি।

শেষরাত্রে অদ্ভুত একটা গোঙানি শুনে তার বেয়ারা রামদীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের মাঠে বিমলকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধরাধরি করে তাকে ভিতরে তুলে আনার পর দেখা যায় তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন, গায়েও নানা জায়গায় দাগ আছে। সে নিজেই পড়ে যাক বা কেউ তাকে ফেলে দিয়ে থাকুক, কোনও উঁচু জায়গা থেকে পড়ার দরুন যে তার মাথায় দারুণ চোট লেগেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর সকালের দিকে আধঘণ্টাটাক তার জ্ঞান হয়েছিল, সেই সময়েই সে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলে। কিন্তু তারপর উন্নতির বদলে ক্রমশ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিকেল চারটার সময় সে মারা যায়।

এদেশের লোকের, বিশেষত অশিক্ষিত কুলি-মজুরদের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশি। তাদের ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে ভূতেই যে ফেলে দিয়েছে, এ বিষয়ে তাদের কোনও সন্দেহ নেই, সেই জন্যে বিমলের মৃত্যুর পর তার সৎকার করেই তারা সদলবলে খনির বস্তি থেকে চম্পট দেয়।

আমি সেইজন্যেই সকালে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পাইনি। বেচারা রামদীনও পালিয়েছিল। যাওয়ার সময় তবু বুদ্ধি করে সে স্টেশনে আমার ঠিকানায় আর একটা 'তার' করে দেয়। আগেই রওনা হওয়ার দরুন আমি সে 'তার' পাইনি। যে স্টেশনমাস্টার সে 'তার' নিজের হাতে পাঠিয়েছিল, তার অদ্ভুত আচরণের ও কথাবার্তার মানে এবার যেন একটু বোঝা গেল।

যার কাছে সমস্ত খবর পেলাম, ব্যঙ্গচিত্রের চেহারার মতো চেহারার অদ্ভুত সেই লোকটিই রামদীন। আজ সকালবেলা সে সাহস করে বাবুর জিনিসপত্রের তদারক করতে কিংবা চুরির মতলবে, যে-কারণেই হোক 'নিঞ্জিনিয়ার' বাবুর কুঠিতে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপার শোনবার পর আমার মনের অবস্থা যা হল তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিমলের এ পরিণামের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, কিন্তু এ ব্যাপারের পর চুপ

pathagar.net

করে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ভূতই হোক আর যাই হোক, এ ব্যাপারের রহস্যভেদ আমায় করতেই হবে। আমার সংকল্প আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছি।

ভেরেন্ডির জঙ্গল থেকে নিকটস্থ থানা প্রায় একবেলার পথ, দুপুরে রামদীনকে সেখানে খবর দিয়ে পাঠিয়ে আমি রাতের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্তত বিমলের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যেই মাহুরি-কুঠিতে একরাত আমায় কাটাতেই হবে। তার জন্যে আয়োজন অবশ্য বেশি কিছু করবার নেই। শুধু একটা জোরালো বৈদ্যুতিক টর্চ ও একটা ছোটো লোহার রডই আমি সঙ্গে নেব, ঠিক করলাম।

সন্ধ্যের আগে রামদীনের ফিরে আসবার কথা, কিন্তু রাত প্রায় সাতটা হয়ে গেলেও তার কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। মুখে আমায় কথা দিলেও ভূতের ভয়ে সে যে শেষ পর্যন্ত সরে পড়েছে, বুঝতে পারলাম। কিন্তু পুলিশের লোকেরও দেখা নেই কেন? রামদীন কি থানায় খবরও তাহলে দেয়নি?

জঙ্গলের মাঝে পরিত্যক্ত খনির বস্তিতে আমি সম্পূর্ণ একা। রাত ন-টা বাজবার পর আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পুলিশের লোক আসুক বা না আসুক, মাহুরি-কুঠিতে একাই আমায় যেতে হবে।

বিমলের বাংলো থেকে মাহুরি-কুঠি বেশি দূর নয়। দিনের বেলা বাড়িটিকে ভাল করে লক্ষ করে দেখেছি। প্রকাণ্ড দোতলা দু-মহলা কুঠি, কী খেয়ালে যে এখানে এত বড় বাড়ি কেউ নির্মাণ করেছিল, বোঝা কঠিন। বাড়িটির অবশ্য অত্যন্ত ভগ্নদশা। বড় বড় গাছ তার দেয়াল ভেদ করে বেড়ে উঠেছে; বাইরের দিকের ঘরগুলির জানালা-দরজার চিহ্ন আর নেই। এই শুকনো দেশেও ভেতরের ঘরগুলিতে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরের মহল পার হয়ে গেলে ভেতরের বিশাল মহলে ওপর-নীচে অসংখ্য গোলকধাঁধার মতো যে-সমস্ত ঘর পাওয়া যায়, দিনের বেলাতেও সেগুলি অন্ধকার! দরজা-জানালা অধিকাংশেরই নেই, যেগুলির আছে, সেগুলিও কব্জা থেকে খুলে পড়েছে। আসবাবপত্র অনেক ঘর এখনও অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিঁকে আছে, শুধু বোধ হয়, ভূতের ভয়ে চোরও সেখানে প্রবেশ করেনি বলে।

অমূলক ভয় আমার নেই, তবুও টর্চহাতে বাইরের দেউড়ি দিয়ে মাহুরি-কুঠিতে প্রবেশ করবার সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা যে ছমছম করে উঠেছিল, তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এমন গাঢ় জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় আমার সত্যি কখনও হয়নি। টর্চের আলোতে যেন সবলে তাকে কেটে বেরতে হচ্ছে। বাইরের মহলের ওপর-নীচের সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। নীচের ঘরগুলোর দুর্দশা অত্যন্ত বেশি। আগাছায় মেঝে প্রায় ছেয়ে গেছে। ইট-সুরকি-পাথর জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। ঘরগুলিতে ঢোকাও বিপজ্জনক। সে-সমস্ত ঘর ছেড়ে এবার ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার ঘরগুলি এখনও

BanglaBook.org

অনেকটা ভাল অবস্থায় আছে। একটার পর একটা ঘর টর্চের আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করে যেতে যেতে কিন্তু অস্বাভাবিক কোনও কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিমলের মৃত্যুর রহস্য এ-বাড়ির সঙ্গে জড়িত না থাকলে অনায়াসে মনে করা যেত যে, নেহাত কুসংস্কারের দরুন এখানকার লোক এই পোড়োবাড়িটাকে এমন বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

বাড়িটির একটি বিশেষত্ব অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ঘরগুলি এমন বিশৃঙ্খলভাবে সাজান, যেখানে সেখানে দরজা, ঘুলঘুলি প্রভৃতি এমনভাবে বসান যে, সবসুদ্ধু একটা বিরাট গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে যেতে পথ গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশি।

সম্প্রতি সত্যিই তাই গুলিয়ে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছিল। খানিক আগে যে ঘর ছেড়ে গেছি, সেই ঘরেই আবার ঘুরে এসে সবিস্ময়ে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওপরে ওঠবার সিঁড়িটাও যে ঠিক কোনদিকে হবে, বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠিক করে নিয়ে আবার এগুতে যাব এমন সময় পায়ে যেন কী একটা ঠেকল। টর্চের আলো সেখানে ফেলে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিনিসটা আর কিছু নয়, একটা চামড়ার ব্যাগ, কিন্তু এ-ব্যাগটির সঙ্গে আমি পরিচিত, কলকাতায় বিমলের কাছে আমি এটা দেখেছি এবং তার সুন্দর চামড়ার কাজের প্রশংসাও করেছি।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর একটি খোপে সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া করকরে নতুন দশটাকার নোট। আর একটি খোপে খুচরো কয়েকটি টাকাপয়সা ও একটি ছোটো কাগজের টুকরো। এই কাগজের টুকরোটি দেখেই আমি চিনলাম—নিজের হাতে বিমলকে এই কাগজে আমার ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম।

বিমল তার মৃত্যুর আগের রাত্রে এই ঘরে যে ঢুকেছিল, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই, কিন্তু এ ব্যাগ তার পকেট থেকে পড়লই বা কী করে! আর কোনও শত্রুর হাতে যদি তার প্রাণ গিয়ে থাকে, তাহলে তারা এ ব্যাগ ছোঁয়নিই বা কেন!

টর্চের আলোয় ঘরটা এবার আমি খুব ভাল করে তন্ন তন্ন করে দেখলাম। ঘরটি আকারে বেশ বড়, অন্যান্য ঘরের চেয়ে আসবাবপত্রও একটু বেশি—দুটি ভাঙা তক্তপোশ, একটা পা-ভাঙা টেবিল। দেওয়ালে লাগান একটা কাঠের উইয়ে-খাওয়া বড় আলমারি ছাড়া খুচরো আরও অনেক জিনিস ঘরময় ছড়ান, কিন্তু বিমলের আর কোনও চিহ্ন সেখানে পেলাম না। এমন কী কাল যে সে এখানে ছিল, তার কোনও পরিচয়ও নয়।

তবু এই ঘরেই রাতটা কাটাবার সংকল্প আমি তখন করে ফেলেছি। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আমার করাই ছিল। পকেট থেকে মোমবাতি বার করে ভাঙা একটা তক্তপোশের ওপর রেখে জ্বেলে ফেললাম। টর্চের আলো তো সারারাত জ্বালা যায় না।

Pathagar.net

বাতিটা জ্বেলে তক্তপোশের ওপর বসতে গিয়ে কিন্তু উঠে পড়তে হল। পাশের ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় করে কী একটা ভারী জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ। এতক্ষণ এই পোড়োবাড়িতে এ ধরনের কোনও শব্দ কিন্তু শুনিনি।

টর্চটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কিন্তু প্রথমটা একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। হুড়মুড় করে পড়বার মতো কোনও জিনিস সেখানে নেই। অথচ আমি স্পষ্ট সে শব্দ শুনেছি। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আগের ঘরে ফিরলাম। বাতিটা কেমন করে ইতিমধ্যে নিভে গেছে, কে জানে! দেশলাই বার করে আবার সেটা জ্বালতে গিয়ে জ্বালা আর হল না।

বাইরের বারান্দায় চটি পায়ে দিয়ে ফট্‌ফট্ করে চলার স্পষ্ট শব্দ। ঝড়ের মতো এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ ফেলবার আগেই কিন্তু শব্দটা গেছে থেমে। টর্চ ফেলে অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই দুটো মান্ধাতার আমলের শুকনো চিমড়ে ছেঁড়া বেহারি-চটি সেখানে পড়ে রয়েছে।

না, ভয় তখনও আমি পাইনি, বরং কোনও দুষ্ট লোকের কারসাজি যে এর ভেতর আছে, সেই সন্দেহই আমার তখন দৃঢ় হয়েছে। সে কারসাজির সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

চটি দুটো হাতে করে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম এবং বাতি জ্বেলে গ্যাঁট হয়ে ভাঙা তক্তপোশের ওপর বসলাম ঘটনার পরিণতি দেখবার জন্যে। ভূতুড়ে চটি যদি হয়, তো আমার চোখের সামনেই চলুক দেখি! মিনিট দশেক কোনও কিছুই হল না। ভুতুড়ে চটির ক্ষমতার বহর দেখে নিজের মনেই হাসছি, এমন সময় সত্যিই— সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

চুপি চুপি আমার পেছনে কে যেন স্পষ্ট আমার নাম ধরে ডাকলে একবার!

মোমের বাতিতে ঘরে তেমন আলো না হলেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেছনে কেউ কোথাও নেই। তবে এ শব্দ এল কোথা থেকে!

আমার মনের ভুল! কিন্তু মনের এরকম ভুল হওয়াও তো ভাল লক্ষণ নয়! ভয় পেয়ে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, তারাই চোখে নানারকম ভুল দেখে, কানে নানারকম আওয়াজ শোনে বলেই তো জানি।

নাঃ, আরও সতর্ক এবং সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবার। নিজের মনের ভুলে ভয় পাওয়ার মতো লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এতক্ষণ শুধু ঘরগুলো ঘোরাফেরা করতেই কেটে গেছে, বুঝতে পারিনি। শীতকালের ভোর হতে এখনও প্রায় ছ ঘণ্টা বাকি। এই ছয় ঘণ্টায় শুধু ঘুমে চোখ না জড়িয়ে আসে, এইটুকু দেখতে হবে! বসে থাকলে পাছে ঘুম আসে বলে এবার ঘরে পায়চারি করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আমার প্রত্যেক পা ফেলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যেন আর

pathagar.net

একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে যদি কারও পায়ের শব্দ হয়, তাহলে তার চেহারাখানা যে কী রকম, তা কল্পনা করাও কঠিন! বারান্দায় একটা হাতি হাঁটলেও বোধহয় অমন শব্দ হত না।

পায়চারি করতে করতে ইচ্ছে করে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দও গেল থেমে। আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে শব্দ শোনা গেল।

এবার বাইরে ব্যাপারটা দেখতে যেতেই হল। টর্চ নিয়ে সমস্ত পথটা কিন্তু তন্ন তন্ন করে বৃথাই খুঁজে দেখলাম।

ফিরে এসে দেখি, আবার আলো গেছে নিভে। নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমশই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশলাইটা বার করেছি এমন সময়—

'আলো জ্বেলো না ভূপেন!'

মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে একটা যেন বরফ-গলান জলের স্রোত নেমে গিয়ে সমস্ত শরীর অবশ করে দিলে। এ যে স্পষ্ট বিমলের গলা!

খানিকক্ষণ শুকনো গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুল না, তারপর জড়িত স্বরে কোনও রকমে বললাম, 'কে তুমি?'

'আমি—আমি বিমল! দোহাই তোমার, আলো জ্বেলো না।'

'কেন?'

'তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই, তাও বলতে পারব না। তুমি ভয় পেয়েছ, ভূপেন?'

ধরা-গলায় ঢোক গিলে বললাম, 'না'।

'তাহলে টর্চ না জ্বেলে এগিয়ে এসে তক্তপোশটায় বসো।'

আমি হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোশটায় এসে বসলাম।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল—'তুমি আসাতে কী খুশি যে হয়েছি, বলতে পারি না।'

কথাটা শুনে নিজে যথেষ্ট খুশি না হলেও বললাম, 'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, তুমি না এলে আমায় এইখানে কতকাল বন্দি হয়ে থাকতে হত, কে জানে!'

'কেন?'

'দুটো দরকারি কথা না বলে আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলাম না।'

'পৃথিবী ছেড়ে কোথায়?'

খানিকক্ষণ কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায়, বললে না?'

'সে-কথা জানতে চেও না, তোমাদের জানবার অধিকার নেই।'

'ও, কিন্তু তুমি কি বরাবর এখানে আছ?'

'বরাবর। যতক্ষণ তুমি এসেছ, তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন একটু তোমার পাশে বসব?'

pathagar.net

তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, কী দরকার! কিন্তু ওসব শব্দটব্দ কী তুমি করছিলে?'

'আমি! না, না, আমি নয়, ও ওরা সব করেছে!'

সভয়ে, সবিস্ময়ে বললাম, 'ওরা!'

'হ্যাঁ, ওরাও আছে, ওরা ওইরকম করতে ভালবাসে, আমার কিন্তু ভাল লাগে না। তবে—'

'থামলে কেন? তবে?'

'তবে অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে হলে বিরক্তি আসে, তখন ওইসব বদখেয়াল হয়।'

'ওরা কি অনেকদিন আছে?'

'অনেকদিন! যোধমল তো মানসিংহের সঙ্গে মনসবদার হয়ে এসেছিল, আর দেবদত্ত অশোকের সময়ের!'

'এতদিন ওরা কেন এখানে আছে?'

'কী করবে, মায়ার বন্ধন! যোধমল এখানকার এক রাজকোষ লুঠ করবার সময় দামি একটা মোতির মালা পেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। সেই লুকনো জায়গার কথা কাউকে জানাবার আগেই তলোয়ারের খোঁচায় মারা যায় বলে বেচারার আজও মুক্তি হল না।'

একটু উৎসুকভাবে বললাম, 'কাউকে জানালেই তো পারে।'

'উহুঁ, যাকে-তাকে জানালে হবে না, ওর বংশধর, আত্মীয়স্বজন, অন্তত দেশের লোক না হলে জানাবার উপায় নেই।'

'অর্থাৎ মাড়োয়ারি চাই?'

'হুঁ— মাড়োয়ারিরা আবার এধার মাড়ায় না।'

যোধমল সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে বললাম, 'আর দেবদত্ত?'

'দেবদত্ত? দাঁড়াও জিজ্ঞেস করে দেখি!'

খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ; তারপর শোনা গেল—'দেবদত্তের উদ্ধার হওয়া আরও শক্ত।'

'কেন?'

'অশোকের সময় ও মঞ্জুশ্রী না ধ্যানশ্রীর কী একটা মূর্তি গড়েছিল।'

'সেটা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি বুঝি? কোথায় সেটা? আমি না হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে—'

'না, না, আবিষ্কৃত হয়েছে বই কী! কিন্তু পণ্ডিতরা তর্কাতর্কি করে তার নাম নিয়ে বাধালে গোল, কেউ বলছে, সেটা দেবীমূর্তিই নয়, কেউ বলছে, কী বলে—প্রজ্ঞাপারমিতা!'

'তাতে কী!'

pathagar.net

'চুপ, চুপ। দেবদত্ত একেবারে খেপে উঠবে এখুনি! তাতেই তো সব! নাম ঠিক হওয়া না দেখে ও কিছুতেই যেতে পারছে না এখান থেকে!'

'আমি না এলে তুমিও যেতে পারতে না?'

'বোধ হয় না।'

'ওই সব বদখেয়াল?'

'তাও হয়তো হত! এখুনি তো মাঝে মাঝে কীরকম নিশপিশ করে।'

'কী নিশপিশ করে? হাত!'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল, 'হাত তাকে বলে না! তবে—'

গলার স্বরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বললাম—'যাক্‌গে ভাই, তোমার কী কথা ছিল না, যা বললেই তোমার ছুটি?'

'হ্যাঁ ছুটি, একেবারে ছুটি!'

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলা হলেই তুমি চলে যাবে?'

'তৎক্ষণাৎ!'

'কিন্তু তুমি চলে গেলে এই—এই যোধমল আর দেবদত্ত—'

'না, না, তোমার কোনও অনিষ্ট করবে না এরা, আমার বারণ আছে?'

'তবে বল এবার!'

'এই বলছি—কুঁক্!'

'ও আবার কী?'

'ও কিছু না!'

'কিন্তু হেঁচকির মতো শোনাল যেন!'

'পাগল! হেঁচকি কোথায়—কুঁক্।'

'কিন্তু আমরা তো ওকেই হেঁচকি বলি।'

'আমরা বলি না!'

'তবে কী ওটা?'

'ও আমাদের ভৌতিক দেহের বুৎকার!'

'বুৎকার কী?'

'ও-কথার মানে তোমরা বুঝবে না! ওটা এ-জগতের কথা!'

'ও-জগতের কথা আলাদা নাকি! এতক্ষণ তো বেশ বাংলা বলছিলে।'

'অনেক কষ্টে অনুবাদ করে বলতে হচ্ছিল, কিন্তু বুৎকারের অনুবাদ হয় না—কুঁক্!'

'না ভাই, এটা হেঁচকি!'

'উহুঁ, বুৎকার।'

'আমি তাহলে আলোটা জ্বালছি!'

'দোহাই তোমার! এখনও আমার কথা বলা হয়নি—কুঁক্।'

'কথা তুমি পরে বোলোখন। এখন একটু জলের চেষ্টা দেখি।'

pathagar.net

'আমাদের জল লাগে না, আলো জ্বাললেই আমায় চলে যেতে হবে—কুঁক্।'

'তা না হয় খানিক চলে গিয়ে তোমার বুৎকারটা থামিয়ে এসো' বলে সত্যিই দেশলাই বের করে মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললাম।

কিন্তু এ কী! ঘরে যে কেউ নেই! এ কী ব্যাপার!

'কুঁক্!'

'বিমল, তুমি আছ এখানে?'

বিমলের কোনও উত্তরের বদলে শোনা গেল—'কুঁক্!'

কয়েক সেকেন্ড মাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার মনে আর কোনও সংশয় রইল না। এগিয়ে কড়া দুটো ধরে সজোরে কাঠের আলমারির পাল্লা দুটো আমি খুলে ফেললাম।

'এ কী! বিমল, তুমি! সশরীরে?'

বিমলের গলা থেকে বেরোল— 'কুঁক্!'

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোধ হয় অনেকখানিই বোঝা গেছে। হেঁচকিটুকু উঠে সব না খেঁচড়ে দিলে বিমলের ফন্দিকে সার্থক বলা চলত। তার টেলিগ্রামে আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং আগের দিন মাইল-দশেক দূরের এক মস্ত মেলার জন্যে খনির লোকজনকে ছুটি দেওয়ায় তার অন্যদিকে সুবিধে হয়ে গেছল। শুধু রামদীনকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকে টানতে হয়েছিল। পোড়োবাড়িতে তার দুরমুশ ফেলা ও পেটানোর আওয়াজের যে নমুনা সে দেখিয়েছে, তাতে তারিফ তাকে অবশ্যই করতে হয়। অবশ্য স্টেশন-মাস্টারের অদ্ভুত মূর্তি ও আচরণ বিমলের ফন্দিকে সাহায্য করবে, এ কথা সেও ভাবেনি।

pathagar.net

গল্পের শেষে

বর্ষাকাল, সুতরাং বৃষ্টি তো হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্তিরেও তার এমন বিরাম হবে না জানলে আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না।

জায়গাটা যে এমন পাণ্ডববর্জিত দেশ তাই বা কে জানত! খবরের কাগজে নসীপুরে 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড'-এর নাম দেখে ভবেশ একটা এন্ট্রি করে দিয়েছিল! ভবেশ আমাদের 'দি আন্‌বীটন্ ইলেভেন'-এর অত্যন্ত উৎসাহী কর্মঠ সেক্রেটারি। খেলাটা ফুটবল এবং এন্ট্রি ফী আট আনার নীচে থাকলে সে চোখ বুজে একটা চিঠি ছেড়ে দেবেই তা সে খেলা যেখানেই হোক না কেন। 'আনবীটন্ ইলেভনে্' ছ-মাসের পরমায়ুতে এ পর্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পরেনি, সেদিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আন্‌বীটন্ সত্যিই। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে দমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু-আধটু-নাম-করা 'শিল্ড' বা 'কাপ'-এ নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে একথা স্বীকার করা ভাল। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে শুরু করেছে যে, খেলা শেষ হয়ে গেলেও থামেনি, অনেকে হাততালি দিতে দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভাল খেলেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্‌সলের শহর এবং মফস্‌সলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশি হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়েরও একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড'-এর কর্মকর্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশি হয়ে জানিয়েছিলেন যে, স্টেশন থেকে এক পা গেলেই তাঁদের ক্লাব ও খেলার মাঠ। আমাদের কোনও কষ্টই হবে না। স্টেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন। লোক বলতে স্টেশনমাস্টার ও এক পা বলতে ঘটোৎকচের পা সেটুকু তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

pathagar.net

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভেতর তিনটে নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গিয়ে যখন নসীপুর নামলাম তখন প্রথমে তো মনে হল গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামতে আমরা ভুল করে নেমে পড়েছি। এ আবার স্টেশন নাকি! প্ল্যাটফর্ম না থাক মাটিতে খানিকটা লাল কাঁকরও তো বিছানো থাকে। হুড়মুড় করে আবার ট্রেনে উঠে পড়তে যাচ্ছি এমন সময় উদয় খুব পর্যবেক্ষণ করে বললে, 'নারে, স্টেশনই বটে, দেখছিস না, দু-একটা কাঁকড় পড়ে রয়েছে। বাকি সব জলে ধুয়ে গেছে!'

কাঁকর দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম। বৃষ্টির ভেতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছও দেখা গেল। গাছ নয়, সেটা স্টেশনের নাম লেখা সাইন পোস্ট। বৃষ্টিতে নীচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন পোস্টের পর দূরে একটা ঘর এবং তার ভেতর একজন স্টেশনমাস্টার টিকিট-কালেক্টরকেও পাওয়া গেল। তাঁর হাতে রিটার্ন টিকিটের অর্ধেক দিয়ে রাস্তা জিগ্‌গেস করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হল। 'ওটা যে খাল মশাই! যাব কী করে নৌকো না হলে?' স্টেশনমাস্টার বুঝিয়ে দিলেন, খাল নয়, ওটা রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম সেই রাস্তা সাঁতরে ও কাদা ঠেলে দু ক্রোশ গেলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয়। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড' না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না। কোনও মতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করলে। বাড়িতে ফিরবে, কিন্তু যাবে কি হেঁটে! সত্যিই তো! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাত্তির আটটার আগে কোনও ট্রেন এই মাঠে আর থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজি হতে হল।

নসীপুরে কেমন করে পৌঁছলাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার পোলো ও রাগ্‌বির মাঝামাঝি কী ধরনের ফুটবল খেলা হল তার আর বর্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথায় এবার নামা যাক—

এগার জন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলাধূলার নয়, খেলাকাদার পর নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শিল্ডের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ জন কিছুতেই আর থাকতে রাজি হল না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁতরেই তারা স্টেশনে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটা গোল খেয়ে আমরা একটু বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এর ভেতর বসন্তর আবার একটু জ্বরভাবও দেখা দিয়েছে। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কারণ ধাক্কাটা তার ওপর দিয়েই একটু বেশি গেছে। সেই ছিল গোলকীপার। জ্বর অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর তো যেতে দেওয়া যায় না! বসন্তের সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও সুরেন রাতটার মতো নসীপুরেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম।

pathagan

ঠিক তো করলাম, কিন্তু থাকব কোথায়! 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড'-এর কর্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল'-এর কর্তা স্বয়ং—শুনে একটু অবাক অনেকে হবে সন্দেহ নেই। আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কী করবে বলা তো যায় না! শিল্ড তৈরির খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন তখন মেমোরিয়ালটা দু-দিন আগে থাকতে হলে কার কী বলবার আছে! যাই হোক, নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু আধটু ঘোরাফেরা করেও সুবিধে মতো একটা থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসায় স্থানাভাব। পাড়ার বাড়িতে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নিচু বলেই মনে হল। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম, 'ব্রজমোহন কাপ' বলে আর একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল'-এর সঙ্গে তাদের আদা এবং কাঁচকলার মতো মধুর সম্পর্ক। এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সময় উদয়ের বুদ্ধিতে একটা সুরাহা হয়ে গেল। গ্রামের একটি মাত্র চলনসই রাস্তায় বার কয়েক আসা-যাওয়া করতে গিয়ে একটি মাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে। একটু ভগ্নদশা! কিন্তু আমাদের দশা তো তার চেয়ে খারাপ!

উদয় হঠাৎ বলে ফেললে, 'এ বাড়িটার খোঁজ তো করেননি মশাই! এদেরও একটা শিল্ড বা কাপ আছে নাকি?'

নগেনবাবু হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'না, না, মশাই—ও বাড়ির দিকে তাকাবেন না।'

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বললাম, 'কেন মশাই, দোষটা কীসের? একজন বিদেশি লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টিবাদলার রাতে আশ্রয় দেবে না এমন অমানুষ কেউ আছে নাকি?'

নগেনবাবু একটু রেগেই বললেন, 'আরে না, মশাই! গ্রেট বেঙ্গল স্পোর্টিং বারো গোল খেয়েছিল, তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা তো মোটে আট গোল।'

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুন এমন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, 'একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাই খেতে পারতাম না!'

'আরে না মশাই, সে কথা নয়! চলুন চলুন!' কিন্তু আমরা অমন বাড়ির লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিজ্ঞেস করলে দোষ কী, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনেবাবু চটে বললেন, 'কাকে জিজ্ঞেস করবেন মশাই? ও বাড়িতে কেউ থাকে!'

pathagar.net

'থাকে না! তা হলে তো আরও ভাল! একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাত তালা ভাঙতেই হয় তো তালার দামটা না হয় দিয়েই দেব।'

নগেনবাবু আমাদের বিমূঢ় করে বললেন, 'তালা নেই মশাই, দরজা সব খোলা।'

'দরজা খোলা বাড়িতে কেউ নেই? তবু এই বৃষ্টির ভেতর আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন?'

'ঘুরিয়ে মারছি না আপনাদের, মারবার ইচ্ছে নেই বলেই তো ঘোরাচ্ছি।'

উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট করে খোলে। সে-ই প্রথম ব্যাপার আন্দাজ করে বললে, 'ভূতুড়ে বাড়ি নাকি মশাই?'

নগেনবাবু মুখে না বলে শুধু একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে উঠে বললে, 'এতক্ষণ বলতে হয়! ভূত পেলে কি এদেশে মানুষের কাছে আশ্রয় খুঁজি!'

নগেনবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন, 'ও বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই!'

আমি বললাম, 'বাড়ির বাইরে থাকাটা বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই চললাম! শুধু একটা হ্যারিকেন ও ক-টা মাদুর ও একজোড়া তাস যদি জোগাড় করে দিতে পারেন!'

নগেনবাবু তার পরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এ ভূতুড়ে বাড়িতে রাত্তির বেলা জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে আসতেও তিনি নারাজ!

বসন্তকে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে আমরা ভূতুড়ে বাড়ির দেউড়ির নীচে ভবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঝুপ ঝুপ করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক, একটা জোনাকিরও দেখা নেই।

অনেক দিন বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুন বাড়িটা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম। গাঁয়ের লোক বাড়িটা দেখে যে ভয় পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাড়িটা একেবারে গ্রামের এক ধারে। ধারে কাছে একটা বসতি নেই। দিনের বেলা বাড়ির যে চেহারা দেখে গেছি, তা একটু অদ্ভুত। দোতলার একদিকের ঘরের জন্য দেওয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেওয়ালগুলো দরজা-জানলার শূন্য ফোকর নিয়ে যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বাড়িটার চেহারা সত্যিই কেমন যেন বদলে গেছে। বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম।

ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাদে এসে হাজির হতে সত্যি খুশিই হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিসপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পড়ি কি মরি করে দৌড় দিল তা একটা দেখবার জিনিস!

pathagar.net

নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার একদিকে গুটিকয়েক ঘর ঠিক আছে! সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে, 'কই বাপু, ভূত, অতিথি সজ্জন দেখে একটু সাড়া দাও।'

আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে-না-হতেই ওধারের কোন্ ঘর থেকে লম্বা টানা ক্যাঁ-চ্ করে একটা শব্দ হল! ভাঙা পুরনো কোন জানলার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়, তবু শব্দটা ঠিক ভূতসই ও যথাসময়ে হয়েছে বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বললে, 'বেশ, বেশ! এই তো ভদ্রতা, নসীপুর গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূত ভাল!'

সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড়্ ঘড়্ ঝন্ ঝন্ করে একটা আওয়াজ হল। একটু চমকে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেললাম। শুধু বসন্ত জ্বরের রুগি বলেই বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন ভাবে বললে, 'ঠাট্টা-তামাশা আর ভাল লাগছে না বাপু! বিছানা-টিছানা একটা করতে হয় তো কর।'

সুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম, ব্যাপারটা কী!

ভবেশ বললে, 'সাড়া-টাড়া দিচ্ছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেন কি না দেখাই যাক-না!'

পাশের ঘরটা আকারে ছোট। দেয়াল থেকে নোনা ধরা চুন-বালি খসে পড়ে ও পুরনো কাঠ-কাঠরার ভগ্নাংশ থাকার দরুন অত্যন্ত নোংরা।

ঘরে ঢুকেই দু জনেই অমন চমকে উঠব ভাবিনি।

বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে-না-দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতো ফ্যাঁশ করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাতিটা নিয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু, একটু দর্শনও দিও। কই তিনি?'

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষুষ। দেখে ভয় পাবারই কথা। অত বড় এবং অমন মিশকালো বেড়াল বাংলা মুলুকে জন্মায় বলে জানা ছিল না। তিনি তার বহুদিনের দখলি সত্ত্বের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জ্বলজ্বলে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে তখন দন্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বললে, 'এটা কি ভাল হল, প্রভু! এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়ালরূপ ধারণ করলেন! আপনার নিজমূর্তি কই!'

pathagar.net

বেড়ালটা আর একবার ফ্যাঁশ করে উঠল উত্তরে। আমরা হেসে ফেললাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তের বিরক্ত গলা শোনা গেল, 'আবার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায়? অন্ধকারেই থাকব নাকি!'

সে-ঘরে ফিরে এসে ভবেশ হেসে বললে, 'তোর কি ভয় করছে নাকি! না, জ্বরের লক্ষণ?'

বসন্ত আরও যেন বিরক্ত হয়ে বললে, 'ভয়-টয় জানি না বাপু! আমার ভাল লাগছে না। খুঁজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছিস!'

আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল, অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। খাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাম। কেন বলা যায় না, সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্যে শুতে কেউ ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

রাত্রের সঙ্গে বৃষ্টির বেগও ক্রমশ যেন বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে পুরনো বাড়ির দরজা জানালার নানারকম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে।

তাস খেলাটা তার মাঝে কিছুতেই যেন জমল না। এক সময়ে সবাই তাস ফেলে দিলাম। সুরেন বললে, 'এবার শুয়ে পড়লে হয়!' আমরা সবাই সায় দিলাম, কিন্তু কারও ওঠবার নাম নেই!

হঠাৎ ভবেশ বললে, 'সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছ তো! কী রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনেছ! কে বলবে যে, ও ঘরে একটা কাঠের পা ঠকঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না?'

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম। এই প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবার, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলিনি।

ভবেশ আবার বললে, 'এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরি করে।'

ভবেশের কথা শেষ না হতেই উদয় বললে, 'তা না হয় হল, কিন্তু এমন আওয়াজটাই বা কীসের! ও তো আর জানালা নাড়ার শব্দ নয়!'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম একবার। সকলেই একটু যেন হতভম্ব। হঠাৎ সুরেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। কই, কোথাও কিছু নেই তো!

ভবেশ হেসে উঠল, 'আমাদের ভয় ধরল নাকি!' তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না!

উদয় হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু ওটা কী!'

আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে! আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম—একটা কালো রঙের খানিকটা ছেঁড়া কাপড়!

pathagar.net

হেসে বললাম, 'রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে নাকি!'

এবার ভবেশই বললে, 'কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওইখানেই দেখেছিলাম না!'

তাও তো ঠিক! বেড়ালটাকে তো এইখানেই দেখা গেছল। এই কাপড়টাকেই ভুল করে কি? না, তাও সম্ভব নয়। স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগের ফোঁসফোঁসানি শুনেছি নিজের কানে!

তবু হেসে বললাম, 'বেড়ালটা কি তোমার জন্যে এতক্ষণ বসে আছে? সে কখন সরে পড়েছে!'

'কিন্তু কোথা দিয়ে! এ ঘরের একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া তো দেখতেই পাচ্ছ!'

বললাম, 'আমাদের ঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়তো!' মুখে বললেও মনের খটকা গেল না। আমাদের ঘর দিয়ে কোনও বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজানতে যাওয়া সম্ভব তো নয়। একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম। একটা ধুমসো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না এমন বেহুঁশ আমরা ছিলাম কি?

ভবেশ বললে, 'থাকগে, বেড়ালের অন্তর্ধান-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর—' তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ গলান জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুৎ বেগে।

ওধারের ঘরে বসন্তর সে কী আতঙ্কের চিৎকার! উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি!

ছুটে সবাই এ ঘরে এলাম। বসন্ত ছাইয়ের মতো মুখ করে উঠে বসেছে! তার কপাল- মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে!

'হয়েছে কী! কী হল!'

বসন্ত হাঁফাবে, না কথা বলবে। অনেক কষ্টে থেমে থেমে যা বললে, তার মর্ম—তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা নিশ্বাস তার মুখে ফেলছিল।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে। 'জ্বরের ঘোরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।'

বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বললে, 'না, না, আমি জেগে স্পষ্ট সে নিশ্বাস শুনেছি, মুখের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ, তারপর চিৎকার করেছি! তোরা ওরকম করে চলে যাসনি।'

ভবেশ হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি! আমরা এখানেই শুচ্ছি এবার!'

উদয় একটু ইতস্তত করে বললে, 'এক্ষুনি শুয়ে কী দরকার। জেগে একটু গল্প করা যাক না!'

pathagar.net

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারও সে কথায় আপত্তি দেখা গেল না, ভবেশেরও না।

'বেশ তো!' ভবেশ বললে, 'কীসের গল্প হবে! বল, সুরেন একটা ভূতের গল্পই বল, এ বাড়িতে বেশ লাগবে।'

বসন্ত তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না।'

'যাঃ, তুই একেবারে ভীতুর একশেষ! বল সুরেন!'

সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বললে, 'বলব? তাহলে শোন! আন্‌বীট্‌ন ইলেভেন্‌ বলে এক টিম গেছল নসীপুর—'

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বললে, 'আহা, বলতেই দাও ওকে।'

সুরেন বলতে শুরু করলে। আমাদের নসীপুর আসা ও তারপরের ঘটনার সে যা বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হলে হাসি আসত নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়াশব্দ বিশেষ নেই। গল্প শেষে ভূতুড়ে বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছল, সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বললে, 'ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ, আরও নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ! ঘরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় একজন গল্প বলছে, ভূতের গল্প।

কেউ সে গল্প বিশ্বাস করে না, গল্প যে বলছে সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, অশরীরী কেউ এখানে থাকো তো এ তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক!'

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

উদয় বললে, 'আরে, তাসটা পড়ল কোথায়?'

সুরেন সত্যি সত্যিই গল্পের সঙ্গে একটা তাস ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে, 'পড়েছে কোথাও ওদিকে!'

'ওদিকে কোথায়!' উদয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ। 'ওদিকে তো খালি মেঝে। এ ঘরে তো জিনিস লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা নেই।'

আমি তবু উঠে বসন্তর বিছানার আশপাশ সমস্ত ভাল করে খুঁজলাম। অন্য সবাই তন্ন-তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশ্চর্য! আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর। শুধু বসন্তর নয়, আমাদের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছে।

ভবেশ হঠাৎ অকারণে অত্যন্ত রেগে উঠে বললে, 'কী তোমরা যা তা করছ! পাগল হলে নাকি সবাই। নাও সুরেন, গল্প বল।'

শুকনো পাংশু মুখে আমরা যন্ত্র-চালিতের মতো আবার এসে বসলাম। সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই। সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস খুলে নিলে, তারপর বললে, 'আগের তাসটা উড়ে গেল—'

pathagar.net

ভবেশ শুরু বললে, 'হুঁ।'

আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বললে, 'উড়ে যাওয়াটা প্রমাণ নয়!' সুরেনের স্বর অত্যন্ত অস্ফুট, 'এবারের তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেড়িয়ে—'

বসন্তর চিৎকার বুঝি সকলের ওপরে শোনা গেল। তার বিছানায় ঠিক পায়ের কাছে—

না, সেবার আমরা অক্ষত দেহেই তার পরদিন কলকাতায় ফিরেছিলাম। শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে। বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।

pathagar.net

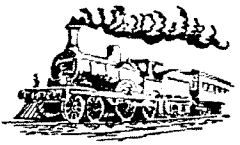

রাজপুতানার মরুতে

ছেলেবেলা হইতে ভ্রমণ করা আমার নেশা। এই পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থির হইয়া কোথাও তিন মাস বসিতে পারিয়াছি, এমন কথা স্মরণ করিতে পারি না।

একলা একলাই ঘুরিয়াছি। যেসব বাঁধা পথে সাধারণ লোক চোখ-কান বুজিয়া বারকয়েক যাতায়াত করিয়া জাঁকাইয়া গল্প করিবার মতো ভ্রমণ সাঙ্গ হইয়াছে মনে করে, সে-পথে যাইতে আমার ভাল লাগে না।—অদ্ভুত সব জায়গা, অজানা সব রেল লাইন, নগণ্য সমস্ত স্টেশন খুঁজিয়া বাহির করিতেই আমার আনন্দ। এই বিদেশ-যাত্রায় আমার কোনও দিন কোনও সঙ্গী মিলিবে আশা করি নাই, কিন্তু তাহাই একদিন মিলিয়াছিল আশ্চর্য রকমে। সেই গল্পই আজ বলিতেছি।

সুদূর রাজপুতানায় জে. বি. রেলওয়ের মারতা রোড স্টেশনে বসিয়াছিলাম ফুলেরা জংশনে যাইবার গাড়ির অপেক্ষায়। ফুলেরা জংশন পর্যন্ত যাইবার ইচ্ছা অবশ্য ছিল না, মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, তাহার আগেই দেগানা স্টেশনে অবতরণ করিব।

মরুভূমির মাঝে স্টেশনটি অত্যন্ত ছোট। ওয়েটিংরুম নাই, একটা ছোট ঘর আছে, কিন্তু তাহাকে ওয়েটিংরুমের সম্মান দেওয়া চলে না। ঘরের মেঝেতে বালি ছাড়া আর কিছু নাই। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, এখন তাহার পায়া খসিয়া যাওয়ায় তাহার বসিবার জায়গাটা মেঝেতে পড়িয়া আছে মাত্র।

একেবারে বালির উপর না শুইয়া সেই তক্তার উপরই কম্বল পাতিয়া শুইয়াছিলাম। এই মরুর দেশে এই সময়টায় দিনের বেলা যেমন অসহ্য উত্তাপ, রাত্রে তেমনই কনকনে শীত। একটু আগুন দিলে ভাল হয় মনে হইতেছিল।

স্টেশনে জনপ্রাণী নাই। যে পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি স্টেশনমাস্টারি করেন, তাঁহার কোয়ার্টার নিকটেই। স্টেশনের একটিমাত্র চাকরের সঙ্গে তিনি সেখানে তখন বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। ট্রেন আসিবার মিনিট পনের আগে আসিলেই তাঁহার চলে।

pathagar.net

পরিষ্কার জ্যোৎস্নার রাত্রি। যে ঘরে বসিয়াছিলাম, তাহার জানালার বালাই নাই। একটি দরজা আছে, কিন্তু তাহাও একেবারে খোলা—বন্ধ করিবার মতো কোনও পাল্লা সেখানে কোনওদিন বসান হয় নাই। সেই দরজা দিয়া চন্দ্রালোকে বহুদূর পর্যন্ত মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। জ্যোৎস্নায় সমস্ত বালির সমুদ্র মনে হইতেছিল। কে যেন রূপার গুঁড়া ছড়াইয়া রাখিয়াছে!

শুইয়া শুইয়া বিশাল মরুপ্রকৃতির রহস্যময় নিস্তব্ধতা সত্যই উপভোগ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, পৃথিবীর মমতাময়ী মাতৃরূপও যেমন সত্য, এই কঠোর তপতীরূপও তেমনই। স্নিগ্ধ শস্যশ্যামলা মাটির স্নেহময়ী রূপ দেখিলে মনে হয়, মানুষই বুঝি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কথা। তাহাকে লালন করিবার জন্যই পৃথিবীর যেন যত ব্যাকুলতা! কিন্তু এই দিক্‌চিহ্নহীন মরুপ্রান্তরে মানুষ নগণ্য হইয়া গিয়াছে—মানুষের প্রতি এই উদাসীন প্রকৃতির ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নাই। এই বিশাল প্রান্তরের মাঝে ক্ষীণ একটি রেখা অনুসরণ করিয়া খেলনার শকটের মতো অসহায়ভাবে মানুষের সৃষ্ট দুর্ধর্ষ ইঞ্জিন গাড়িসমেত যাতায়াত করে। আকাশ ও ধরণীর অসীমতার মাঝখানে মানুষের জীবনের মতোই তাহাকে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

এমনই সব কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের প্ল্যাটফর্মে কাহার যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। ট্রেনের তো এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি! ইহার মধ্যে স্টেশন- মাস্টারের তো আসিবার কথা নয়! সেই মুহূর্তেই দরজায় কাহার দীর্ঘ ছায়া পড়িল। শুধু ছায়া দেখিয়া মানুষের চেহারা অনুমান করা যায় না, তবু মনে হইল লোকটা অত্যন্ত দীর্ঘকায়, তাহার পিঠে একটা বস্তার মতোও কিছু আছে বলিয়া মনে হইল।

ছায়া আর কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইল না। পদশব্দে বুঝিলাম, লোকটি আবার অন্যদিকে ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। খানিক বাদে আবার পদশব্দ আমার ঘরের দিকে আসিতেছে শুনিতে পাইলাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এবারেও লোকটির ছায়া আমার দরজায় পড়িবার পরই সে ফিরিল। ছায়ার বেশি আর কিছু দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল না!

তাহার পর আধঘণ্টা ধরিয়া এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সত্যই আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। এই কনকনে শীতের রাত্রে একেবারে পা গনিয়া গনিয়া কে প্ল্যাটফর্মে এমন করিয়া পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে! উঠিয়া দেখিতে অবশ্য পারিতাম, শুধু গরম কম্বলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উঠিবার উৎসাহ তখন ছিল না।

শেষ পর্যন্ত যখন উঠিলাম, তখন স্টেশনের চাপরাশি ট্রেন আসিবার ঘণ্টা দিয়াছে এবং স্টেশনমাস্টার তাঁহার অফিস ঘরে বসিয়া লাইন-ক্লিয়ারের তারই বোধহয় গ্রহণ ও প্রেরণ করিতেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য! সমস্ত প্ল্যাটফর্মে আমি একা ছাড়া আর কোনও যাত্রী নাই! এতক্ষণ ধরিয়া যে লোকটির ছায়া দেখিলাম, যাহার পদচারণার শব্দ শুনিলাম, সে গেল কোথায়!

pathagar.net

রহস্যের মীমাংসা করিবার পূর্বেই ট্রেন আসিয়া পড়িল, ফাঁকা একটা গাড়ি দেখিয়া রাত্রে ঘুমাইতে পাওয়ার আশায় চড়িয়া বসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ফাঁকা গাড়িতে সমস্ত জানালার শার্সি তুলিয়া দিয়া নীচের একটা বেঞ্চিতে কম্বল বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় খুক করিয়া কাশির শব্দে অবাক হইয়া উপরে তাকাইলাম! যতদূর মনে পড়ে এই কামরায় ঢুকিবার সময় চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আমার দেখার কি এমনই ভুল হইয়াছিল!

আমার বিপরীত দিকের বাঙ্কের উপর একটি লোক বসিয়া আমারই দিকে অদ্ভুতভাবে চাহিয়া আছেন। লোকটির চেহারা অসাধারণ। বয়স প্রায় প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এই রাজপুতের দেশেও এমন বিশাল, বলিষ্ঠ চেহারা খুব কম চোখে পড়িয়াছে, তবে সাধারণ রাজপুত অপেক্ষা রঙ লোকটির ময়লা।

আমাকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া লোকটি চমৎকার হিন্দুস্থানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতদূর যাবেন?'

আমি গন্তব্য স্থান বলিবামাত্র হঠাৎ তিনি বাঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া নীচের বেঞ্চিতে বসিয়া বলিলেন, 'আপনি বাঙালি—কেমন না?'

নিজের পোশাক ও হিন্দুস্থানি উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার একটু গর্ব ছিল। আমার এই পোশাকে এই সুদূর দেশে কেহ বাঙালি বলিয়া চিনিতে পারিবে, আশা করি নাই। বলিলাম, 'কেমন করে বুঝলেন?'

তিনি এবার পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, 'নিজেও বাঙলি বলে।'

ট্রেনের দুইধারে বেঞ্চি হইতে এইবার আমাদের আলাপ শুরু হইয়া গেল। এই শুষ্ক মরুর দেশে আমারই মতো আর একজন ভবঘুরে বাঙালির সাক্ষাৎ পাইয়া নিদ্রার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ আলাপের পর মনে মনে লোকটির প্রতি একটু শ্রদ্ধাই হইল। যাযাবর বৃত্তি অনেককাল হইতেই গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু শুধু বয়সে নয়, অনেক দিক দিয়াই এই লোকটির কাছে আমি শিশু। তাঁহার চুলে পাক ধরিলেও পর্যটনের নেশা আমার চেয়ে এখনও প্রবল আছে দেখিলাম। কত অদ্ভুত জায়গাই না তিনি দেখিয়াছেন, কত অদ্ভুত ঘটনাই না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন!

গল্প করিতে করিতে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই। এই বন্ধ্যা বালির দেশে স্টেশনগুলির দূরত্ব অত্যন্ত বেশি। এক জায়গা হইতে আর-এক জায়গায় যাইতে অনেকক্ষণ লাগে। কিন্তু তবু মনে হইল যে, এতক্ষণ দেগানার আগের স্টেশনের কাছে পৌঁছাইবার কথা।

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কিন্তু স্টেশনের কোনও কিছু দেখিতে পাইলাম না। চাঁদ পশ্চিম দিকে হেলিয়া প্রায় ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু বালির সমুদ্রে ট্রেনের কামরাগুলির আলো ছাড়া স্টেশনের কোন আভাস কোথাও নাই।

জানালা হইতে মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, আমার সঙ্গী মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিলেন, 'পৌঁছবার এত তাড়া কেন? এমন করে যাওয়াতেই তো সুখ!'

বলিলাম, 'আমাদের সুখ হতে পারে, কিন্তু ট্রেন তো যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছবে!'

এবার তাঁহার উত্তরের কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি বলিলেন, 'তারই বা কী মানে আছে?'

খানিক চুপ পরিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা করে, আপনাকে সঙ্গী করে নিই। আপনার মতো একটি ভবঘুরে লোকের সঙ্গই খুঁজছিলাম।'

বিনীতভাবে বলিলাম, 'নিলে তো আমিও সুখী হই—আমার সেটা সৌভাগ্য।'

ভদ্রলোকের কথাবার্তা ক্রমশই অদ্ভুত মনে হইতেছিল। এ কথার উত্তরে কী বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় ট্রেনের তীব্র হুইসিলের শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। রাত্রে চলন্ত ট্রেনের তীব্র হুইসিলের শব্দ সাধারণ অবস্থাতেও কী অদ্ভুত শোনায়, তাহা অনেকেরই জানা আছে। গাড়ির চাকায় অশ্রান্ত আওয়াজের উপরে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ স্বর প্রবল গতির অনুভূতিকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়া একটা আসন্ন ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত যেন বহন করিয়া আনে।

সেদিন কিন্তু বিশাল মরুপ্রান্তরের মাঝে ইঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ ঠিক আর্তনাদের মতো শুনাইতেছিল।

শব্দ আর থামে না! ট্রেনের গতিমুখ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কখনও একটু ক্ষীণ, কখনও একটু ক্ষীণ, কখনও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া সে-শব্দ অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে।

এখানে একটিমাত্র লাইনে একটি করিয়া গাড়ি যায় বলিয়া লাইন-ক্লিয়ারের গোলযোগ কখনও হয় না। তাহা হইলে এই অশ্রান্ত হুইসিলের কী প্রয়োজন? জানালার শার্সিটা আবার তুলিয়া ফেলিলাম। বাহিরের কনকনে হাওয়ার সঙ্গে ইঞ্জিনের চিৎকার যেন তীব্রতর হইয়া সত্যকার তীক্ষ্ণ ছুরিকার ফলার মতোই আমাকে বিদ্ধ করিল। পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে চাঁদের অর্ধেক সমাধি তখন হইয়া গিয়াছে। স্তিমিত আলোকে অসীম বালির সমুদ্র মনে হইল যেন মূর্চ্ছাগত হইয়া আছে; আর তাহারই ভিতর প্রকাণ্ড একটা বেগবান সরীসৃপের মতো কোন অবর্ণনীয় আতঙ্কে উন্মত্তের মতো আর্তনাদ করিতে করিতে আমাদের ট্রেন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে মনে হইল। ট্রেনের আতঙ্ক যেন সেই মুহূর্তে আমারও মনে সঞ্চারিত হইয়া গেল। অনুভব করিলাম, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! ট্রেনের আর্তনাদ যেন আমারই বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

ঘরের মধ্যে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, ভদ্রলোক তাঁহার পিঠে একটি থলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারও সমস্ত মুখভাব পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে।

আমার দিকে চাহিয়া ভীত অর্ধস্ফুটে স্বরে তিনি বলিলেন, 'আর সময় নেই, এইবেলা লাফিয়ে পড়ুন!'

pathagar.net

কেন যে সময় নাই, কীসের যে বিপদ, ভাল করিয়া বুঝিবার তখন আমার সময় নাই। আমার মনের ভিতর সমস্ত যেন ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ বিরামহীন চিৎকারে বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, শুধু গাড়ির চাকার একঘেয়ে শব্দে অনুভব করিতেছিলাম, যেন প্রতি মুহূর্ত একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার দিকে নিরুপায়ভাবে আগাইয়া চলিয়াছে!

জীবনে বিপদে কখনও পড়ি নাই এমন নয়, কিন্তু এমন আতঙ্ক অতি বড় দুঃস্বপ্নের মাঝেও কখনও অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার অন্তরের গভীরতম তলদেশ হইতে উঠিয়া বিপুল বন্যার মতো এই ভয়ের অনুভূতি আমার চেতনাকে যেন মগ্ন করিয়া দিল। শ্বাসরোধকারী একটা অন্ধকার আমার মনের চারিধারে যেন গাঢ়ভাবে ঘিরিয়া আসিতেছে—এ মুহূর্তে চেষ্টা না করিলে তাহার কবল হইতে আর অব্যাহতি মিলিবে না।

আমার সঙ্গীর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। একহাতে কামরার দরজাটা খুলিয়া ধরিয়া তিনি অঙ্গুলি-সংকেতে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'আসুন'।

তাঁহার সে ডাক যেন আমার পক্ষে অলঙ্ঘনীয় আদেশ মনে হইল। আমাকে যাইতেই হইবে। আমার সমস্ত দেহ-মন যেন তাঁহার সেই ডাক অনুসরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। আসন্ন বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইবার সে-ই একমাত্র উপায়। ট্রেন হইতে আমায় এই মুহূর্তেই লাফাইয়া পড়িতে হইবে।

জানালা দিয়া আর একবার বাহিরে চাহিলাম। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ তখন ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশ ও ধরণী গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। তাহারই ভিতর ইঞ্জিনের চুল্লির রাঙা আলো রক্তাক্ত ক্ষতের মতো দেখাইতেছিল। সেই ক্ষতের জ্বালায় অস্থির হইয়াই যেন এই বিরাট প্রাণীটি ছটফট করিয়া আতঙ্কে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিত্যকার স্টেশন, লাইন সমস্ত যেন আমরা আজ ফেলিয়া আসিয়াছি। অসীম মরুর মাঝে আমাদের ট্রেন যেন দিক ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। আর সেই আর্তনাদ—সত্যকার রক্তমাংসের জীবনের কণ্ঠ হইতেই যেন তাহা বাহির হইয়া আসিতেছে—সমস্ত অন্তর সেই অস্বাভাবিক চিৎকারে প্রতি মুহূর্তে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ ট্রেন আর খানিক বাদেই ধ্বংস হইয়া যাইবে, মনের মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গীর সহিত লাফাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার সঙ্গী দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া হঠাৎ ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আমি দরজার কাছে অগ্রসর হইলাম।

কিন্তু আতঙ্কের বন্যা চেতনাকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে বোধহয় পারে নাই; কোথায় একটু শিকড় আশ্রয় করিয়া তখনও সামান্য চেতনা বোধহয় জাগিয়া ছিল। সন্ত্রস্ত দেহ-মনে অত্যন্ত প্রবল একটি আকর্ষণ অনুভব করিলেও গাড়ি হইতে লাফাইতে পারিলাম না। দরজার হাতলে হাতটা যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করিয়া আটকাইয়া রহিল।

pathagar.net

হঠাৎ চমকিত হইয়া অনুভব করিলাম ট্রেনের হুইসিলের শব্দ থামিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে সামনের দিকে চাহিয়া একটি স্টেশনের আলো যেন দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হইল।

দরজাটা বন্ধ করিয়া বেঞ্চিতে আসিয়া বসিলাম। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছিল। এই দারুণ শীতের ভিতর সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছিল। সহসা আমার সঙ্গীর কথা মনে করিয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিকল টানিতে গেলাম—কিন্তু পারিলাম না। মাথাটা সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত ঘুরিয়া উঠিল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়া ছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞান যখন হইল তখন দেগানা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে, একটি বৃদ্ধ রাজপুত আমার গাড়িতে। তাহার দরজা খোলার শব্দেই চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, এবং বাহিরে স্টেশনের নাম দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।

দেগানা স্টেশনটি আরও ছোট। রাত্রির শেষ প্রহরে গাঢ় অন্ধকারের মাঝে একটি বাতি—তাহা স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনের প্লাটফর্মটুকুকেই আলোকিত করিয়াছে মাত্র। রাস্তার ঘটনা জানাইবার জন্য তাড়াতাড়ি স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দিকেই গেলাম।

স্টেশন-মাস্টারের অফিসে দেখিলাম স্টেশন-মাস্টার গার্ড ও ড্রাইভারকে ধমক দিতেছেন। গাড়ি নাকি দুই ঘণ্টা লেট হইয়াছে। এখন বিপরীতমুখী গাড়ির জন্য তাহাকে সাইডিঙে ফেলিতেই হইবে, এবং তাহাতে দেরি হইবে আরও বেশি।

রোজ রোজ এইরকম লেট হইতেছে এই অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া ড্রাইভার জানাইল—সে কী করিবে, আজও বাঙালিবাবু নিশ্চয়ই তাহার গাড়ি চাপিয়াছিল! কথাটার মর্ম কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না! স্টেশন-মাস্টার ক্রুদ্ধ হইয়া কী বলিতে যাইতেছিলেন—আমি আর দেরি করিতে না পারিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ট্রেনের ঘটনা বলিলাম 'এখনও ট্রলি পাঠালে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।' নিজে আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে রাজি আছি একথাও জানাইলাম। কিন্তু আমার কথার পর তাহাদের ব্যবহারে আমি অবাক হইয়া গেলাম। ড্রাইভার স্টেশন-মাস্টারের দিকে ফিরিয়া এবার অত্যন্ত গর্বভরে জিজ্ঞাসা করিল, সে যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য কি না?

স্টেশন-মাস্টারেরও রাগ দেখিলাম দূর হইয়া গিয়াছে। আমার কথায় তাহাদের ঔদালীন্য দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একটা লোক হয়তো মারাই পড়েছে, আর আপনারা তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবেন না?'

স্টেশন-মাস্টার একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সে চেষ্টা দশ বছর আগে করা উচিত ছিল বাবু, এখন আর হয় না।'

'তার মানে?'

pathagar.net

'তার মানে, দশ বৎসর আগে এ রেলের একটি ব্রাঞ্চ লাইনে একবার ট্রেন আউটলাইন হয়ে যাওয়ায় গাড়ি থেকে লাফাতে গিয়ে একজন বাঙালি বাবু মারা পড়েছিলেন। সে ব্রাঞ্চ লাইন এখন তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু লোকে বলে বাঙালি বাবু এখনও সেই লাইনে নাকি ট্রেনকে এক-একদিন চালিয়ে নিয়ে যান। এক-একদিন যে অকারণে এ লাইনের গাড়ি লেট হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্বেই চমকাইয়া উঠিয়া আমি তাঁহাকে চুপ করিতে বলিলাম! নীরব হইয়া সকলেই আমার ভীত দৃষ্টি অনুসরণ করিল। প্লাটফর্মের একটি মাত্র বাতির আলোয় একটি দীর্ঘকায় পুরুষের ছায়া আমাদের ঘরের দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে—দেখিলেই মনে হয় পিঠে তাহার একটা কিছু ভার আছে। ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতেই সে ছায়া সরিয়া গেল।

এখানেও মহাকালের পথের পথিক বুঝি তাহার নিঃসঙ্গ যাত্রার সঙ্গী খুঁজিতে আসিয়াছিল!

pathagar.net

মাঝরাতের 'কল'

যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৃথিবীকে জানি, তাদের ত্রুটি অনেক। অনেক রকম ভুল তাদের হয়। তবু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তাদের ওপর বিশ্বাস অগাধ। অগাধ বিশ্বাস আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর। এই ক-টা ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে না এলেই— আমরা অনায়াসে অনেক কিছুকে উড়িয়ে দিই। বুদ্ধি দিয়ে আমরা কঠিনভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে সব কিছুর ওপর রায় দিই। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে, যা সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি জগতের—যেখানে বুদ্ধি থই পায় না, ইন্দ্রিয় হার মেনে যায়।

সেইরকম একটা কাহিনিই আজ বলতে বসেছি।

গোড়ায় নিজের একটু পরিচয় দেওয়া ভাল। পশ্চিমের কোন একটি মাঝারি গোছের সমৃদ্ধ শহরে আমি ডাক্তারি করি! শহরের নামের কোনও প্রয়োজন এ গল্পে নেই, সুতরাং নামটা না-ই করলাম!

সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহুদূরের একটা 'কল' সেরে একলাই ফিরছিলাম। একে দারুণ শীত এ বছর, তার ওপর রাত অনেক হওয়ায় ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশি পড়েছিল। পুরু পুরু গোটা কতক গরমের জামা থাকা সত্ত্বেও সব ভেদ করে মনে হচ্ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া আমার পাঁজরার ভেতর গিয়ে ঢুকছে!

আসছিলাম আমার পুরনো মোটরে। এ মোটর আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একজন সোফার থাকলেই বুঝি ভাল হত। এই দারুণ শীতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করার চেয়ে কষ্ট আর কিছু নেই।

আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ান। বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় করে চারিধারে অনেকদূর পর্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে, কিন্তু জমাট বাঁধেনি। অনেক সময় এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জন রাস্তা ছাড়া আর কোনও যোগ নেই।

যে-রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, সেটিও অত্যন্ত নির্জন। দুধারে মাঝে মাঝে হরতুকি বা

pathagar.net

মহুয়া গাছ। আর রাস্তার দুধারে শুধু শূন্য অসমতল মাঠ। তার ভেতর বাড়ি-ঘর নেই বললেই হয়। কে বাড়ি করবে এই নির্জন জায়গায়।

অন্ধকারে অবশ্য এসব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমার মোটরের মিটমিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কোনও রকমে কেটে চলেছি।

শীতের দরুন কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলেছিলাম। আমার কার-টি পুরনো হলেও মজবুত। বেয়াড়াপনা সে করে না। আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের মধ্যে আরাম করে যে শুতে পাব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার ওপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুতগতিতে। নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে ভেতরে বসে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার আরামের কথাই ভাবছি। ডাক্তারদের মতো পরাধীন আর কেউ নয়। তবু মনে হচ্ছিল, একবার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে প্রাণের দায়ে ছাড়া শুধু পয়সার জন্যে আর আমায় কেউ বের করতে পারবে না। এখন কোনওরকমে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখস্বপ্ন আমার ভেঙে গেল। আমার একান্ত সুস্থ- সবল মোটর থেকে থেকে কেমন অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে! মোটরের এরকম আচরণের কোনও কারণই খুঁজে পেলাম না। আজ দুপুরেই আমার মোটরের ভালরকম সেবা-শুশ্রূষা হয়ে গেছে। কোনরকম রোগের আভাস তার ভেতর তখন ছিল না। হঠাৎ তার এরকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কী?

এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জন এই পথের মাঝে মোটরের এই বেয়াড়াপনায় সত্যিই ভীত হয়ে উঠলাম। এখনও প্রায় সাত আট মাইল পথ বাকি। রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কী? এই রাত্রের ডাকেও সঙ্গে লোক না আনার নির্বুদ্ধিতার জন্যে এবার নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল। সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত।

দেখতে দেখতে মোটরের আর্তনাদ আরও বেড়ে উঠল. সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। মোটর চালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু করতে পারলাম না। কাতরাতে কাতরাতে খানিক দূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে এক জায়গায় একেবারে থেমে গেল। আর তার নড়বার নাম নেই। চেষ্টার আমি তখনও ত্রুটি করলাম না, কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুটভাবে একটু কাতরোক্তি করে ওঠা ছাড়া আর কোনও সাড়া সে দিলে না।

ভয়ে, দুর্ভাবনায় সত্যিই তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মোটর ফেলে এই দারুণ শীতের মাঝে সাত-আট মাইল জনহীন পথ হেঁটে যাওয়ার কথা তো কল্পনা করা যায় না। এই মাঠের মাঝে মোটরে সারারাত কাটানও অসম্ভব! এখন উপায়!

pathagar.net

pdfbooks.net

'ডাক্তারবাবু!'

হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই জনশূন্য পথে এমন সময়ে কে ডাকলে?

আবার শুনতে পেলাম—'ডাক্তারবাবু!'

এদিক-ওদিক অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবার দেখতেও পেলাম। পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের পাশে আবছা একটি দীর্ঘ শীর্ণমূর্তি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন জায়গায় কেমন করে তার উদয় হল, বুঝতে না পারলেও সাড়া দিয়ে বললাম, 'কে তুমি?' মনে তখন আমার একটু আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। তার আবির্ভাব যেমনই বিস্ময়কর হোক-না কেন, লোকটার কাছে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা তো আছে।

লোকটা সেই জায়গা থেকেই বললে, 'আমায় চিনবেন না আপনি।'

চেনবার জন্যে আমি তখন ব্যস্ত নই, আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক তখন দরকার মাত্র। সেই কথাই আমি তাকে বলতে যাচ্ছি, এমন সময় লোকটা আবার বললে, 'আপনাকে একটু আসতে হবে, ডাক্তারবাবু! ভারী অসুখ একজনের।'

এমন সময়ে এ অনুরোধে বিরক্ত যেমন হলাম, আশ্চর্যও হলাম তেমনই। ঠিক এই সময়ে রাস্তার ঠিক এই জায়গায় রুগি কি আমার জন্যে তৈরি হয়ে বসে ছিল!

লোকটা আমার মনের কথাই যেন আঁচ করে বললে, 'এ ভগবানের দয়া, ডাক্তারবাবু! এমন সময় আপনাকে এখানে পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি, অথচ না পেলে কী বিপদই যে হত!'

বেশি কথাবার্তা তখন আর ভাল লাগছিল না। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কোথায় তোমার রুগি?'

লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর একদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করলে। সেদিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যি দূরে একটা বাড়ির আলো যেন দেখা যাচ্ছে। এরকম নির্জন প্রান্তরের মাঝে এরকম বাড়ি খুব কমই থাকে। হঠাৎ এরকম জায়গায় এমন সময়ে যাওয়াও একটু বিপজ্জনক। তবে শত্রু আমার কেউ তো নেই এবং সঙ্গে টাকাকড়িও নিতান্ত সামান্য, এই যা ভরসা!

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী অসুখ?'

উত্তর এল, 'জানি না, ডাক্তারবাবু, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গিন অবস্থা, তাড়াতাড়ি না গেলে বোধহয় বাঁচান যাবে না। দোহাই আপনার, চলুন ডাক্তারবাবু!'

কোথায় নিজের বিপদ সামলাব, না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝ-রাতে যেতে হবে পরের চিকিৎসায়। তবু ডাক্তার মানুষ—জীবন-মরণের সমস্যা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই বললাম, 'চল!'

মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটা পথ। অন্ধকারে ভাল দেখাই যায় না। তাই ধরে লোকটার পিছু পিছু মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে

pathagar.net

একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। সেইদিক দেখিয়ে লোকটা বলল, 'ওই ঘরেই রুগি বাবু, আপনি যান, আমি এখুনি আসছি!'

অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম, বাড়িটি বিশেষ সমৃদ্ধ চেহারার নয়। গুটি চার- পাঁচেক ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠোন। ঘরগুলিও সব পাকা-ছাদের নয়, দু পাশে খোলার ছাউনি।

লোকটার কথামতো সামনের ঘরে গিয়ে এবার ঢুকলাম। ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয়, তার ওপর নানান আকারের বাকস-পেঁটরায় বোঝাই বলে ভেতরে নড়বার চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প। দরজার মুখোমুখি একটি জানালা। সেই জানালার ধারে মিটমিট করে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, দরজার বাঁ ধারে একটি চারপায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন, 'এসেছেন ডাক্তারবাবু? আপনার দয়া কখনও ভুলব না, বসুন।'

ঘরের ভেতর এদিক-ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটিই মাত্র দেখতে পেলাম। জানালার কাছে চারপায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া। সেইটেই টেনে চারপায়ার কাছে বসবার উদ্যোগ করতে ভদ্রলোক আবার ক্ষীণস্বরে বললেন, 'বসুন, বসুন, ওইখানেই বসুন, আগে আমার রোগের কথা বলি, শুনুন।'

একটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম। রুগিদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বুঝলাম খানিকক্ষণ ধরে নিজের রোগ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের নানা মতামত এখন আমায় শুনতে হবে। না শুনলে নিস্তার নেই।

ক্ষীণস্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন, 'আমার রোগ কি সারাতে পারবেন, ডাক্তারবাবু? পারবেন আমাকে বাঁচাতে?'

একটু হেসে বললাম, 'সেই চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ! আর বাঁচবেন না-ই বা কেন?'

একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এল খাট থেকে—'বাঁচতেও পারি তাহলে, ডাক্তারবাবু? কেমন?'

বললাম, 'পারেন বই কী! কী তেমন আর হয়েছে আপনার?'

'না, তেমন আর কী হয়েছে!' ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন, তারপর বললেন, 'ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা, কেমন না? কিন্তু ধরুন, তাতেও যদি না বাঁচি, যদি আজ রাত্রেই মারা যাই!'

রুগির এই অর্ধোন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে কী যে বলব, কিছুই ভেবে পেলাম না। মনে মনে তখন এই বিলম্বের জন্যে অস্থির হয়ে উঠছি।

রুগি আবার বললেন, 'যদি আপনি থাকতে থাকতেই মরে যাই, ডাক্তারবাবু, কী হবে তাহলে? কে আপনার ফী দেবে?'

pathagar.net

আচ্ছা পাগল রুগির পাল্লায় তো পড়া গেছে! বললাম, 'যদি নেহাতই তাই হয়, তাহলে ফী না হয় না-ই পেলাম। আমরা শুধু ফী-র জন্যেই সব সময়ে আসি না।'

'তা বটে, তা বটে! পৃথিবীতে ভাল লোক, পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব তা হলে এখনও আছে, না ডাক্তারবাবু? কিন্তু ফী-র ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, ডাক্তারবাবু! হঠাৎ যদি মরে যাই, তাহলে ওই বাকসটি খুলে ফেলবেন, বুঝেছেন, ডাক্তারবাবু—ওই বেতের ছোট্ট বাকসটি!'

ভদ্রলোকের স্বর আরও মৃদু হয়ে এল, 'ওই বাকস থেকে আপনার প্রাপ্য টাকা নেবেন। আরও একটা জিনিস নেবেন, ডাক্তারবাবু! বলুন, নেবেন তো?'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী?'

'কিছু না, ডাক্তারবাবু, একটা কাগজ! কিন্তু ভয়ানক দরকারি কাগজ! এ কাগজ যে ওখানে আছে, শুধু আমি জানি আর আপনি এখন জানলেন। আর কেউ জানে না। জানলে আর ওখানে ওটা থাকত না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে আবার বললেন, 'এ বাড়িতে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাববেন না যেন, আমার কেউ নেই! আমার অনেক আত্মীয় আছে—ওত পেতে আছে আমার মরার অপেক্ষায়। শুধু তাদের বিশ্বাস, আজ আমি হয়তো মরব না। তাদের বিশ্বাস, মরবার আগে আর আমি কিছু করব না। তারাই পাবে সব।'

আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম—'আপনার অসুখটা সম্বন্ধে—'

'হ্যাঁ, অসুখ তো দেখবেনই, তার আগে আর একটা কথা বলে নিই—ওই কাগজটি আমার উইল, ডাক্তারবাবু। আমার ছেলের নামে উইল। সে ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম একদিন, কোথায় আছে, তাও জানি না। কিন্তু জানেনই তো রক্ত জলের চেয়ে ঘন।'

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বললাম, 'এইবার আমি দেখতে পারি?'

খাট থেকে আওয়াজ এল, 'দেখুন।'

আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রুগি নাড়ি দেখবার জন্যে হাতটা তুলে ধরলাম এবং পুরমুহূর্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতরও আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল।

সে হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা! রুগি মৃত! শুধু মৃত হলে এতখানি আতঙ্কের আমার বোধহয় কারণ থাকত না। কিন্তু ব্যাপার যে আলাদা! ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি কিছু সত্য থাকে, তা হলে এ রুগি এইমাত্র কখনই মারা যায়নি। তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে, কয়েক ঘণ্টা আগে। সমস্ত দেহ তার কঠিন।

উন্মাদের মতো আরও খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলাম। নাঃ, ভুল আমার হতেই পারে না। কিন্তু তা হলে এ ব্যাপারের অর্থ কী?

তখন কিন্তু স্থিরভাবে কোনও চিন্তা করবার আর আমার ক্ষমতা নেই। আতঙ্কে আমার বুকের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থেমে আসছে। হঠাৎ জানালার কাছে বাতিটা দপ্ দপ্ করে নেচে উঠল। সেটা একবার নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল একফোঁটাও নেই। প্রান্তরের মাঝে নিস্তব্ধ নির্জন বাড়িতে এই ভয়ংকর অবস্থায় আমি একা, এই বাতির আলোটুকুই যেন আমার একমাত্র সহায় ছিল, তাও নিভতে চলেছে দেখে আমি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, পেছনে আলোটা আর কয়েকবার নেচে নিভে গেল। তখন আমি উঠোন ছাড়িয়ে এসেছি প্রায়।

কীভাবে তারপর অন্ধকার প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মোটরে উঠেছিলাম, তা আমার মনে নেই। মোটর চালিয়ে শহরের মাঝ বরাবর আসবার পর আমার যেন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হল মোটরের এই চলা। খানিক আগে অদ্ভুতভাবে যে মোটর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ এবার বিনা চেষ্টায় আপনা হতে সে মোটর এমন শুধরে গেল কী করে?

*　　*　　*

তার পরদিন দিনের আলোয় লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে সেই প্রান্তরের মাঝকার বাড়ির নিঃসঙ্গ রুগির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাঁর ছেলেই আজকাল সমস্ত বিষয়ের মালিক।

সেদিনকার রহস্যের স্বাভাবিক মীমাংসা কিন্তু আমি এখনও করতে পারিনি।

pathagar.net

জঙ্গল-বাড়ির বউ-রানি

অনেক দিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোনও নদীর ওপর পানসি করে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়ালমতো স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক দিন থেকে মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝরাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনোহাঁসের পাখার শব্দ—সে আর মন থেকে কোনও কিছুতেই মুছে যায়নি। সে সব মধুর নামগুলোও ভুলিনি! শিলাইদহ তো পৃথিবীর কোনও জায়গা বলে মনে হয় না আমার এখনও। সে যেন কোনও রূপকথার ভৌগোলিক নাম। আমার 'ছিন্নপত্রে'র পদ্মায় তো রেলিব্রাদার্সের পাটের স্টিমার যায় না, সে পদ্মা সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর একটি— রুপো-গলানো তার জলে ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলার সে সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল, তা বলতে পারি না। কারণ নদীটা পদ্মা নয়, ধলেশ্বরী। তাতে কিন্তু এমন কিছুই এসে যায় না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপসা দেখলেই হল, ফুলে উঠলেই হল হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হল তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই খারাপ হত। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগত কাটাকাটি—মারামারি। আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে, আর স্মৃতিও জমত না মধুর করে।

আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কীসের! সেও ছোটখাট রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে বর্ষার প্লাবনে ভাঙন ধরায় লোকালয়ের কূলে। তার বুকে চর জাগে স্বপ্নের মতো, চখাচখির ডাকে তারও দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে!

মাঝারি সাইজের একটি পানসি ভাড়া করেছিলাম। মাঝি-মাল্লা, চাকর-বাকর নিয়ে সবসুদ্ধ আমরা ছ-জন মাত্র।

pathagar.net

এত লোকেরও বুঝি দরকার ছিল না। বিনা তাড়াহুড়োয় ধীরে সুস্থে যেমন খুশি ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ, তাও বড় বড় গঞ্জে কি লোকালয়ের ভিড়-করা ঘাটে নয়, শূন্য-নির্জনে তীরে তীরে, শুধু পাখির ঝাঁক-বসা চড়ার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর-সবাইয়ের ছুটি, একা চরণ বসে থাকে হালে কাঠের মূর্তির মতো। শুধু যখন মেঘনার মোহানায় গিয়ে পড়বার উপক্রম হয়, তখন স্রোতের উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদের।

'ছিন্নপত্রে'র স্বপ্নের কুয়াশা মনের মধ্যে না থাকলে পানসির জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারত! গরমিল তো কম নয়। 'ছিন্নপত্রে'র পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিত জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত—খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপরে।

প্রায় ওপরে, এইজন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক-এক সময়ে নিজের অজানতেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝরাতে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পানসির খোলে, আর মেঘ-ঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থমথম করছে, তখন মিশরের মমির মতো শুধু চরণ বসে আছে নিস্পন্দভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরসা!

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে, এ আমি আগে কখনও জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো তো সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন কী একটা অপার্থিব বিবর্ণতা! যেন অনেকদিন মাটির তলায় সে চাপা পড়ে ছিল! এই সবেমাত্র যেন উঠে এসেছে শ্যাওলা-ধরা ভিজে মাটি গা থেকে মুছে।

লোকটার ধরন-ধারণও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারী হাঁড়ির মতো গলায় শুধু একটু-আধটু 'হাঁ' 'না' ছাড়া তাকে আর কিছু বলতে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সঙ্গে তার মেলামেশাও নেই। তবু সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ করে দূরে রেখে চলে, সে কেবল তার মরা-চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও মেঘে ঢাকা ভাঙা-চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছমছম করছে।

সন্ধ্যে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিসফিস গুনগুন শুনছিলাম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে, কান-মাথা চুলকে, আমতা আমতা করে জানালে যে, আমি যদি তাদের একটা রাত ছুটি দিই, তা হলে তারা একটু ভাল যাত্রা শুনে আসে।

যাত্রা কোথায় হচ্ছে, হেসে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেইখানেই নাকি ভারী নামজাদা এক দল এসেছে। এমন যাত্রা

pathagar.net

শোনবার ভাগ্য নাকি এ তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে সে আমাকেও সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম, 'না, মাঝির পো, আমার অত শখ নেই। তবে তোমরা শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন। কিন্তু গঞ্জের ঘাটে তো আমি থাকতে পারব না।'

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে, আমায় সে কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙলেই ফিরে আসবে ভোরবেলা, কিন্তু আমার ভয় করবে না তো?

হেসে বললাম, 'তা যদি একটু করে, মন্দ কী!'

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছুই নেই। জল-ঝড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর-বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম জানি না—'চরণ মাঝি যাচ্ছে তো তোমাদের সঙ্গে?'

মাঝির মুখে 'যাচ্ছে বই কী, কর্তা' শুনে কেমন যেন আশ্বস্ত বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পানসির কামরার ছাদে উঠে গিয়ে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখনও তো হয়নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানি ঠাকুর রামসেবকও পর্যন্ত সঙ্গে গেছে হুজুগে পড়ে। দূরে কোথাও একটা- দুটো নৌকোর আলো পর্যন্ত নেই। বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ কথা ভাবতেও কেমন যেন পুলকে রোমাঞ্চ হয়!

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু পরে সেটা রইল না। রাত্রির নির্জনতা ধ্যান করতে করতে কখন বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গিয়েছে। ভাঙা-চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন যেন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কূলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারি অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখি দূর আকাশে কী রকম আর্তনাদের মতো ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোন উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে!

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এত বড় একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটল ধরা বিশাল দেওয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনও যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম এতক্ষণ জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এই পোড়ো প্রাসাদ কুয়াশায় মিশে ছিল, চাঁদ এখন তার পেছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারে দৈত্যের মতো জেগে উঠেছে। এই পোড়ো প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হল।

pathagar.net

পেছনে কী একটা ঝন্‌ঝন্‌ করে শব্দ হল যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর-একটি লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধহয় নয়।

'এ কী চরণ!' প্রায় ধরা গলায় বললাম, 'তুমি কখন ফিরলে? যাত্রা দেখলে না?'

সে শেকল-সমেত নোঙরটা তুলে পানসির ওপর রেখে গম্ভীর স্বরে বললে, 'না!'

'কিন্তু নোঙর তুললে কেন?' অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার একদম ভাল লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'দেখেছেন!'

দেখিনি, কিন্তু এইবার দেখলাম। সেদিন রাত্রিশেষে যে অদ্ভুত, অসাধারণ সব ঘটনা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছে আমার জীবনে, তখনও সে সবের মর্ম তেমন ভাল করে বোধহয় বুঝিনি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারীমূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

'কে ও? জানো নাকি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বিস্ময়ে, উত্তেজনায়।

হাল ঘুরিয়ে নৌকো সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

পাড়ে ভিড়তে-না-ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই আপনার!'

সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম, 'আমার যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করব। কিন্তু কী ব্যাপার, আমার আগে একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।'

আঁচল ঢাকা দিয়ে কী যেন একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরার চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে ভদ্রতা করে বললাম, 'ওটা বড্ড ভারী বোধহয়। আমার হাতে দিতে পারেন।'

তিনি এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ও কথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ় ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল করে দিলাম!

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধহয় একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটা অদ্ভুত আকারের বাকস বের করে আমার সামনে রেখে তিনি বললেন, 'আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমনই হয়ে গেছি!'

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভাল করে দেখলাম। চেহারায় তাঁর স্পষ্ট বড়ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা, ধরন-ধারণ যেমন তাঁর অদ্ভুত, তেমনই অদ্ভুত তাঁর

pathagar.net

পোশাক! যাই হোক, তখন সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। তাঁর কথার উত্তরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয়টা কীসের? কী আছে ওতে?'

তিনি কথা না বলে শুধু বাকসে ডালাটা এবার তুলে ধরলেন। লণ্ঠনের সেই সামান্য আলোতেই বাকসের ভেতর কুণ্ডলি পাকান একরাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হিরা-মুক্তোর জড়োয়া গয়না! তেমন গয়না আমি তো কখনও চোখে দেখিনি।

মহিলাটি মুঠো করে কয়েকটা গয়না বাকস থেকে তুলে কামরার মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, জীবন্ত ক্রূর সরীসৃপ!

দরজায় খুট করে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি, চরণ। কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মতো এসে সে দাঁড়িয়েছে! তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মতো হিংস্র লোভের ঝিলিক!

পলক ফেলতে না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম, 'তুলে ফেলুন এসব বাকসে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কী বলে এই রাতে একা বেরিয়েছেন।'

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাকসে তুলতে তুলতে তিনি বললেন, 'বেরোব না? ওরা যে এসব ছিনিয়ে নিতে চায়!'

'ওরা কারা?'

'আমার শ্বশুর-বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতে পারে! কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?'

'যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিনরাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি। আমায় সেখানে পৌঁছে দিন!'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি' বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেওয়ার জন্যে বেরোলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! চরণ যেন আগে থাকতেই সব জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকো চলছে।

বললাম, 'ক্রোশ-দুয়েক বাদে নৌকো থামিয়ে খবর নিও।'

নিশ্চলভাবে বসে থেকে সে কী যেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে। অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার আমি কামরায় ঢুকে বললাম, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতর থেকে দরজা দিয়ে দিন।'

pathagar.net

তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন, 'না, না, সে আরও ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ কী! নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন? চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি! পানসি নিজের খেয়ালে ঘুরছে?

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে-যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মতো চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কী হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে!

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চিৎকার করে বাকসটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা! আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপর। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কী রকম একটা আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থা! চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাকসটি রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে।

ধীরে ধীরে বাকসটি কায়দা করে নিয়ে চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুণ হতাশায় শেষ শক্তি সংগ্রহ করে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাকসসুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুশমনও।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড় পেয়ে আমি চিৎকরে করে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারী সেই বাকসের টানে দু জনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তাই সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। ক-টা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চিৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক নিশ্বাসে তাদের যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দু জনে ডুবেছে, সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথমে গম্ভীর হয়ে শুনে শেষে হেসে উঠল। হেসে জানালে যে, এরকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারী জিনিসই হোক, একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাত ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে দু জন না হোক, একজন তো ভেসে উঠতই। আর তা

pathagar.net

ছাড়া দু ক্রোশ কেন, এদিক-ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মতো কোনো পোড়ো বাড়িই নদীর ধারে নেই। দামি গয়নার বাকস-সমেত ওরকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম, 'তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?'

বৃদ্ধগোছের একটি মাঝি একটা ডিঙির এককোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে বললে, 'না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেননি, আমি জানি। আপনি জঙ্গল-বাড়ির বউ-রানিকে দেখেছেন।'

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম, 'জঙ্গল-বাড়ির বউ-রানি! তুমি জান তা হলে! কোথায় জঙ্গল-বাড়ি বল তো?'

খানিক চুপ করে থেকে নীচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বললে, 'ওইখানে বাবু! আজ পঞ্চাশ বছর হল জঙ্গল-বাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বউ-রানি তাঁর জ্বালা ভোলেননি। এখনও মাঝে মাঝে কারও-কারও পানসিতে এসে ওঠেন।'

জেলেরাই আমার পানসি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝিমাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম, সব না হয় স্বপ্ন, কিন্তু আমার পানসির নোঙর কে তুললে?

পানসির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার আর পানসি-বিহারে। আমি 'ছিন্নপত্র'ই পড়ব।

pathagar.net

নিশুতিপুর

নিশুতিপু-র! নি-শু-তি- পুর!

রাণু ধড়মড়িয়ে বাঙ্কের ওপর উঠে বসল। এইখানেই নামবার কথা না? সঙ্গে মালপত্র তো কিছু নেই! সুতরাং নেমে পড়লেই তো হয়। যেমনই মনে হওয়া, তেমনই বাঙ্ক থেকে কামরার মেঝেতে, আর কামরার মেঝে থেকে একেবারে প্ল্যাটফর্মে।

কী ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা! এমন অখদ্যে স্টেশন তো কখনও দেখিনি। ব্ল্যাক-আউট তো উঠে গেছে। স্টেশনে এখনও একটা আলো দিতে পারে না? দূরে যদি-বা একটা মিটমিটে আলো দেখা গেল, সেটা জ্বলে উঠেই আবার গেল নিভে।

এখন কী করা যায়? ট্রেনটাও ঠিক স্টেশনের মতোই অন্ধকার, দেখতে দেখতে সেটাও যেন অন্ধকার কুয়াশার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

কার সঙ্গে যেন রাণুর দেখা করবার কথা। কে যেন তাকে নিয়ে যেতে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় কে!

দূরে ওখানে ক-টা টিমটিমে আলোর জটলা দেখা যাচ্ছে না? ওদিকে এগিয়ে খবর নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! রাণু সেদিকেই পা বাড়াল দোনামনা হয়ে।

'এই যে!'

রাণু থমকে দাঁড়াল। গলাটা সে যেন চেনে।

'তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলাম।'

রাণু অন্ধকারে একটা ঝাপসা চেহারা দেখতে পেয়ে বললে, 'কিন্তু আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

'দাঁড়াও, আলোটা একটু জ্বালছি!'

মিটমিটে একটা ছোট্ট কুপির মতো আলো এবার জ্বলে উঠতে রাণু ছেলেটিকে দেখতে পেল। তার বয়সীই হবে। ছেলেটি লাজুকের মতো একটু হেসে বলল, 'আমি তামসকুমার।'

'তামসকুমার!'

pathagar.net

রাণুর মনে হল, তামসকুমারেরই যেন তার জন্যে স্টেশনে আসবার কথা।

তামসকুমারের সঙ্গে পরিচয়ও যেন তার অনেক দিনের। শুধু এখন সব কথা মনে পড়ছে না।

আলোটা কিন্তু ইতিমধ্যে আবার নিভে গিয়েছে। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। এ অন্ধকারে কতক্ষণ এমনই করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কোথাও যাবার উপায়ও তো নেই। পথই তো চেনা যাবে না।

'তোমার আলোটা আবার নিভে গেল নাকি?' রাণু এবার জিগ্যেস করল।

'না, নিভিয়ে দিলাম।' বলল তামসকুমার।

'নিভিয়ে দিলে!' এ আবার কী অদ্ভুত কথা! শখ করে কেউ এই অন্ধকারে থাকে নাকি! রাণু একটু বিমূঢ় হয়েই চলল, 'কেন, তেল নেই নাকি বাতিতে?'

'তেল? না, তেল একেবারে নেই এমন নয়। তবে—' তামসকুমারের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব।

'তবে কী?'

'কী তা তো তুমিও জানো ভাই।' তামসকুমার একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

বলে কী তামসকুমার! রাণু তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।—অথচ—অথচ তার যেন বোঝা উচিত, মনের ভেতর এরকম একটা সন্দেহও হচ্ছে।

যাই হোক, বোকা বলে ধরা দিতে রাণু সহজে রাজি নয়। একটু ভারিক্কিভাবেই বলল, 'তা কি আর জানি না, তবে একটু জ্বাললে দোষ কী? কেউ তো আর ধরে নিয়ে যাবে না!'

'ধরে নিয়ে যাবে না! বলো কী! আর তা হলে ধরবে কীসে?' তামসকুমার সবিস্ময়ে বলে উঠল।

না, মাথাটা একেবারে গুলিয়ে দিয়ে ছাড়লে! আলো জ্বাললে ধরে নিয়ে যায়—এ আবার কোন্ মগের মুল্লুক?

মনে যাই হোক, বাইরে নিজের চাল বজায় রাখবার জন্যে রাণু গম্ভীরভাবে বলল, 'আহা, ঠাট্টা করছিলাম, বুঝতে পারছ না? তবে যদি আলোটা একটু জ্বালতে ভাই, একটু খুঁজে নিতাম।'

'কিছু হারিয়েছে নাকি! কী খুঁজতে চাও?' তামস উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল।

'তেমন কিছু নয়, নিজের হাত-পাগুলো আছে কি না একটু খুঁজে দেখতাম।'

তামস একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ তখন একটুখানি না হয় জ্বালছি। তবে বুঝতেই তো পারছ, যতখানি পারা পায়, তেল আজ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই মুহূর্তটির জন্যে যার যত আলো সব দরকার।'

ও বাবা! ধাঁধা যে ক্রমশ আরও ঘোরাল হয়ে উঠছে।—এ আবার কোন মুহূর্তের কথা বলে! যাই হোক, আলোটা তো জ্বলুক! অন্ধকারে বুদ্ধিটাও যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে।

pathagar.net

কিন্তু আলো জ্বালা আর হয়ে উঠল না। তামসকুমার দেশলাই না চকমকি-পাথর কী একটা ঠোকবামাত্র অদূরেই লোহা-বাঁধানো জুতোর আওয়াজের সঙ্গে বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা গেল—'কৌন্ হ্যায়। বত্তি জ্বালাতা কৌন্?'

চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে তামসকুমার সেই হাঁক শুনেই রাণুকে এক হেঁচকা টান দিয়ে টেনে দৌড়।

হোঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়ে অনেকদূর গিয়ে যখন সে থামল তখন দুজনেই বেশ হাঁফাচ্ছে।

'আর একটু হলেই ধরে ফেলেছিল আর কী!' তামস বলল।

চালাক সেজে থাকা বুঝি আর চলে না। তবু কায়দা করে ব্যাপারটা জানবার ফিকিরে রাণু একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলল, 'ধরে ফেলত! ধরে আর করত কী?'

'ধরে আর কী করত!' তামসকুমার সত্যি যেন স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তুমি কি সব ভুলে গেছ নাকি? ধরলে জেলে পুরে দিত না! আমার কি আলোর লাইসেন্স আছে?'

'আলোর লাইসেন্স?' রাণুর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই কথাটা বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আলোর লাইসেন্স নেবার মতো টাকা আমার কোথায়! এ তো আমার চোরাই আলো।'

রাণুর মুখ দিয়ে এবার আর কোনও কথা বেরোল না—সে সত্যি তাজ্জব বনে গেছে।

তামসকুমারই আবার বলল, 'শুধু আজকের জন্যে, কত কষ্টে যে এই চোরাই আলো জোগাড় করেছি, কী বলব!'

'কিন্তু আজকে—' রাণু কথাটা ইচ্ছা করেই শেষ করল না। এখনও সে একেবারে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়।

'বাঃ, আজকেই তো শ্রাবণের অমাবস্যা—মহামহিমের অভিষেক তিথি তো আজই।'

'ওঃ, তাও তো বটে! ভুলেই গেছলাম।' নিজের মর্যাদা রাণু এখনও বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

'সেই কথাটাই ভুলে গেছলে? তাহলে এসেছ কী করতে?' তামসকুমার বেশ যেন ক্ষুণ্ণ।

কী করতে এসেছে তা কি ছাই সে নিজেই জানে! কিন্তু এসে যখন পড়েছে ব্যাপারটা না বুঝে সে যাবে না। আপাতত কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে রাণু বলল, 'আচ্ছা, আমারও তো চোরাই আলো একটা হলে হত। কোথায় এখন পাওয়া যায়, বল তো!'

তামস এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'চোরাই আলো চাই? তা বলোনি কেন এতক্ষণ?' চোরাই আলোর অনেক আড্ডা আছে। তবে পুথি-পাড়াতে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধে।'

pathagar.net

pathagar.n

'কেন?' রাণু সোজাসুজি এবার জিগ্যেস করে ফেলল।

'ওদের আলো ভারী মজার। ফুঁ দিয়ে নেভে না, জলে ডোবালেও জেগে থাকে। আর লুকিয়ে নিয়ে বেড়াবার ভারী সুবিধে। চৌকিদাররা সহজেই চিনতে পারে না। তাছাড়া ও আলোর কখনও ক্ষয় নেই। বিনা তেলেই যুগযুগান্ত জ্বলে। চল, ওই পাড়াতেই যাই।' তামস রাণুর হাত ধরে এগিয়ে চলল।

দু পাশে আবছা সব বাড়ি অমাবস্যার অন্ধকারে যেন বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে! কোনওটা একেবারে অন্ধকার, কোনওটার বদ্ধ জানলার ভেতর দিয়ে অতি ক্ষীণ একটু আলোর রেখা যেন ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে।

এই অন্ধকারের ভেতর রাস্তার একটা মোড় ঘুরে হঠাৎ দূরে এক প্রকাণ্ড উজ্জ্বল ঝলমলে বাড়ি দেখে রাণু একবারে অবাক হয়ে গেল।

'ওটা কী?'

'বাঃ, ওঠাই তো জেলখানা। এতদিন যেখানে যে কেউ বে-আইনি আলো জ্বেলেছে, সকলের হয়ে আলো জ্বালবার অধিকারের জন্যে যারা লড়াই করেছে, সবাই ওই জেলখানায় বন্দী। সারা বছর ওরা নীরবে সব সয়ে যায়, শুধু বছরে এই একটিবার ওরা বিদ্রোহ করে। ও তো ওদের বিদ্রোহেরই আলো! দেখতে পাচ্ছ না, এরই মধ্যে জমাদারেরা সব নিভিয়ে ফেলছে। ও আলোর দিকে চাওয়াও যে অপরাধ।'

সত্যি! দেখতে দেখতে সে আলো নিভে গেল। আবার সেই জমাট অন্ধকার।

পুঁথি-পাড়ার দিকে বেশি দূর কিন্তু আর তাদের যেতে হল না। রাস্তার ধারে হঠাৎ একটা আলো তারা কুড়িয়ে পেল।

তামসকুমার তার হাতে আলোটা তুলে দিতে রাণু অবাক হয়ে বলল, 'এ আলো এখানে এমনভাবে পড়ে ছিল কী করে?'

'হয়তো কেউ ধরা পড়ার ভয়ে ফেলে গেছে, কিংবা কেউ হয়তো আমাদের মতো কারও হাতে পড়বার আশাতেই এ আলো এখানে রেখে গেছে। নিজের জীবন দিয়ে কতজন এমন আলোর আয়োজন করে রেখে যায় ভবিষ্যতের জন্যে।'

তামসের কথা শেষ হতে না হতেই দূরে মাঝ রাতের প্রহর বাজছে শোনা গেল। যেখানে যা সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল সব এবার একেবারে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। সঙ্গে সঙ্গে কাছেই কোথায় অশরীরী কণ্ঠে না বেতারে, বজ্রগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল—'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়, যিনি আদি, যিনি অনন্ত, যিনি শাশ্বত, সেই তিমিরেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি।'

'হে আমার নিশুতিপুরের ভক্ত প্রজাবৃন্দ—'

রাণু ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জিগ্যেস করল, 'এ আবার কী ভাই?'

এই স্বর শুনেই তামসকুমার কী রকম যেন হয়ে গেছে।

কেমন যেন অভিভূতভাবে সে বলল, 'চুপ চুপ! মহামহিমের আহ্বান—বুঝতে পারছ না।'

pathagar.net

রাণু হতভম্ব হয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল। মহামহিম তখন বলে যাচ্ছেন—'আমার অভিষেক-তিথির এই সাংবাৎসরিক উৎসবে তিমিরেশ্বরের পদতলে দাঁড়িয়ে সেই কথাই আবার আমি তোমাদের জানাই—আলোক আমাদের পরম শত্রু, আমাদের জীবনের অভিশাপ। সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত বিপ্লব বিপর্যয়ের মূল—এই আলো। যার চোখ একবার আলোর স্পর্শ পেয়েছে, সমস্ত জীবন তার অভিশপ্ত—দেহ-মন তার চিরদিনের মতো বিষাক্ত, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আলোর তৃষ্ণায় জীবনে কোনওদিন সে আর শান্তি পায় না। আলোক-পিপাসার এই সংক্রামক ব্যাধি অন্যের মধ্যেও সে ছড়িয়ে দেয়।

আলোকের এই অমঙ্গল থেকে চিরদিন আমি তোমাদের রক্ষা করে এসেছি, চিরদিন রক্ষা করব। এখনও এদেশ সম্পূর্ণ নিরালোক করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু ভ্রান্ত, ধর্মভ্রষ্ট, সমাজদ্রোহী যে সমস্ত পাষণ্ড আলোকের মাদকতার দ্বারা ভুলিয়ে এই পরম শান্তি ও সুখের রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করতে চায়, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে কোনওদিন আমি ত্রুটি করিনি। আমাদের একমাত্র উপাস্য, তিমিরেশ্বরকে প্রণাম করে আবার আমি বলি, চির-স্নিগ্ধ, চিরমধুর, চির-কল্যাণময় অন্ধকার আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখুক, এ রাজ্য থেকে সমস্ত আলো নির্বাপিত হয়ে যাক।'

'জয়, তিমিরেশ্বরের জয়!'

'জয় তিমিরেশ্বরের জয়!' বলে হঠাৎ তামসকুমারকে তার হাতের আলোটা ফেলে দিতে দেখে রাণু অবাক হয়ে বলে উঠল, 'ও কী করছ কী?'

তামসকুমার কাতরভাবে বলে উঠল, 'না, না, আমি পাপী, আমি পাষণ্ড। হে তিমিরেশ্বর, আমার অপরাধ তুমি মার্জনা কর।'

তামসকুমার সেইখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর কী! তার ঘাড় ধরে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাণু বলল, 'দেখতে পাচ্ছ, ওদিক দিয়ে কারা আসছে?'

'কারা আসছে?' তামস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অবাক হয়ে বলল, 'সত্যিই তো, ওই তো বিদ্রোহী আলোর মিছিল চলেছে পাহাড়ের ওপর তিমিরেশ্বরের মন্দিরে। অন্ধকার যাঁর চিরদিনের আবরণ সেই আদর্শনীয় মহামহিমকে ওরা স্বচক্ষে দেখবে। নিজের মুখে তাঁকে জানাবে নিজেদের নিবেদন।'

ফেলে-দেওয়া আলোটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে আবার বলল, 'কিছু মনে কোর না ভাই, কিছুক্ষণ কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে গেছলাম। মহামহিমের স্বর শুনলেই কেমন যেন আমার সমস্ত দেহমন অবশ হয়ে যায়। কিন্তু আর ভয় নেই—এই মিছিলে যোগ দিতেই তো আমরা এসেছি, চল!'

তারা কয়েক পা যেতে-না-যেতেই কিন্তু চারিদিকে ভয়ংকর কাণ্ড বেধে গেল। কোথা থেকে যমদূতের মতো বিশাল মিশ্‌মিশে কালো সব প্রহরী এসে আলোর মিছিলের ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব দল। একে একে সবাই বুঝি বন্দি হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত আলো যাচ্ছে নিভে।

pathagar.net

রাণুর শরীরের ভেতর দিয়ে যেন একটা আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠল। মিছিলের একজনের হাত থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে তামসকে টানতে টানতে ঝড়ের বেগে সে সমস্ত প্রহরীদের এড়িয়ে একেবারে সেই তিমিরেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে থামল।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। কিন্তু রাণুর আর তামসকুমারের গায়ে এখন যেন শত হস্তীর বল। দুজনের ধাক্কায় মন্দিরের দরজা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। মশাল হাতে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে এদিক ওদিক চারিদিকে ব্যাকুল চোখ বুলিয়ে তারা অবাক। কোথায় বা তিমিরেশ্বরের মূর্তি, কোথায় বা মহামহিম! তাদের কোনও চিহ্নই নেই। শুধু কয়েকটা ধেড়ে ইঁদুর আলো দেখে সভয়ে চারিদিকে দুড়-দাড় করে ছুটে পালাল।

হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে তারা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। আমসির মতো শুকনো আর কোলা ব্যাঙের মতো ধুমসো গুটি পাঁচেক লোক একদিকে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপছে। তাদের কারও কাছে মুখে দিয়ে চেঁচাবার চোং, কারও হাতে পূজোর ঘণ্টা, কারও বা বাটখারা, কারও বা গায়ে শ্যামলা, কারও মাথায় ঝলমলে জরির পাগড়ি। রাণু আর তামসকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা কাঁপতে কাঁপতে চাদর সরিয়ে বেরিয়ে এসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'দোহাই বাবা, আমাদের প্রাণে মের না, তোমরা যত খুশি আলো জ্বাল, আর আমরা কিছু বলব না। যত তেল লাগে কেনা দামে তোমাদের দেব!'

'ও, তোমরাই তা হলে এতদিন ফাঁকি দিয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এসেছ! আচ্ছা, দাঁড়াও!'

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই যমদূতের মতো সেই সব প্রহরীরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে তাদের জাপটে ধরল। একজন রাণুর হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়ে মন্দিরের জানলা দিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্যেরা তখন পিছমোড়া করে তাদের বাঁধছে।

রাণু প্রাণপণে তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে উঠল, 'বুজরুকি, তোমাদের সব বুজরুকি আমি ফাঁস করে দেব।'

হঠাৎ নীচে থেকে তাকে নাড়া দিয়ে মামাবাবু বললেন, 'আরে পড়ে যাবি যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কুস্তি করছিস?'

রাণু ধড়মড় করে ওপরের বাঙ্কে উঠে বসল। আরে—কোথায় নিশুতিপুর, কোথায় তিমিরেশ্বর, আর কোথায় মহামহিম! সে তো মামাবাবুর সঙ্গে ট্রেনে মধুপুর যাচ্ছে।

কিন্তু নীচে ডানদিকের বেঞ্চিতে ওই চিমসে রোগা আর ধুমসো মোটা লোক দুটিকে চেনা-চেনা লাগছে না!

তিমিরেশ্বরের মন্দিরে এদেরই দেখেছিল না কি?

pathagar.net

ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ

সুনীল সেদিন বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে ফিরেছে। চিরকালই সে ডানপিটে, তার ওপর বিজ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে দেখবার পর ভয়-ডর তার আর কিছু থাকবার কথা নয়। তবু এখনও ব্রহ্মদৈত্যের মাঠের কথা শুনলে সে শিউরে ওঠে।

কেন যে ওঠে, সেই গল্পই আজ তার কাছে যেমন শুনেছি, বলব।

সুনীল বলে—

আমাদের শহরতলির ভেতর দিয়ে যে লম্বা সিধে সড়কটা নদীর ধার পর্যন্ত গেছে, তার দক্ষিণ পাশে ছিল ব্রহ্মদৈত্যের মাঠ। প্রকাণ্ড পতিত জমি। তাতে না ছিল মানুষের বসতি, না ছিল গাছপালা। শুধু শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করত।

এমন শূন্য মাঠ হয়তো অনেক জায়গাতেই আছে, কিন্তু এ মাঠের ভারী বদনাম ছিল। সে বদনামটা যে কী, আমরা ভাল করে কেউ জানতাম না। তবু দিন-দুপুরেও সে মাঠের পাশ দিয়ে যেতে আমাদের গা ছমছম করত। নানারকম কথাই সে মাঠ সম্বন্ধে শোনা যেত। কোন্‌টা যে সত্যি, তা আমরা বুঝতে পারতাম না। কেউ বলত যে, সে মাঠ নাকি কোন মানুষের পার হওয়ার সাধ্যি নেই। সে দুঃসাহস করতে গিয়ে কত লোক নাকি আশ্চর্যভাবে মাঠের মাঝখানে দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার কোথাও কোথাও শোনা যেত যে, সে মাঠে গভীর রাতে লাল আলখাল্লা-পরা এক দীর্ঘদেহ বুড়ো লোক ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার দুর্ভাগ্য যার হয়, তার নাকি আর রক্ষে নেই। এমনই সব নানান গুজব শুনে এই মাঠ সম্বন্ধে আমাদের ভয়ের আর সীমা ছিল না। নদীর ধারে নবাবগঞ্জে আমাদের স্কুল। সড়ক দিয়ে না গিয়ে এই মাঠ পার হয়ে গেলে অনেকটা সময়ের সুসারও হত। কিন্তু অত্যন্ত লেট হয়ে গেলে মাস্টারমশাইদের রক্তচক্ষু স্মরণ করেও আমরা সে মাঠ পার হয়ে যাওয়ার সাহস সংগ্রহ করতে পারতাম না।

এই ভয়ংকর মাঠই কিন্তু একদিন হঠাৎ আমাদের তীর্থস্থান হয়ে উঠল।

pathagar.net

একদিন সকালে উঠে হঠাৎ চমকে শুনলাম, বাড়ির ধার দিয়ে ছ্যাকরাগাড়িতে ব্যান্ড বাজিয়ে সার্কাসের দল চলেছে। অনেক রকম বাজনাই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু ছেলেবেলায় যে ছ্যাকরাগাড়িতে সার্কাসের প্ল্যাকার্ড টাঙান থাকে এবং যার ভেতর থেকে পৃথিবীর দাতাশ্রেষ্ঠ দাতা অমন হ্যান্ডবিল বিলি করে যায়, তার ব্যান্ডের মতো মধুর বাজনা আর কোন কিছুই বোধ হয় নেই।

অনেক কাকুতি-মিনতি করে ছ্যাকরাগাড়ির পেছনে পেছনে বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ে একটা হ্যান্ডবিল জোগাড় করে পড়ে জানলুম যে, আমাদের শহরে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বিশ্বম্ভর সার্কাস আমেরিকায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার আগে অনুগ্রহ করে কয়েকদিনের জন্যে খেলা দেখিয়ে যাবে।

প্রবেশ-মূল্য সবচেয়ে কম দেখলাম চার আনার এবং তারই সঙ্গে 'বিলম্বে হতাশ হইবেন' এই সতর্কবাণী পড়ে ঠিক করলাম, যেমন করেই হোক এ সার্কাস দেখতেই হবে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই হ্যান্ডবিলের বাকিটা পড়ে মন একেবারে দমে গেল। দেখলাম, সার্কাস হবে এই মাঠে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখবার লোভেও এই মাঠে যেতে মন সরছিল না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোভেরই জয় হল। ভাবলাম শহরসুদ্ধু লোক তো যাবে, তবে ভয় কীসের!

বাড়িতে কাউকে অবশ্য জানালাম না। জানালে আর রক্ষে থাকত না। খেলা হবে দু বার, সন্ধ্যায় আর রাত ন-টায়। কিন্তু নানান ফন্দি-ফিকির করেও বাড়ির গুরুজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে সন্ধ্যার খেলায় যেতে পারতাম না। ন-টার খেলা দেখতে যাওয়ার জন্যে বেশি সাহস দরকার, কিন্তু সুবিধে অনেক। মনে মনে সেই সংকল্পই করলাম। আমাদের শোবার ঘরটা একেবারে বাড়ির একধারে। কোনও রকমে তাড়াতাড়ি পড়াশুনো সেরে সেদিন মাথাধরার নাম করে শুয়ে পড়লাম। এ ঘরে বড় দাদা ছাড়া আর কেউ শোয় না। তিনিও অনেক রাত্রে এসে একেবারে কোনও দিকে না চেয়ে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। মাকে বললাম— মাথা ধরার জন্যে চোখে আলো সহ্য হচ্ছে না। মাও সরল বিশ্বাসে আলোটা সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আর আমায় পায় কে? মশারিটা ভাল বেশ করে চারধারে গুঁজে দিয়ে জানালা বেয়ে একেবারে পথে। এই মাঠের নামে যেটুকু ভয় ছিল, সার্কাসের কাছে পৌঁছে লোকের ভিড়, আলো ও আয়োজনের ঘটায় সে কোথায় যে উবে গেল, তার পাত্তাই পেলাম না। এ যেন সে-মাঠই নয়। রাতারাতি আলাদিনের প্রদীপ থেকে যেন তার ওপর এক মায়ানগর বানিয়ে দিয়েছে কে!

কী আশা-আকাঙ্ক্ষা-কৌতূহল নিয়ে যে লম্বা গ্যালারির সকলের চেয়ে উঁচু বেঞ্চির একধারে গিয়ে বসলাম, তা বলতে পারি না। নিজের সৌভাগ্যে নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল সার্কাস আরম্ভ হওয়ার আগে হয়তো কী একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, সার্কাস দেখা আমার ভাগ্যে আর হবে না।

pathagar.net

কিন্তু নির্বিঘ্নে সার্কাস আরম্ভ হয়ে গেল।

বরাবর আমার সকাল সকাল শোয়া অভ্যাস; কিন্তু নতুন খেলার পর খেলা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখতে দেখতে ঘুম যে কোথায় উড়ে গিয়েছিল সেদিন বলতে পারি না। ক্লাউনদের ভাঁড়ামিতে হাসতে হাসতে সেদিন নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ট্রাপিজ খেলোয়াড়দের অসীম সাহস দেখে সভয়ে তারা এই বুঝি পড়ল মনে করে কতবার যে চোখ বুজলাম বলতে পারি না। জানোয়ারদের অদ্ভুত শিক্ষা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সব খেলাই ভাল—শুধু ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা একেবারে বিরক্তিকর। এক-একবার ঘোড়ার খেলা আরম্ভ হয়, আর বুঝতে পারি, কী দারুণ ঘুমে চোখ আমার জড়িয়ে এসেছে।

সার্কাস শেষ হতে তখন বোধ হয় বেশি দেরি নেই। সার্কাস-ম্যানেজার নিজে সেই একঘেয়ে ঘোড়ার খেলা শুরু করেছে। দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে। মনে মনে কখন তা শেষ হবে ভাবছি, এমন সময় মনে হল ঘোড়াগুলো যেন রিং-এর ভেতর নেই, গ্যালারিময় ছড়িয়ে পড়ে তারা অত্যন্ত সহজে কাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্তেই মনে হল আমি যেন রিং-এর মাঝখানে কেমন করে এসে পড়েছি এবং আমায় ঘিরে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়াগুলো ঘুরছে। শুধু ঘুরছে নয়, ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ তারা আমার একেবারে কাছে ঘেঁষে আসছে—আর একটু এলেই তারা একেবারে আমার গায়ের ওপর এসে পড়বে। আমি চিৎকার করে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে দেখি, অন্ধকার—চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। সাতপুরু কালো-পর্দায় চোখ ঢেকে রাখলেও বোধ হয়, চোখে এত অন্ধকার দেখা যায় না। আশে-পাশে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম, আমি সেই গ্যালারির কাঠের বেঞ্চির ওপরই কাত হয়ে শুয়ে আছি। অথচ আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই!

যে সার্কাস আলোয়, মানুষের কোলাহলে জমজমাট হয়েছিল, তার চিহ্নই কোথাও নেই। খালি অন্ধকার—আর সেই অন্ধকারে ভিজে কাঠের গুঁড়োর কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

বুঝলাম, ঘোড়ার একঘেয়ে খেলা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর কখন যে সার্কাস ভেঙে গেছে, কখন যে সমস্ত লোকজন চলে গেছে, কখন সার্কাসের লোকেরা সমস্ত বাতি-টাতি নিভিয়ে চলে গেছে, কিচ্ছুই টের পাইনি। আশ্চর্যের কথা এই যে, সার্কাসের লোকেরাও আলো নেভাবার আগে আমায় দেখতে পায়নি।

কিন্তু কেন যে পায়নি, সে কথা ভেবে এখন কোনও লাভ নেই। বিরাট তাঁবুর ভেতর অন্ধকারে আমি একলা—এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। বাইরে বোধহয় তখন ঝড় না হোক, খুব জোরে হাওয়া বইছে। সমস্ত সামিয়ানাটা সে হাওয়ায় দুলে উঠে এমন একটা অমানুষিক শব্দ হচ্ছিল যে, আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত শিউরে উঠতে লাগল।

মনে পড়ল—এই তাঁবুর বাইরেই সেই ভীষণ মাঠ। এই নিশুতি রাতে সেখানে জনমানব নেই—শুধু অন্ধকার। কিন্তু তাঁবুর ভেতরেই বা কী করে থাকা যায়। আমি হাতড়ে গ্যালারি দিয়ে নামলাম, কিন্তু কোন্ দিকে যাব? ধীরে ধীরে দু পা এগুতেই হঠ হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে দেখলাম, তাঁবুর একটা খুঁটির দড়িতে পা জড়িয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে দড়ি ছাড়িয়ে আর একটু যেতে গিয়ে আবার গোটাকতক চেয়ারে সজোরে ধাক্কা লাগল।

এবারে আর আমি থাকতে পারলাম না। সজোরে চিৎকার করে উঠলাম। সে চিৎকার-শব্দ নিস্তব্ধ তাঁবুর ভেতর এমন অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যে, মনে হল সে আমার গলার শব্দ নয়। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—কেউ সাড়া দেয় কি না দেখবার জন্যে—কিন্তু কোথায় কে?

হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল আমার অত্যন্ত নিকটে কারা যেন ফিস ফিস করে কথা কইছে। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। কাঁপা গলায় বললাম—'কে?' কোনও সাড়া নেই! তেমন ফিস ফিস শব্দ অত্যন্ত কাছে।

অত্যন্ত ভয়ের সময় মানুষের একটা সাহস যেন কোথা থেকে আসে। মরিয়া হয়ে হাত বাড়ালাম।

কিছুই নয়। দেখি একটা থামের গায়ে একটা কাগজ আঁটা ছিল, তারই খানিকটা খুলে গেছে এবং সামান্য হওয়ায় সেটা নড়ে খস খস শব্দ হচ্ছে। আমি এই শব্দটাকেই বোধহয় ফিস ফিস কথা বলে মনে করেছিলাম। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে একটু বলও পেলাম। মিথ্যে ভয় আর করব না—এ তাঁবু থেকে বেরোবার পথ আমায় বের করতেই হবে।

হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল. কাগজ ছিঁড়ে ফেলা সত্ত্বেও সেই ফিস ফিস শব্দ। এবার অপর দিকে। শুধু শব্দ নয় তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে মনে হল, যেন আগুনের মতো লাল দুটো চোখ এতক্ষণ জ্বলছিল, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। সমস্ত শরীর ভয়ে অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রাণপণে চিৎকার করে বললাম, 'তাঁবুতে কে আছ, সাড়া দাও।' তবু সমস্ত নিস্তব্ধ।

এই নিশুতি রাতে অন্ধকারে এই তাঁবুর ভেতর কী যে করব, কোথায় যে যাব, ভেবে না পেয়ে ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল।

গ্যালারির বেঞ্চি ধরে এবার বেরোবার পথ খোঁজবার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম যেখানে বেঞ্চি শেষ হয়েছে, সেইখানেই নিশ্চয় পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু, আশ্চর্য! বেঞ্চি ধরে ধরে যতদূর যাই, কোথাও তা আর শেষ হতে চায় না। মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি এমনই ঘুরছি, তবু বেঞ্চির আর শেষ নেই।

ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছিল না। হতাশ হয়ে অন্ধকারে বসে পড়লাম। তখন

pathagar.net

pathagar.net

সত্যি ভয়ে-ভাবনায় আমি কেঁদে ফেলেছি। কিন্তু সেখানে কাঁদলে শুনছে কে? জেনে নিজেই চুপ করলাম। এবার মনে হল কে যেন সার্কাসের ভেতর চলে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্।

ডাকলাম, 'কে?'

পায়ের শব্দ সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল। কিন্তু খানিক বাদেই শুনলাম দূরে আবার সেই পায়ের শব্দ।

আবার ডাকলাম, 'কে?' কোনও উত্তর নেই। মনে হল একটা যদি আলো থাকত এ সময়ে। আমার মনে আলোর কথা উঠতে না উঠতে আশ্চর্য হয়ে দেখি, সার্কাসের মাঝখানে একটা আলো জ্বলে উঠেছে। সে আলোয় সমস্ত সার্কাস অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শূন্য গ্যালারি, শূন্য সমস্ত চেয়ার, শুধু একলা আমি সার্কাসের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

না, একলা তো আমি নই। আমার মুখোমুখি ওধারের গ্যালারিতে একটা লোক মাথা নিচু করে বসে আছে যে। আনন্দে বুকটা লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে ডাকলাম, 'শুনুন মশাই!' লোকটা তবু মাথা তুলল না দেখে ভাবলাম, হয়তো অন্যমনস্ক আছে বলে শুনতে পায়নি। ছুটতে ছুটতে তার কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'শুনুন।'

লোকটা এবার মুখ তুলে তাকাল। প্রথমে তার চাউনিটা অদ্ভুত মনে হল। কিন্তু খানিক আমার দিকে চেয়ে থেকেই সে হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'অ্যাঁ, তুমি এসেছ? তোমার জন্যেই বসে ছিলাম।'

এ আবার কী বলে? হয়তো ভুল করেছে, ভেবে বললাম, 'আমি সার্কাসের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখন বাড়ি যেতে পারছি না।'

লোকটা আবার হো হো করে বিকটভাবে হেসে উঠে বললে, 'বাড়ি যেতে পারছ না? বোসো, বাড়ি যাবে কী? কতদিন ধরে তোমায় খেলা দেখাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, আমার খেলা দেখে যাও।'

তার চোখ দেখে সভয়ে দু হাত পেছিয়ে এলাম। এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল। বুঝলাম, তার হাত ছাড়ান সহজে সম্ভব নয়।

ভয়ের ভেতরও বুদ্ধি করে এই পাগলকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললাম, 'তোমার খেলা তো এই খানিক আগেই দেখলাম। আমায় পথ দেখিয়ে দাও।'

লোকটা মাথা নেড়ে বললে, 'উঁ হুঁ, আমার খেলা দেখনি। ওরা কি আর আমায় খেলা দেখাতে দেয়। দাঁড়াও, চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখো।'

তারপর আর বাক্যব্যয় না করে লোকটা একটা ঝোলান দড়ি বেয়ে সটান ওপরে উঠে গেল। বহু উচ্চে সামিয়ানার মাথা থেকে একটা ট্রাপিজ ঝোলান ছিল। লোকটা দড়ি বেয়ে সেই ট্রাপিজে গিয়ে উঠল। তারপর দেখি ভয়ংকর দোলা। নীচের দিকে মাথা

pathagar.net

করে ট্রাপিজ দুলিয়ে একেবারে সার্কাসের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকটা সবেগে দোল খেতে খেতে নানারকম কসরত দেখাতে লাগল। এ-লোকটা কী রকম পাগল বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়। হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যা ভাবলে এখনও হৃৎকম্প হয়। ট্রাপিজের দড়ি সহসা ছিঁড়ে গেল এবং সেই তাঁবুর মাথা থেকে লোকটা ছিটকে গ্যালারির একধারে চিৎকার করে পড়ে গেল। আতঙ্কে চিৎকার করে আমিও সেই দিকে ছুটে গেলাম। মনে হল, গ্যালারির কাঠের ওপর পড়ে লোকটার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা অক্ষত শরীরে সেই বেঞ্চির ওপর বসে আছে। না, অক্ষত শরীর ঠিক তো নয়! তার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। তার মুখের নীচের দিকটা—একবার সেই গলা থেকে ওপরের মাড়ি পর্যন্ত একেবারে ফাঁক। চিবুকবিহীন মুখে লোকটার দাঁতগুলো বিকটভাবে বেরিয়ে আছে। আমার ভয় দেখে লোকটা হাত বাড়িয়ে একটা কী কুড়িয়ে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে বললে, 'নাও, এবার হয়েছে তো। ওটা আমার কেবলই খসে যায়, সেই যে ত্রিশ বছর আগে খসে গেছে এখনও জোড়া লাগল না।'

তার মুখ দেখি আবার জোড়া লেগে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাভাবিকই হোক আর অস্বাভাবিকই হোক আমার দেখবার সাহস আর ছিল না। কোনও দিকে না চেয়ে আলো থাকতে থাকতে প্রাণপণে ছুটে আমি সার্কাসের একটি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু বেরোলে কী হয়! সার্কাসে যদি বা আলো ছিল, এখানে দারুণ অন্ধকার। এই অন্ধকারে এই মাঠ পেরিয়ে কোন্ দিক দিয়ে বাড়ি যাব, ভেবে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় অত্যন্ত কাছে কার গলার আওয়াজ পেলাম, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ হতভাগা? আমি এই অন্ধকারে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি। চ, বাড়ি চ।'

ও মা। এ যে বড়দার গলা!

আমার পলায়ন তা হলে তো জানাজানি হয়ে গেছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তার জন্যে যথেষ্ট বকুনি ও মার খেতে হবে। জেনেও কিন্তু তখন আনন্দে আমার গলা ধরে এসেছিল। শুধু বললাম, 'চল, দাদা।'

অন্ধকার পথে দাদা আগে আর আমি পিছে কতক্ষণ যে চলেছি বলতে পারি না। সামনে একটা উঁচু পুকুরের পাড়ে দাদাকে উঠতে দেখে বললাম, 'দাদা, এ কোথায় এলে? এ পথ তো নয়!'

'হ্যাঁ, এই পথ।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ তো দাদার কণ্ঠস্বর নয়। এবার অন্ধকারের ভেতরেও দেখতে পেলাম—সামনে যে দাঁড়িয়ে তার দীর্ঘদেহ রাঙা একটা আলখাল্লায় ঢাকা।

pathagar.net

মাথায় তার লম্বা গোল টুপি, ধীরে ধীরে সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার আগেই আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম।

সকালে চোখে আলো লেগে যখন জ্ঞান হল তখন দেখি—প্রকাণ্ড একটা দিঘির উঁচু পাড়ের ওপর আমি শুয়ে আছি। অজ্ঞান অবস্থায় আর একটু হলেই গড়িয়ে একেবারে দিঘির অতল জলে তলিয়ে যেতে পারতাম। যাইনি, এই আশ্চর্য। এ দিঘি আমি চিনি। এই মাঠের একেবারে এক প্রান্তে, যেখানে সার্কাস, তার প্রায় এক ক্রোশ দূরে এর অবস্থান। রাতে যা যা দেখেছি, তা যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে কেমন করে যে এত দূরে এসে পড়লাম, বোঝা শক্ত। যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন বেলা ন-টা। আমার অবস্থা দেখে মা বললেন, 'হ্যাঁরে, ভোরে উঠেই কোথায় গিয়েছিলি বল তো? সর্বাঙ্গে কাদা-ধুলো!'

বুঝলাম আমার পালানটা মোটেই ধরা পড়েনি। কিন্তু মনে হল পড়লেই ভাল ছিল।

pathagar.net

করাল কর্কট

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কম্বোজের পূর্ব উপকূলে একটি অসাধারণ রহস্যময় ব্যাপার ঘটে।

কম্বোজের পুরনো সরকারি দপ্তরে তার উল্লেখ আছে কিন্তু কোনও বিস্তৃত বিবরণ নেই।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কম্বোজের পূর্ব উপকূলে ভয়ানক জলদস্যুর উৎপাত আরম্ভ হয়। কম্বোজের জল-পুলিশ, নৌ-সেনা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের দমন করতে পারে না। দমন করা দূরে থাক—তাদের সন্ধান পর্যন্ত পায় না।

কোথা থেকে সিন্ধু-শকুনের মতো এই জলদস্যুদের বেগবান সুলুপগুলি এসে বড় বড় বাণিজ্য-তরীর ধনসম্পদ যে লুটে নিয়ে যেত, কম্বোজের যুদ্ধতরীগুলি কিছুই বুঝে উঠতে পারত না। কম্বোজের সমস্ত করা পাহারা এড়িয়ে রাজকর্মচারীদের চোখে ধূলি দিয়ে এই জলদস্যুর দল এমন অনায়াসে তাদের কাজ হাসিল করে যেত যে, শেষে তারা মানুষ নয় এমনই একটা জনপ্রবাদ সমস্ত কম্বোজের অশিক্ষিত মাঝিমাল্লার ভেতর রটে গেল।

বাণিজ্যতরীর জন্য মাঝিমাল্লা পাওয়া ক্রমে দুষ্কর হয়ে উঠল। তারা মানুষের বিরুদ্ধে লড়ে জান দিতে প্রস্তুত, কিন্তু দেবতার বিরুদ্ধে তারা কী করতে পারে এই হল তাদের বুলি। পূর্ব উপকূলের ব্যবসা-বাণিজ্য এক রকম বন্ধ। উপরওয়ালাদের তাড়া খেয়ে পুলিশ ও নৌ-সেনা মরিয়া হয়ে জলদস্যু দমনে লেগে গেল। কিন্তু কিছুই হল না। কম্বোজের পূর্ব উপকূলে দস্যুদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণই রইল। জলদস্যুরা যে মানুষ নয় এই জনরব এই সব ব্যাপারে আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

পঞ্চাশ বছর বাদে কম্বোজে এখনও সে প্রবাদ লোকের মুখে শোনা যায়। তার কারণও আছে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাইগনের কাছে একটি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত মশলা বোঝাই প্রকাণ্ড স্টিমার লুঠ হয়ে যায়। কম্বোজে সেই প্রথম স্টিমার—যদিও সেকেলে কিন্তু সাধারণ সুলুপের চেয়ে অনেক বড়। এই স্টিমার লুঠ হওয়ার পর সেখানকার সদাগর মহলে

pathagar.net

রীতিমতো বিভীষিকা দেখা দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই স্টিমারই জলদস্যুদের শেষ লুট। তারপর কম্বোজের প্রান্ত থেকে তারা যেন জাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে যায়। যাদের দাপটে সারা সমুদ্র একদিন থরহরি কম্পিত হত, হঠাৎ তারা কেন এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্তর্ধান হতে পারে এ রহস্যের কোনও মীমাংসা হয় না। এরপর জলদস্যুদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি কিংবদন্তি রটা আশ্চর্য মোটেই নয়।

কম্বোজের সরকারি দপ্তরে এই রহস্যময় ব্যাপারের উল্লেখ আছে, কিন্তু কেমন করে তারা লোপ হয়ে গেল, এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

যে সমস্যার কথাই কখনও শুনিনি, সুদূর বাঙলা দেশের একটি শহরে বসে তার সমাধান জানতে পারব একথা কে ভেবেছিল! যে রকম সামান্য ব্যাপারের ভেতর দিয়ে এই রহস্যের কথা জানতে পারি তা ভাবলে এখন বিস্ময় লাগে।

সুধীরদের বাড়ি সেদিন সকালে নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণ এমন তাদের বাড়ি প্রায়ই হয়, কিন্তু সেদিন একটি বিশেষ উপলক্ষ্যও ছিল।

সুধীরের জ্যোঠামশাই সুদূর সুমাত্রায় ডাক্তারি করতেন, বহুদিন বাদে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন—সেই উপলক্ষ্যেই খাওয়ার আয়োজন।

এ কয়দিন স্কুলে ও স্কুলের বাইরে সুধীরের মুখে তার জ্যোঠামশায়ের কথা ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এমন কী অসাধারণত্ব থাকতে পারে যাতে চোদ্দ বছরের কিশোরের মন মুগ্ধ হয়ে যায় এতদিন বুঝতে পারিনি। কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে দেখামাত্র সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। বৃদ্ধ সত্যই অসাধারণ। প্রথমত বাঙালির ভেতর অমন চেহারাই দুর্লভ। সত্তর বৎসর বয়স যে তাঁর হয়েছে একথা তিনি নিজে না বললে বিশ্বাস করাই কঠিন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে বয়সের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু বার্ধক্যের জীর্ণতার পরিচয় নেই। গাম্ভীর্য দূরে থাক, মুখে বালকের কৌতুকের হাসিটি লেগেই আছে। ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজে মিশে যাবার দেখলাম তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।

তাঁর জীবনের বিবরণ যা শুনলাম তাও অদ্ভুত। অত্যন্ত ডানপিটে দুরন্ত ছিলেন ছেলেবেলায়। সেজন্যে তাঁকে নানারকম শাস্তি ঘরে-বাইরে সহ্য করতে হয়েছে। স্কুল থেকে একবার কী কারণে বিতাড়িত হয়ে তিনি আর লজ্জায় বাড়ি ফেরেন না। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর খবর না পেয়ে সকলে তাঁর জীবনের আশা পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল। অবশেষে একদিন বিলাতের ডাকে তাঁর বাবার নামে একটি চিঠি এসে হাজির। চিঠি খুলে তিনি তো অবাক। যে ছেলে স্কুলে কোনও রকমে প্রমোশন পাবে কি না বছরের শেষে সেই দুশ্চিন্তায় তাঁকে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটাতে হত, বিলাত গিয়ে সে সেখানকার প্রবেশিকার বেড়া উৎরে একেবারে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। শুধু ভর্তি হয়নি, সেখানে পড়াশুনায় দস্তুর মতো কৃতিত্ব দেখিয়ে সে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।

pathagar.net

তারপর সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে সসম্মানে পাস হয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ঘরে বসে থাকা তাঁর ধাতে সইবে কেন। কিছুদিন বাদেই সুমাত্রার কাছে একটি বড় হাসপাতালের ভার পেয়ে তিনি আবার সাগরে পাড়ি দেন।

সেই বিদেশেই তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি দেশে শেষ জীবন কাটাবার জন্যে ফিরেছেন।

এই বিবরণ শুনেই তখন বিস্মিত হয়েছিলাম, জানতাম না যে তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে, যার কাছে এ সমস্ত ব্যাপার নিতান্ত তুচ্ছ সাধারণ।

সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। সুধীরের জ্যাঠামশাই নানা রকম মজার গল্প করে খাওয়ার আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। সুমাত্রার লোকেদের একরকম অদ্ভুত নিয়মের কথা বলছেন, এমন সময় হঠাৎ পাতার দিকে চেয়ে তাঁর মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, ও আমি খাই না, ও কাঁকড়া তুলে নিয়ে যাও।'

আমরা তাঁর মুখ দেখে চুপ করে ছিলাম, সুধীর তার পাশে বসে ছিল অত লক্ষ করেনি, বললে, 'কেন জ্যাঠাবাবু, এই বুঝি আপনার দাঁতের জোর? কাঁকড়ার দাঁড়া চিবোতে পেছিয়ে যাচ্ছেন?'

বঙ্কিমবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'দাঁতের জোর ঠিক আছে রে। কিন্তু ও কাঁকড়া দেখলে আমার সমস্ত শরীর কেমন করতে থাকে।' তারপর উঠে পড়ে বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে বাপু, বুড়ো মানুষ বসে থাকতে পারলুম না—কিছু মনে কোরো না যেন।'

খাওয়া তাঁর তখনও হয়নি। আমরা সবাই সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সুধীরের বাবা ছুটে এসে বললেন, 'ওকী দাদা, কিছু না খেয়েই উঠে পড়লে যে?'

'হয়েছে, হয়েছে, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এখন কি আর আগের মতো খেতে পারি?' বলে বঙ্কিমবাবু এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যেন এ ঘরে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কাঁকড়া পাতে দেওয়ার পর এ কী হল আমরা বুঝতে না পেয়ে থ হয়ে রইলাম।

দুপুর বেলা বাইরের ঘরে বসে সুধীর বললে, 'কেন খেলেন না আপনাকে বলতেই হবে, জ্যাঠাবাবু।'

দু-একবার এড়াবার চেষ্টা করে বঙ্কিমবাবু অবশেষে একটু হেসে হেসে বললেন, 'কাঁকড়া দেখলেই আমার অজ্ঞান হবার মতো হয়—তাই না উঠে পারলাম না।'

'কেন, জ্যাঠাবাবু।' সুধীর অমনি ছাড়বার ছেলে নয়। খানিক চুপ করে বঙ্কিমবাবু বললেন, 'তবে শোন, কিন্তু শেষকালে আমাকে পাগল ভাবিসনি যেন। এই ভয়ে পৃথিবীর কাউকে এ কথা আজও জানাইনি। মানুষের স্বভাব ভারী মজার—এত বড় আশ্চর্য দুনিয়ায় বাস করেও অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করতে সে নারাজ।'

pathagar.net

বঙ্কিমবাবু গড়গড়ার নলটি একধারে সরিয়ে রেখে আবার বললেন, 'তোরা বড় জোর মনে করবি বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। তা বুড়ো হলে অমন হয়। এককালে এই গল্প বললে হয়তো আমার চাকরি মান-সম্ভ্রম সব যেত। মানুষের অসাধারণের উপর এমনই অবিশ্বাস।'

এইবার গল্প শুরু হল। বঙ্কিমবাবু বলতে লাগলেন পঞ্চাশ বছর আগের কথা—

সুমাত্রায় তখন বছর কয়েক চাকরি করেছি। এমন সময় সেখানে ভয়ানক কাণ্ড শুরু হল। সুমাত্রায় তখন বসন্তের টিকে দেবার বীজ পাওয়া দুষ্কর ছিল। শুনলাম সাইগনে একজন ফরাসি ডাক্তার নিজে পরীক্ষাগার করে টিকার বীজ তৈরি করছেন। সেই টিকার বীজ ভাল হলে তাই কিনে আনব বলে সাইগনে গেলাম। সাইগনে কয়েকদিন থেকে টিকার বীজ সংগ্রহ করে আবার সুমাত্রায় ফেরবার আয়োজন করবার সময় ভয়ানক বিপদে পড়লাম।

কম্বোজের পূর্ব উপকূলে তখন ভয়ানক জলদস্যুর উৎপাত। আসবার সময় সুমাত্রার মাঝিমাল্লারা তেমন ভয় পায়নি। কারণ সুমাত্রায় এই জলদস্যুদের সম্বন্ধে বেশি গুজব পৌঁছয়নি। কিন্তু সাইগনে কয়েক দিন থেকে নানা কথা শুনে ইতিমধ্যে ভড়কে গিয়ে ছিল তারা। দেশের টানেও এই জলদস্যুদের ভেতর দিয়ে আর যেতে রাজি নয়। শুধু লুঠতরাজই নয়, অকারণে মানুষ মারতেও এই দস্যুদের নাকি আনন্দ।

ফেরবার জাহাজ না পেয়ে কী করব ভাবছি এমন সময় সেই ফরাসি ডাক্তার খবর দিলেন যে একটি ফরাসি কোম্পানি নতুন একটি স্টিমার আনিয়েছে। কাল সে স্টিমার প্রথম যবদ্বীপ হয়ে সাইগনে আসবে। তাইতে আমি আবার সুমাত্রায় ফিরতে পারি। সত্যি কথা বলতে কী —হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। শুধু মাঝি মাল্লাদেরই দোষ দেব কেন, এই জলদস্যুদের সম্বন্ধে আমারই মনে যথেষ্ট ভয় ছিল। সাধারণ পালতোলা জাহাজে যাওয়া কত বিপজ্জনক তাও জানতাম, অকারণে প্রাণ হারাবার বাসনাও ছিল না। এই স্টিমারটিতে যেতে পেয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলাম।

এই দেশে এই প্রথম স্টিমার। সে স্টিমার আক্রমণ করা দূরে থাক, স্টিমার দেখলে জলদস্যুরা বোধহয় ভয়েই খুন হবে।

সঙ্গে বেশি কিছু জিনিসপত্র ছিল না। টিকার বীজই আসল জিনিস। অত্যন্ত সাবধানে তাই নিয়ে কয়েকদিন বাদে স্টিমারে উঠলাম। প্রকাণ্ড মজবুত স্টিমার। জলদস্যুদেরই জন্যে তার দুই প্রান্তে দুটি কামান বসান। তা ছাড়া স্টিমার রক্ষা করবার জন্যে জন পঞ্চাশ সৈন্যও নেওয়া হয়েছিল। স্টিমারে উঠে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আসুক, জলদস্যু।

সকালে স্টিমার ছেড়ে সন্ধ্যায় যখন মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি তখন পর্যন্ত জলদস্যুদের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না বলে একটু হতাশ যেন হলাম। জলদস্যুদের মজাটা একবার টের পাইয়ে দেবার সুবিধে হল না বলে।

pathagar.net

pandigital.net

কিন্তু জলদস্যুরা এল।

রাত তখন বেশি নয়। চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ স্টিমারের প্যাড্‌লের গম্ভীর আওয়াজ ছাড়িয়ে স্টিমারের তীক্ষ্ণ হুইসল শোনা গেল। পর মুহূর্তে স্টিমারের ইঞ্জিন থেমে গেল। ব্যাপার কী?

যাত্রীরা সবাই সামনের ডেকে গিয়ে ভিড় করলাম।

ক্যাপ্টেন শশব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৈন্যরা কামান বন্দুক বাগিয়ে ঠিক হয়ে আছে। সামনে বহুদূরে গুটিকতক আলো দেখা যাচ্ছে।

শুনলাম, আলো আর কিছুর নয়, জলদস্যুদের নৌ বহরের। এবার অন্তত তারা আক্রমণ করতে আসেনি। আমরাই তাদের আক্রমণ করছি।

স্টিমার থেকে একসঙ্গে কামান ও বহু বন্দুক গর্জন করে উঠল।

জলদস্যুরা আমাদের এতক্ষণ দেখতে পায়নি বলে মনে হল। কারণ দেখা মাত্র টপ টপ করে নৌকোর আলো সব নিবিয়ে ফেলল। কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন ছাড়বার পাত্র নন, বললেন, 'অন্ধকারেই গুলি চালাও।'

তখন সার্চ লাইট বলে কিছু ছিল না। থাকলে আমাদের অমন সর্বনাশ বোধহয় হত না।

অন্ধকারেই গুলি চলতে লাগল। জলদস্যুদের সুলুপগুলিতে মাঝে মাঝে কোথাও আলো জ্বলে ওঠে। আমাদের স্টিমার তাই দেখেই তাদের ধাওয়া করে, আর গুলি চালায়। ক্যাপ্টেন বলছেন শুনতে পেলাম—'আজ আর রেহাই দেওয়া নেই। ভীমরুলের চাক ভেঙে তবে ছাড়ব।'

স্টিমার ক্রমশ তাদের সুলুপগুলির বরাবর এসে পড়েছিল। অন্ধকারেও অস্পষ্ট ভাবে সুলুপগুলি দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ সবাই স্টিমারের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে গেলাম। তার সঙ্গে ভয়ংকর আওয়াজ।

প্রকাণ্ড স্টিমারটা যেন মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে কেঁপে উঠল।

স্টিমার চোরা পাহাড়ে ঠেকে গেছে।

ক্যাপ্টেনও পড়ে গিয়েছিলেন। উঠে পড়ে উন্মত্তের মতো তিনি ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন থামিয়ে দিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তলায় প্রকাণ্ড চিড় হয়ে জাহাজে তখন রাশি রাশি জল ঢুকছে।

জলদস্যুরা যে এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রলোভন দেখিয়ে এ পথে টেনে এনেছে তা কে জানত।

স্টিমার ঠেকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়ংকর ব্যাপার শুরু হল তার আর বর্ণনা হয় না। জলদস্যুদের কয়েকটি মাত্র সুলুপ স্টিমারকে প্রলোভন দেখিয়ে ডুবো পাহাড়ে ঠেকবার জন্যে সামনে ছিল। তাদের বেশিরভাগ সুলুপই ছিল পেছনে। তারা ইতিমধ্যে কোথা থেকে এসে ছেঁকে ধরল।

pathagar.net

অন্ধকারে চারিদিকে শুধু ভীত যাত্রীদের আর্তনাদ। জলদস্যুরা নৃশংস ভাবে তাদের হত্যা করতে শুরু করে দিলে, এই জলদস্যুদের হাতে মরার চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল বলে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল তখন দিন। দেখি হাত পা বেঁধে আমায় একটি সুলুপের উপর দস্যুরা ফেলে রেখেছে। বুঝলাম স্টিমার ডুবেছে এবং আমায় এরা ক্রীতদাস করে নিয়ে চলেছে। অনেক কষ্টে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উঠে বসলাম। সামনে দেখলাম সমুদ্রের মাঝে প্রকাণ্ড এক পাহাড়। এই পাহাড়টিকে চিনতাম। জাহাজ-টাহাজ এই পাহাড়ের পাশ দিয়েই যাতায়াত করে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বার ভয়ে কেউ বড় কাছে ঘেঁষে না।

এখন দেখে আশ্চর্য হলাম যে, জলদস্যুদের নৌকোগুলি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্র থেকে পাহাড়টি খাড়া উঠেছে জানি। তার কোথাও নৌকো দূরের কথা, কোনও মানুষের দাঁড়াবার আশ্রয় নেই। তবে এই জলদস্যুরা চলেছে কোথায়? এই পাহাড় তাদের ঘাঁটি হলে অনেক দিন আগে তারা ধরা পড়ে যেত। সমস্ত বাণিজ্য জাহাজ এই পাহাড়ের ধার দিয়েই তো যায়।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছে কিন্তু জলদস্যুদের আড্ডার রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাহাড়ের চারধারে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা না থাকলেও একধারে একটি নাতিবৃহৎ গুহা- পথ রয়েছে। সমুদ্রের জল তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে। আমাদের সুলুপটি ক্রমশ এগিয়ে এসে তার ভেতর ঢোকামাত্র সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গুহাপথটি বেশি চওড়া নয়। আমাদের সুলুপ অতিকষ্টে তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বুঝলাম।

কিন্তু কোথায়?

অন্ধকারে এমন প্রায় মিনিট দশেক কাটল এবং তারপর চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখি, সামনে প্রকাণ্ড জায়গা। তার মাঝে একটি ছোট হ্রদের মতো। সমুদ্রের জল সেই হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। সুলুপগুলি সেই হ্রদের একধারে ভিড়ল। সমুদ্রের পাহাড়ের মাঝখানে এমন স্থান ছিল কে জানত? এইখানে মানুষের অগোচরে জলদস্যুরা নির্ভয়ে তাদের লুটের মাল সঞ্চয় করে বসবাস করে।

আমায় ধরে সুলুপ থেকে নামিয়ে দেবার পর দেখলাম আমার মতো আরও অনেককে তারা বন্দি করে এনেছে তাদের দাসবৃত্তি করার জন্য।

এরপর আমাদের যে জীবন শুরু হল তার দুঃখ আর বলে শেষ করা যায় না। মানুষ যে এমন পিশাচ হতে পারে এই জলদস্যুদের দেখবার আগে তা কখনও কল্পনা করিনি। সারাদিন তাদের জন্যে অকারণে হাড়ভাঙা খেটে ভাল করে একটু খাবার উপায়ও

pathagar.net

আমাদের ছিল না। চোখের সামনে তারা উন্মত্ত হয়ে সেই খাবার ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করত, কিন্তু আমাদের আধপেটা খাওয়াও তাদের সহ্য হত না।

সারাদিনের পর একটিবার মাত্র দাসদের অত্যন্ত কদর্য আহার মিলত। সেই কদর্য খাবারও সুখে খাবার উপায় নেই। জলদস্যুদের তো লুঠ করা ছাড়া আর কাজ নেই। একজনের হয়তো ইচ্ছে হল ক্রীতদাসদের নিয়ে একটু মজা করা যাক। খেতে বসেছি—হঠাৎ হাসতে হাসতে এসে লাথি মেরে সব খাবার ফেলে দিলে। কুড়োতে গেলে আবার লাথি। প্রতিবাদ করতে গেলে একটি তরোয়ালের খোঁচায় ভবলীলা সাঙ্গ।

ক্রীতদাসদের একজোট হয়ে বিদ্রোহ করবার উপায় নেই। কারণ, প্রথমত—আমরা অস্ত্রহীন, দ্বিতীয়ত—আমাদের সকলের পায়ে বেড়ি। সেই বেড়ি নিয়েই আমাদের চলতে ফিরতে হত।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। যে সাহেবি পোশাকে এসেছিলাম, সেই পোশাকের আর পরিবর্তন হয়নি। সেটি ছিঁড়ে খুঁড়ে প্রায় কুটি কুটি হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে নজরও আর ছিল না। একদিন কিন্তু সেই পোশাক থেকে একটি জিনিস খুঁজে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

বসন্তের টিকার বীজ নিয়ে যেতে সাইগনে এসেছিলাম বলেছি। সে সমস্ত টিকার বীজের শিশি সমুদ্রে স্টিমারের সঙ্গেই ডুবেছিল। কিন্তু তার ভেতর একটি কবে দেখবার জন্য বার করে ভুলে ওয়েস্ট কোটের পকেটে রেখেছিলাম মনে নেই। ওপরের কোটটি একেবারে ছিঁড়ে যাওয়ায় একদিন খুলে ফেলে দিলাম। সেদিন ওয়েস্ট কোটের পকেটে হঠাৎ হাত দিয়ে সেই শিশিটি পেলাম। শিশিটি কীসের বুঝতে পেরে আমার আনন্দের সীমা রইল না। এতদিনকার অমানুষিক অত্যাচারের এইবার শোধ নেব। মরুক এই পিশাচের দল।

আমার কাছে যে টিকার বীজ ছিল, তা শোধন করা নয়। সুমাত্রায় গিয়ে তা আমি শোধন করে ব্যবহার করব বলেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই অশুদ্ধ বীজের এতটুকু একজন দস্যুর রক্তে মিশিয়ে দিলে যে মহামারি শুরু হবে তা থেকে কেউ বাঁচবে না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। উন্মত্তের মতো কী ভাবছি! হাজার হলেও আমি ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানই আমার ব্রত, আমি কিনা মৃত্যুর বাহন হয়ে মানুষকে মারতে যাচ্ছি। হোক সে শত্রু, হোক সে অত্যাচারী, চরম উৎপীড়ন সয়েও একাজ যে আমি করতে পারি না। তাছাড়া শুধু তো জলদস্যুরা নয়, নিরীহ উৎপীড়িত ক্রীতদাসেরাও যে এই মহামারিতে মারা যাবে।

কিন্তু বিধাতার শাস্তি তারা শেষ পর্যন্ত পেল, অদ্ভুত উপায়ে।

আমার কাজ ছিল, আর কয়েকজন দাসের সঙ্গে হ্রদের জলে মাছ ধরা। আমরা ছোটো একটি নৌকো নিয়ে সারাদিন হ্রদে ঘুরে ঘুরে জাল ফেলে ফেলে মাছ ধরতাম। একদিন সকালে হঠাৎ প্রথম জাল তুলে অবাক হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত জাল লাল

pathagar.net

রঙে যেন চোবানো। একটু নজর করে দেখে মনে হল, জালময় যেন ছোটো ছোটো লাল কাঁকর উঠেছে এবং পরক্ষণেই দেখলাম সে কাঁকর নড়তে শুরু করেছে। কাঁকর নয়, সে কাঁকড়ার ছানা।

এদেশে কোনও কোনও নদীতে বৎসরে এক সময়ে অমনই কাঁকড়ার ছানা হয়। নদী ভরে যায়, আঁচলে করে তুললে তাতে অসংখ্য ছানা কিলবিল করে।

তৎক্ষণাৎ জাল আবার ফেলে দেওয়া হল। তাতে কী হবে? কাঁকড়ার ছানারা সমস্ত নৌকো ছেঁকে ধরেছে। তারা শুধু নৌকোয় উঠেই ক্ষান্ত হয় না—সুড়সুড় করে দলে দলে গায়ে ওঠে। তাদের ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই দায়। পাঁচটাকে ঝাড়তে পঞ্চাশটা উঠে পড়ে। তাদের মাড়াতেও কষ্ট হয়, কিন্তু না মাড়িয়েও উপায় কী। বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে এই সমুদ্রের পঙ্গপাল এল! সমুদ্রের পঙ্গপাল কথাটি তাদের পক্ষে কী রকম যে খাটে সেদিন তা বুঝতে পারলাম।

কিছুক্ষণ বাদে নৌকোয় থাকাও অসম্ভব হল। মাছ তো সেদিন সামান্যই মিলল। তাই নিয়ে পাড়ে উঠে দেখি, পাড়েরও বহুদূর পর্যন্ত সেই কাঁকড়ার ছানায় ছেয়ে গেছে।

মাছ না পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট উৎপীড়ন অবশ্য সহ্য করতে হয়েছিল। পরদিন সকালে কিন্তু হ্রদের ধারে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। তীরের বহুদূর থেকে দেখা যায় সমস্ত হ্রদের জল রক্তের মতো রাঙা হয়ে গেছে। কাঁকড়াগুলো একদিনেই যেন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে।

আমরা আগের দিন কাঁকড়ার জন্যে মাছ ধরতে পারিনি বলে কৈফিয়ত দেওয়ায় একজন দস্যু আমাদের সঙ্গে আমাদের কথা সত্যি কি না যাচাই করতে এসেছিল। আমাদের একজন সেই কাঁকড়ার সমুদ্র দেখিয়ে বললে, 'কেমন, আমরা মিথ্যে বলেছিলাম? ওই কাঁকড়ার ভেতর মাছ পাওয়া যায়?' তার মুখে এক ঘুঁসি মেরে দস্যু বললে, 'তাই ধরতে হবে।'

তাই ধরতে গেলাম। কিন্তু হ্রদে পৌঁছতে পারলে তো। তীরের উপরেই কিলবিল করে কাঁকড়ার পাল গায়ের উপর উঠতে থাকে। শুধু গায়ে ওঠে না। তারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু কামড়াতে শিখেছে। কত তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়! খানিক দূর গিয়ে বাধ্য হয়ে ফিরলাম। যে দস্যু তদারক করতে এসেছিল এবারে সে কিন্তু কিছু বললে না।

সত্যিকার বিপদ তার কয়েকদিন পর থেকে শুরু হল। সকাল বেলায় হঠাৎ কাঁসের কামড় খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমাদের শোবার কোনও জায়গা ছিল না। মাঠের ওপর যেখানে সেখানে গরু ঘোড়ার মতো আমরা শুয়ে থাকতাম।

উঠে দেখি চিতি কাঁকড়ার আকারে একটি লাল কাঁকড়া সজোরে দাঁড়া দিয়ে পায়ের একটি আঙুল কামড়ে ধরেছে। আশে পাশে আরও বিস্তর কাঁকড়া ছুটে বেড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে সে কাঁকড়াটাকে পা থেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এ কয়দিনের মধ্যে

কাঁকড়ারা আকারে দ্বিগুণ হয়ে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে দেখে, সত্যিই অবাক হয়েছিলাম।

চারদিকেই কাঁকড়ার পাল। এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কথা কখনও শুনিনি বা পড়িনি। প্রকৃতির নিয়মে সব নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরই প্রথমে এই রকম বংশবৃদ্ধি হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশই মারা যায়। না গেলে পৃথিবীতে মানুষের বাস করা অসম্ভব হত। দস্যুদের দেখলাম একটা নতুন খেলা জুটেছে, কাঁকড়া মারা। তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে কাঁকড়া মেরে বেড়াচ্ছিল। বিকেলের দিকে তাদেরও প্রাণে কিন্তু ভয় না হোক, দুশ্চিন্তা দেখা দিল। এই কাঁকড়ার পাল না গেলে রাত্তিরে শোবার জায়গাও যে মিলবে না। হ্রদ থেকে পালে পালে এসে তারা যেখানে যা কিছু আছে সব অধিকার করে ফেলেছিল। দস্যুদের প্রকাণ্ড ভাঁড়ার ঘরের চারধারে পঁচিশ জন দাস শুধু কাঁকড়া মারাবার জন্যেই মোতায়েন রাখতে হয়েছিল! কিন্তু তারাও হয়রান হয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত মেরে মেরে একদল ক্লান্ত হয়ে গেলে আর এক দল তাদের জায়গা নিচ্ছিল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও কাঁকড়ার পালের ভাঁড়ারে ঢোকা বন্ধ করা গেল না।

রাত্রে কোথায় শোয়া হবে সেই হল সবচেয়ে সমস্যা। সমস্ত পাহাড় ঘেরা দ্বীপ কাঁকড়ায় ছেয়ে গেছে। সে দ্বীপে যা কিছু আহার্য ছিল, তা প্রায় শেষ করে ফেলে ক্ষুধার জ্বালায় তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। আমরা যে তাদের ভক্ষ্য নয়, একথা তাদের বোঝান ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছিল। সে রাত্রে আর ক্রীতদাসে প্রভুতে প্রভেদ রইল না। সবাই যে যার দেহ বাঁচিয়ে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। অনেক কষ্টে একটুখানি পরিষ্কার জায়গা পেয়ে, শুয়ে একটুখানি ঘুমোতে না ঘুমোতেই কাঁকড়ার কামড়ে অস্থির হয়ে জেগে উঠতে হয়। সে কাঁকড়ার শক্ত দাঁড়া আবার না ভাঙলে ছাড়াবার উপায় নেই। সারারাত এমনই পাগল হয়ে সকাল বেলা যে ব্যাপার দেখলাম তাতে সমস্ত রক্ত জল হয়ে উঠল ভয়ে। একজন দস্যু অনেক রাত্রে অত্যন্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কাঁকড়ারা তার রক্তাক্ত কঙ্কালটি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

সকাল হলেও বিপদ বাড়ল বই কমল না। আগে শোবার জায়গা পাওয়া দুষ্কর হয়েছিল। এদিন দাঁড়িয়ে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠল।

সমস্ত দ্বীপ রাঙা হয়ে গেছে কাঁকাড়ায়। তারা পাহাড়ে পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় গিয়ে উঠছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই। অনবরত গা ঝেড়ে চলে না বেড়ালে তারা কামড় দেবেই, একটি নয়, এক সঙ্গে পঞ্চাশটি।

সেদিন যে কীভাবে গেল, ভাল করে স্মরণও হয় না। আহার নেই, নিদ্রা নেই, সারাদিন ছুটে বেড়াচ্ছি। কাঁকড়া মেরে মেরে হাতপা অবশ হয়ে গেছে, আর হাতের লাঠি নড়াতেও ইচ্ছা করে না। কোনও রকমে একটু নড়ে বেড়াবার শক্তিটুকু আছে। সমস্ত দ্বীপে বড় কোনও গাছ নেই—থাকলেও এ কাঁকড়াদের হাত থেকে নিস্তার পেতাম না।

pathagar.net

সন্ধ্যার সময় পায়ের একটা আঙুল কাটা গেল। কাঁকড়াটাকে লাঠির বাড়ি মেরে গুঁড়িয়ে ছাড়ালাম, কিন্তু তার দাঁড়া ততক্ষণ জম্পেশ হয়ে পায়ে বসেছিল।

আগের রাত্রে মশাল জ্বালা হয়েছিল। এ রাত্রে সমস্ত অন্ধকার। কে মশাল জ্বালবে? কে কোথায় আছে তারই খোঁজ হয় না। কোনও উপায় না দেখে অবশেষে পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করলাম, সেখানে হয়তো কাঁকড়ার ভিড় একটু হাল্কা হবে ভেবে! কিন্তু সে আশা বৃথা। যতদূর যাই, সেই এক কাঁকড়ার সমুদ্র। তবু যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ যুঝবই মনে করে এগিয়ে চললাম। এধারে পাহাড় ঢালু হয়ে উঠেছে। তার গায় সেই কাঁকড়ার লাল ছোপ। অনেক উপরে উঠলে হয়তো নিষ্কৃতি পেতে পারি মনে করে ক্লান্ত পদ টেনে টেনে চলতে লাগলাম। পাহাড়ের গায়ে নানা জায়গায় ছোটো ছোটো গুহা। ওরই একটির মধ্যে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারলেও যেন সুখ পাই মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় চমকে উঠলাম। এতক্ষণ এই কথাটি মনে পড়েনি—এমনই আমি নির্বোধ। পাহাড়ের গায়ে অজস্র শুকনো ঘাস রয়েছে। একটি ছোটো গুহা বেছে, তার ভেতর থেকে কাঁকড়া তাড়িয়ে যদি গুহামুখে এই শুকনো ঘাস জড়ো করে আগুন করতে পারি, তাহলে তো কাঁকড়া ঢুকতে পারে না। জানি সে ক্ষণিকের নিষ্কৃতি। বরাবর সে আগুন বজায় রাখবার মতো ঘাস জোগাড় করতে আমি পারব না, শেষ পর্যন্ত কাঁকড়ারা ঢুকবেই, কিন্তু তবু কিছুক্ষণের জন্যে তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারব—তারপর আসুক মৃত্যু।

সেই আশায় যেন নতুন বল পেয়ে উন্মত্তের মতো শুকনো ঘাস সংগ্রহ করে ছোটো একটি গুহা খুঁজে তার মুখে জড়ো করতে লাগলাম। এই ছোটো গুহার ভেতরও কাঁকড়া ঢুকেছে, কিন্তু চেষ্টা করলে তাদের মেরে গুহাটি নিরাপদ করা বোধহয় যেতে পারে। অবশ্য যদি বাইরে থেকে নতুন কাঁকড়া আর ঢুকতে না পারে। ঘাস সংগ্রহ প্রায় শেষ হয়েছে, অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা সে ঘাসের আগুন বেশ জ্বলতে পারবে বুঝে গুহার ভেতর ঢুকতে যাব, এমন সময় মাথা ঘুরে গুহার মুখেই ঘাসের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ কোমরের ওপর প্রচণ্ড এক কামড় অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় করে কী যেন ভেঙে গেল এবং তারও একটি অংশ দেহে ফুটল বুঝতে পারলাম। এক খামচা পেটের কাছে মাংস সমেত কাঁকড়াটাকে যখন ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, তখন মনে পড়ল ওয়েস্ট কোটের পকেটে টিকার বীজের শিশি ছিল। সেইটাই ভেঙেছে।

সে নিয়ে তখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে অনেক কষ্টে পাথর ঠুকে আগুন জ্বেলে গুহার মুখে শুকনো ঘাস ধরালাম।

ধীরে ধীরে গুহার মুখে আগুনের বেড়া তৈরি হয়ে গেল। বেড়া ডিঙিয়ে কাঁকড়ারা আর ঢুকতে পারবে না।

pathagar.net

এইবার ভেতরে কাঁকড়া মারায় মন দিলাম। হাত আর চলে না। তবু প্রাণপণে আধঘণ্টা চেষ্টার পর গুহার ভেতরটা নিরাপদ করা গেল। তখন আর দেহের সাড় ছিল না। কাঠের মতো পড়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

যখন উঠলাম গুহার দরজার আগুন নিবে গেলেও ভেতরে তাত ছিল। দেখলাম, বাইরে কাঁকড়া গিজগিজ করলেও ভেতরে তারা ঢুকতে পারছে না। গুহার ভেতরে যে শুকনো ঘাস অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে আবার কষ্ট করে আগুন জ্বাললাম। আগুন আর বড় জোর ঘণ্টা দু-এক আমায় বাঁচাতে পারে! তবু সেইটুকুই যথেষ্ট।

সমস্ত শরীরে ভয়ংকর উত্তাপ ও বেদনা বোধ করছিলাম। বেদনা হওয়া আশ্চর্য নয়—সমস্ত দেহ অসাড় হয়নি এই আশ্চর্য।

কিন্তু গায়ে আমার এসব কী? ঘাসগুলো বেশ ভাল করে জ্বলে ওঠামাত্র নিজের গায়ের দিকে চেয়ে কেঁপে উঠলাম। আমার সর্বাঙ্গে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। বুঝলাম যে বীজে একদিন দস্যুদের মারবার কল্পনা করেছিলাম, তাই ভাঙা শিশি দিয়ে আমার গায়ে ঢুকে এই রোগের সৃষ্টি করেছে।

প্রথমটা ভয় হচ্ছিল, শেষে মনে হল তাতে আর কী, মরতে তো হতই। বেশিক্ষণ জ্ঞানও রইল না, জ্বরের ঘোরে খানিক বাদে বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

ক-দিন যে কী অবস্থায় কেটেছিল জানি না। রোগের মধ্যে কী করেছি না করেছি তাও মনে নেই। সেবার যদি মরতাম, কোনও কষ্ট পেতে হত না—আমার জ্ঞান ছিল না।

একদিন সকালে হঠাৎ চোখ খুলে মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেহ অত্যন্ত দুর্বল, নড়তে কষ্ট হয়—তবু কেমন যেন ভাল মনে হচ্ছিল। চেষ্টা করে উঠে বসলাম! তার পরই মনে পড়ল সব কথা। কোথায় সে কাঁকড়ার পাল?

গুহামুখে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে মরা কাঁকড়ার খোলা স্তূপাকার হয়ে আছে। গুহামুখে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে দেখলাম, চারদিকে স্তূপাকার মরা কাঁকড়ার খোলা।

দুর্বল দেহেও প্রাণ রক্ষার জন্যে সব করতে হল। কেমন করে সে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেছিলাম, কেমন করে আহার না পেলেও পাহাড়ের খোদলে খোদলে জমা বৃষ্টির জল খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, সে সব বর্ণনার দরকার নেই।

খাবার জিনিসের অভাবে ঘাসের দানা খেয়ে থাকতাম। তখন বুঝেছিলাম—মানুষ সব কিছু পারে। দিন চারেক বাদে শরীরে একটু বল পেলাম। পাহাড় ছাড়িয়ে ক্রমশ দস্যুদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

সেখানে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম, তা জীবন ভুলতে পারব না। চারধারে শুধু মরা কাঁকড়ার খোলা, আর তারই মাঝে মাঝে মানুষের কঙ্কাল। কাঁকড়ারা কেন মরেছে জানিনা, কিন্তু সমস্ত মানুষ যে নিঃশেষ করে মেরেছে এটা নিশ্চিত। যে জলদস্যুর ভয়ে একদিন ওদিকের সাগরে যেতে মানুষের হৃদকম্প হত—তারা এমনই করে নিঃশেষ হয়ে যাবে কে জানত!

pathagar.net

এইখানেই আমার গল্প শেষ। সেই ভয়ংকর দ্বীপ থেকে কেমন করে একটি ছোটো নৌকোয় করে বাইরে এসেছিলাম, কেমন করে সেই পথে একটি বাণিজ্য তরী আমায় তুলে নিয়েছিল সে সব কথা বলব না।

এই অদ্ভুত কাহিনি অবশ্য কাউকে বলিনি। বললে তারা আমায় পাগলা গারদে না দিলেও চাকরিতে নিশ্চয়ই রাখত না। তারা ভাবত এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন যে দিনে-দুপুরে দেখতে পারে তার নিশ্চয় মাথা খারাপ। তাকে একটা হাসপাতালের কর্তা করে রাখা যায় না।

তাদের বলেছিলাম যে স্টিমার ডোবার পর আমি কোনও রকমে ভাসতে ভাসতে সেই পাহাড়ের গায়ে ঠেকি। সেখানেই আমায় একটি বাণিজ্য জাহাজ উদ্ধার করে।

গল্প শেষ হয়ে গেলে, সুধীর জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জ্যাঠাবাবু, কাঁকড়াগুলো কীসে মরল?'

'তা ঠিক জানিনা, তবে আমার একটা অনুমান আছে।'

'কী জ্যাঠাবাবু?'

'শুনলে তোরা হাসবি। তবু বলি—সেই টিকার বীজ থেকেই কাঁকড়াদের ভেতরও মহামারি হয়। আজকালকার কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে মানুষের অধিকাংশ রোগ পশু, পক্ষী, এমন কী সমুদ্রের জীব-জন্তুদেরও হয়।'

pathagar.net